চশমার আয়না যেমন

গ্রন্থকার
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, ঢাকা-১১০০
গ্রন্থকার, "আহকামে যিন্দেগী", "ফাযায়েলে যিন্দেগী", "ফিকহুন নিছা", "বয়ান ও খুতবা", "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" ও "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪
www.maktabatulabrar.com
www.facebook.com/maktabatulabrarbd

www.maktabatulabrar.com

চশমার আয়না যেমন

লেখক
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪২৫ হিজরী, ডিসেম্বর ২০০৪ ইংরেজি

দ্বিতীয় মুদ্রণ
রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরী, মার্চ ২০০৯ ইংরেজি

দ্বিতীয় সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪৩৫ হিজরী, জানুয়ারি ২০১৪ ইংরেজি

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার, ইসলামী টাওয়ার,
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা মাত্র)

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা......	৪
তাজমহল দর্শন......	৭
নারী নির্যাতন সমস্যার সমাধান দর্শন......	১২
ঢাকা শহরের যানজট দর্শন......	১৩
পি, জি হাসপাতাল ও রাজনীতি দর্শন......	২২
শিশুপার্ক ও রমনা পার্ক দর্শন......	৩২
জাতীয় ঈদগাহ দর্শন......	৩৯
জাতীয়তা দর্শন......	৪১
হাইকোর্ট দর্শন......	৪৫
হাইকোর্ট মাজার দর্শন......	৫০
ফজলুল হক হল ও ধর্মনিরপেক্ষতা দর্শন......	৫৮
গোলাপ শাহ মাজার দর্শন......	৬৬
গুলিস্তান দর্শন......	৭২
জাতীয় মসজিদ দর্শন......	৭৭
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার দর্শন......	৮৪
মন্দির দর্শন......	৯২
শহীদ মিনার দর্শন......	১০৮
জাদুঘর দর্শন......	১১৬
গির্জা দর্শন......	১৩১
ফকীর দর্শন......	১৪২
চিড়িয়াখানা দর্শন......	১৫১

www.maktabatulabrar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

চশমার আয়না যেমন, সবকিছু দেখায়ও তেমন। আপনি লাল লংয়ের চশমা লাগান, তাহলে সবকিছুই আপনার কাছে লাল মনে হবে। নীল রংয়ের চশমায় সবকিছুই নীল দেখাবে। হলুদ রংয়ের চশমায় হলুদ, কাল রংয়ের চশমায় কাল আর সবুজ রংয়ের চশমায় সবুজ বোধ হবে। এমনিভাবে চশমার আয়না যেমন, সবকিছুকে তেমন রংয়েই দেখতে পাবেন। তবে সাদা গ্লাসের অর্থাৎ, রংহীন গ্লাসের চশমায় সবকিছুই সাদা বা রংহীন দেখাবে না। তখন প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব রংয়েই দেখা যাবে। খালি চোখের অবস্থাও সাদা চশমার মত। খালি চোখেও আপনি সব বস্তুকে তার নিজস্ব রংয়ে দেখতে পাবেন। এজন্যই হয়তো বাগধারায় খালি চোখে দেখাকে “সাদা চোখে দেখা” বলা হয়।

প্রাকৃতিকভাবে খালি চোখেই সকলে জন্মগ্রহণ করে। তাই খালি চোখেই সবকিছুর প্রাকৃতিক রং ধরা পড়ে। কারণ খালি চোখই প্রকৃতিসম্মত। এই খালি চোখের উপর যখন কোন কৃত্রিম রং চড়ানো হয়, তখন সবকিছুর রংও কৃত্রিম হয়ে ধরা পড়ে। অরিজিন্যাল রং দেখতে চাইলে চোখকে অরিজিন্যাল রাখতে হবে। চোখ আর্টিফিশিয়াল হয়ে গেলে সব কিছুর রংও আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাবে।

এই চর্মচোখের অবস্থা যেমন, মনের চোখের অবস্থাও তেমন। মুক্ত চোখে দেখলে যেমন সবকিছুর আসল রং দেখা যায়, তেমনি মুক্ত মনে দেখলেও সব কিছুর আসল স্বরূপ দেখা যায়। অর্থাৎ, মুক্ত মনে বিচার-বিবেচনা করলেই সবকিছুর আসল স্বরূপ বুঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হল– মুক্ত মন বা মনের সাদা চোখ বলতে কী বোঝায়? মুক্ত মন বা মনের সাদা চোখ বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিসম্মত অবস্থা; যে অবস্থার উপর মনের সৃষ্টি। যেমন– মুক্ত চোখ বা খালি চোখ বলতে চোখের প্রাকৃতিক অবস্থাকেই বোঝায়– যে অবস্থায় কারও জন্ম হয়।

মনের স্বরূপ কী, মনের সাইজ আকৃতি কী, ব্যাসার্ধ কী, রং কী? এসব বিষয় আজ পর্যন্ত কেউ উদঘাটন করতে পারেনি। হয়ত পারবেও না কোন দিন। কুরআনের বর্ণনামতে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই মন বা আত্মা পরিচালিত হয়ে থাকে। মন বা আত্মা হল আল্লাহর নির্দেশঘটিত। আল্লাহই জানেন তার প্রকৃত অবস্থা কি। অতএব মন কেমন এবং কোন্ প্রকৃতির উপর মনের সৃষ্টি, আর সেই মনের চোখই বা কেমন এবং মনের প্রকৃতিসম্মত মুক্ত অবস্থা বা খালি অবস্থাই বা কি– এসব বিষয়ের সমাধানও মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কুরআনের একটি আয়াত এ ব্যাপারে আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা করে, যাতে বলা হয়েছে,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

অর্থাৎ, সঠিক ধর্মীয় প্রকৃতির উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম : ৩০)

আরও দিক-নির্দেশনা পাই একটি হাদীছ থেকে, যাতে বলা হয়েছে,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

অর্থাৎ, সব নবজাতকই সঠিক ধর্মীয় প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। (বোখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সঠিক ধর্মীয় অবস্থা অর্থাৎ, সঠিক ধর্মীয় চেতনাই হল মনের প্রকৃতি সম্মত বা মুক্ত অবস্থা। আর সঠিক ধর্ম যেহেতু ইসলাম, তাই ইসলামী চেতনাই হল মনের মুক্ত চেতনা, ইসলামী দৃষ্টিই হল মনের চোখের মুক্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দিয়ে সব কিছুকে যেমন দেখাবে, সেটাই হল তার প্রকৃত স্বরূপ। এছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার–বিবেচনা করলে কোন বিষয়ের সত্যিকার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে না।

মনের চোখে ইসলামের তথা কুরআন-হাদীছের আয়না লাগিয়ে সেই আয়নায় সবকিছু দেখুন, সবকিছুর আসল চেহারা দেখতে পাবেন। ইসলাম

www.maktabatulabrar.com

প্রকৃতির ধর্ম। ইসলামী চশমার গ্লাসও প্রকৃতিসম্মত। সবকিছুর প্রকৃত রং দেখতে হলে তাই এ চশমাই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে।

চর্মচোখের যেমন নানান রংয়ের চশমা থাকে, মনের চোখেরও তেমনি থাকতে পারে নানান রংয়ের চশমা। চর্মচোখ দেখা যায়, তার চশমার রংও দেখা যায়। লাল, নীল, কাল, সবুজ– কোন্ রংয়ের চশমা চোখে আঁটানো তা দিব্যি দেখা যায়। কিন্তু মনের চোখ দেখা যায় না, তার চশমা কেমন তাও দেখা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায় কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ স্টাইলে বিশ্লেষণ করছেন। কার বিচার-বিবেচনার ধারা কি তা থেকে অনুধাবন করা যায় তার মনের চোখে কোন্ চশমা আঁটানো রয়েছে। সেই চশমা যে রকম হবে, সবকিছুকে তিনি সে রকমই দেখতে পাবেন। চশমার আয়না যেমন, সবকিছু দেখাও তেমন। মেড ইন লেনিন-এর সমাজতান্ত্রিক চশমা একটা সমস্যাকে যে অ্যাঙ্গেলে দেখবে, মেড ইন ফ্রয়েড-এর যৌনবাদী চশমা সে সমস্যাকে সেই অ্যাঙ্গেলে দেখবে না। সেকুলার কোম্পানীর চশমা আর ন্যাশনালিষ্ট কোম্পানীর চশমার দেখা এক হবে না। গণতন্ত্র আর ধনতন্ত্রের চশমার দেখার মধ্যে তারতম্য থাকবে। এভাবে এক কোম্পানীর চশমার দেখার সঙ্গে অন্য কোম্পানীর চশমার দেখার মধ্যে থাকবে ব্যবধান। সেটা হতে পারে দুস্তর ব্যবধানও। কারণ, প্রত্যেকের চশমার আয়নার রং ভিন্ন। চশমার আয়নার রং যেমন, সবকিছু দেখাবেও তেমন।

বিভিন্ন বিষয়কে বিভিন্ন আদর্শের চশমা দিয়ে দেখার কারণে দুনিয়াতে এত বিপরীতমুখী মত-মতান্তরের জন্ম নিয়েছে এবং নিচ্ছে। "নানা মুনির নানা মত"-এর পিছনে চশমার এরূপ বিভিন্নতাই মুখ্য কারণ হিসাবে কাজ করছে। আপনি একটা সমস্যার কথা বাজারে ছেড়ে দিন, দেখবেন একেক জন এক এক অ্যাঙ্গেল থেকে সেটাকে বিচার করে সমাধান পেশ করছেন। যার চোখে যেমন চশমা আঁটানো, তিনি তেমন সমাধান পেশ করছেন। এভাবে পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কিংবা আংশিক পরস্পর বিরোধী সমাধানের স্তূপ হয়ে যাচ্ছে, সমাধানের ফুলঝুরি ছুটছে, কিন্তু প্রকৃত চশমাধারী কেউ না থাকায় হয়ত আসল সমাধানটাই এত কিছুর ফাঁক দিয়ে গলিয়ে যাচ্ছে, কিংবা সেই স্তূপের মধ্য থেকে আসল সমাধানটাকে চিহ্নিত করা দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

সারকথা– আপনি যে কোন সমস্যার নানান রকম সমাধান পাবেন। প্রত্যেকেই সমস্যার সমাধান দেখবেন সেরকম, যেরকম চশমা তার চোখে রয়েছে। পৃথিবীর নানান রকম ধ্যান-ধারণার অধিকারীরা, নানান মতাদর্শের অনুসারীরা শত শত বিষয়কে তাই শত শত রকমে দেখছেন, হাজার রকম সমস্যার তাই সহস্র রকম সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন। এ এক বিচিত্র পৃথিবী। এই বিচিত্র পৃথিবীর সবকিছুকে আবার দেখা হচ্ছে বিচিত্র রংয়ের সব চশমা দিয়ে। এর বৈচিত্রের যেন তাই হদ্দ ও হিসাব নেই। মনে চায় এই বৈচিত্রে একটা ভ্রমন সেরে আসতে এবং সাধ্যমত পৃথিবীর সবকিছুকে দেখে আসতে, যত রংয়ে যত ঢংয়ে তাকে দেখছে দুনিয়ার মানুষ। শুধু চাই নানান রংয়ের চশমায় ভর্তি একটা ঝুলি, যেখান থেকে প্রয়োজন মত চশমা বের করে চোখে এঁটে নেয়া যায়। আপনিও হতে পারেন আমার এই সফরের এক কৌতুহলী সঙ্গী। তাহলে চলুন!

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে জগৎটাকে দেখে আসি
যত রংয়ে যত ঢংয়ে দেখছে তাকে বিশ্ববাসী।।

তাজমহল দর্শন

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে সফরে বের হলাম। সঙ্গে রয়েছে একটি ঝুলি। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরী নানান মতবাদের চশমা। বিচিত্র রংয়ের রকমারি চশমা। এক এক চশমায় একই বস্তুকে একেক রকম দেখাবে। এক এক চশমায় একই সমস্যার সমাধান একেক রকম মনে হবে। চশমার রং যেমন, তাতে সবকিছু দেখাবেও তেমন। যে মতবাদের চশমা চোখে আঁটবেন, সবকিছুর সমাধান সে আলোকেই দেখতে পাবেন।

চশমার ব্যবধানে কোন কিছুর স্বরূপ যে কীভাবে ভিন্ন হয়, তা অল্প-বিস্তর আপনিও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি তাজমহলের সামনে চলে যান। চোখে প্রেমের চশমা লাগান। দেখবেন তাজমহলটি মমতাজ-শাহজাহানের অমর প্রেমের উপাখ্যান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চোত্থিত তাজের অষ্টভূজ হর্ম্যটির মাথায় গম্বুজটি যেন মাথা উঁচু করে সেই

www.maktabatulabrar.com

প্রেম-কাহিনী জানান দিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চের চার কোণায় চারটি মিনার যেন সেই প্রেমের নিরব সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। এ যেন প্রেমনগরী। এই নগরীতে প্রবেশকারী আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সম্মুখে রয়েছে রমণীয় তোরণ। মাঝে মাঝে ফুলদানির মত শ্বেত পাথরের গুলদাস্তাগুলো যেন প্রেমের এক একটি ফুটন্ত ফুল। এভাবে তাজমহলের দেয়ালে দেয়ালে, তাজমহলের পাথরে পাথরে শুধু প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবেন। তখন আপনার মনে হবে তাজমহলের প্রত্যেকটা পাথরের মধ্য থেকে, তাজমহলের প্রত্যেকটা ছন্দ-পতনের মধ্য থেকে মমতাজ-শাহজাহানের অমর প্রেমের শাশ্বত গান বেরিয়ে আসছে। সব কিছুর মধ্যেই যেন শাহজাহান-মমতাজের প্রেম-কাহিনী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই প্রেমনগরীতে সবই আছে, শুধু নেই প্রেমিক-প্রেমিকাযুগল। তারা বোধ হয় একান্তে প্রেম নিবেদনের জন্য এই কোলাহল থেকে একটু আড়াল হয়ে গেছে।

এবার আপনার চোখ থেকে প্রেমের চশমাটি খুলুন। স্থাপত্য শিল্পের একজোড়া চশমা লাগান। দেখবেন মুহূর্তের মধ্যে প্রেম নগরীটি স্থাপত্য শিল্পের স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়েছে। এর স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষ, এর মনোরম অনুপাত ও সংযত অঙ্গসজ্জা কিভাবে এ শিল্প সৌধটিকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে– তা আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকবে। এর প্রবেশ পথের তোরণটি অতিক্রম করলেই সম্মুখে সুপরিকল্পিত উদ্যান। উদ্যানের ঠিক মাঝখানে আলম্ব পানির আধার। তাতে তাজমহলের ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বাতাসের মৃদু মন্দ দোলায় পানি মৃদু মৃদু নড়ছে। তাজের ছবিটিও যেন হেলেদুলে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মূল তাজের অষ্ঠভুজ হর্ম্যটির মাথায় তরমুজ আকৃতির একটি গম্বুজ মধ্যমণির ন্যায় শোভা পাচ্ছে। চার কোণায় চারটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকায় গম্বুজ একে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পূর্ণ তাজটি একটি চতুর্ভূজ মঞ্চের উপর দাঁড়ানো। সেই মঞ্চের চার কোণায় চারটি সুশোভন মিনার তাজকে যেন সুন্দর ফ্রেমে এঁটে রেখেছে। তাজের দু'দিকে রয়েছে হুবহু একই ছাঁচের আরও দুটি ইমারত। পূর্ব দিকে মেহমানখানা, পশ্চিমে মসজিদ। এ দু'টি ইমারত যেন তাজের সুরের রেশ টেনে নিয়ে দিগন্তে বিস্তৃত করে দিয়েছে। তাজমহলের দ্বি-গম্বুজ ব্যবহার-রীতি, মূল্যবান প্রস্তরখচিত কারুকার্য, স্বল্পস্ফীত নকশা, রম্য জালি-জাফরির কাজ এবং বাগান সমাধি– এই সব কিছু মিলে স্থাপত্য শিল্পের

এক চরম পরাকাষ্ঠায় পরিণত করেছে তাজকে। পারস্য থেকে আগত সুদক্ষ স্থপতি উস্তাদ ইসা এর প্রতিসাম্য রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেননি। এক হাজার শ্রমিকের ২২ বৎসরের নিরলস শ্রম হয়েছে স্বততই স্বার্থক।

তাজমহলকে যদি আপনি কবি সাহিত্যিকের চশমায় দেখেন, তাহলে হয়ত আপনি মহাকাব্য রচনা করে ফেলতে পারবেন। শ্বেত মর্মরে গাঁথা তাজমহল–এর প্রত্যেকটা গাঁথুনির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে কাব্য গাথা–

তাজমহলের পাথর দেখেছ,
দেখেছ কি তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাইরে শাহ্জাহান।

বিকালের পড়ন্ত বেলায় তাজমহলের পশ্চাদভাগে দাঁড়িয়ে যমুনার স্বচ্ছ-শান্ত পানিতে প্রতিবিম্বিত তাজমহলের অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করলে আপনার মনে সাহিত্যের জোয়ার উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এই চশমা নিয়ে তাজমহলের যে দিকেই তাকাবেন, কাব্য সাহিত্যের উপাত্তে ভরা এক সাহিত্যপুরী বলেই মনে হবে তাকে। মনে হবে এটি পাথরের গাঁথা কোন স্থাপত্য শিল্প নয়, এ হল সাহিত্য-কাব্য দিয়ে গাঁথা এক সাহিত্যপুরী।

এভাবে তাজমহলকে বিভিন্ন চশমা দিয়ে আপনি দেখতে পারেন। যেমন চশমা লাগাবেন, তাজের সর্বত্র তেমনি রংই আপনি দেখতে পাবেন। আপনি Characrer psychology বা চরিত্র মনোবিজ্ঞান-এর চশমা লাগিয়ে তাজমহলকে দেখলে স্থাপত্য শিল্পে শাহ্জাহানের অভূতপূর্ব অনুরাগ দেখতে পাবেন। তার প্রশান্ত মেজায, রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গী, উদার মনোভাব–এর পরিচয় পাবেন। আপনি দেখবেন, প্রেমময় প্রকৃতিসম্পন্ন সম্রাট শাহ্জাহানের ভিতরের মানুষটি তাজমহলের স্থাপত্যে কি দারুণভাবেই না মূর্তমান হয়ে উঠেছে। তাজমহলের স্থাপত্যে আপনি ধারণা পাবেন শাহ্জাহানের অনুভূতি ও আবেগময়তার পরিমাণ কতটুকু ছিল। এই চশমা দিয়ে আপনি আরও দেখতে পাবেন শাহ্জাহানের ইমারতের নারীসুলভ বৈচিত্র, যেখানে শিল্পশৈলীর প্রকাশ মাধ্যম হয় আবেগময়তা আর কমনীয়তা। বাদশাহ আকবরের নির্মিত ফতেহ্পুর সিক্রীর বুলন্দ দরওয়াজা বা উচ্চ তোরণ-দ্বারে স্থাপত্যের যে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠভাব বিদ্যমান, তাজমহলের স্থাপত্যে সেটা অনুপস্থিত। এই

www.maktabatulabrar.com

বৈশিষ্ট্যের কারণেই বোধ হয় শাহ্জাহান তাজমহলের নির্মাণ কাজের জন্য সব উপকরণ ছেড়ে শ্বেত পাথরকেই বেছে নিয়েছিলেন।

এতক্ষণ যে কয়টি চশমা দিয়ে তাজমহলের যে কয়টি রং আপনি দেখতে পেলেন, এই রংগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তেমন কোন সংঘাত বা বিপরীতমুখিতা নেই। তাজমহলের স্থাপত্যে প্রেমের ছাপ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্থাপত্য শিল্পের নৈপুণ্য। এর মধ্যে কাব্য-সাহিত্যের উপকরণ যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শাহ্জাহানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ও। এসবের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, সবগুলো বিষয়ের একই সঙ্গে সহাবস্থান হতে পারে এবং এক হিসাবে রয়েছেও তা। কিন্তু সব চশমায় সব সাইড দেখা যায় না। এক এক চশমা এক এক সাইডকে অক্ষি গোলকের সমান্তরালে এনে দেয়, যার ফলে সেটাই পরিষ্ফুটিত আকারে দেখা যায়। অন্যটা হয়ত একেবারেই না দেখার অন্ধকারে থেকে যায়, কিংবা তা মূর্তমান হয়ে ওঠে না। বুঝা গেল– এসব চশমার দেখার মধ্যে সংঘাত বা বৈপরীত্য নেই, তবে অপূর্ণতা বা একদেশদর্শিতা রয়েছে। কিন্তু যেসব চশমার আয়নায় কোন ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শের লেবেল লাগানো থাকে, সেসব চশমার দেখার মধ্যে থাকতে পারে পারস্পরিক বিপরীতমুখিতা ও সংঘাত এবং সে ক্ষেত্রে দু'টো চশমার দেখার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনো অবকাশই আর থাকে না। এরকম কয়েকটা চশমা দিয়ে যদি আপনি তাজমহলকে দেখেন, তাহলে একটার দেখার সঙ্গে আরেকটার দেখার বৈপরীত্য কেমন হয়, তা কিছুটা আঁচ করতে পারবেন।

আপনি স্থূল মুসলিম জাতীয়তাবাদের চশমায় তাজমহলকে দেখুন, তাহলে মনে হবে এর দ্বারা ইসলামী স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। তাজমহল যেন মুসলিম জাতীয়তাবাদের এক জ্বলন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি ভারতভূমিকে করে তুলেছে গৌরবান্বিত। এক স্নিগ্ধ পবিত্রতার ছোঁয়ায় আপনার দেহমন মোহিত হয়ে যাবে। এরপর আপনি উগ্র হিন্দুবাদী আদর্শে উজ্জীবিত শিব সেনাদের চশমায় তাজমহলকে দেখুন, মনে হবে যেন ভারতভূমির অখণ্ড হিন্দুবাদের উপর ম্লেছ যবনরা এক স্থায়ী কলঙ্কের ছাপ এঁটে দিয়েছে, ভারতমাতার শূচিতা কলংকিত হয়েছে। সারা দেহমন জুড়ে অশূচিতাবোধ গিজগিজ করছে। এ যেন ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্ক। সব কিছুকেই যেন স্যাঁতসেতে করে দিয়েছে।

সবশেষে আখেরাতের চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত, আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত খাঁটি মর্দে মুত্তাকীর স্বচ্ছ মনের আয়নায় তাজমহলকে দেখুন, সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র আপনার সামনে ভেসে উঠবে। যে চিত্রে থাকবে আপন প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমের ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়কে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার মত নির্লজ্জতার বহিঃপ্রকাশ। যে চিত্রে থাকবে রাষ্ট্রপ্রধান শাহ্জাহানের জাতীয় উন্নয়নের পরিবর্তে একটা ব্যক্তিগত কল্পনা-বিলাসের পশ্চাতে সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর মেধা ও মনোযোগ ব্যয় করার চিত্র, যে মেধা ও মনোযোগ জাতির জন্য ব্যয় করলে হয়ত জাতির অনেক কল্যাণ সাধিত হত। সব চেয়ে বড় কথা– এই ব্যক্তিগত কল্পনা-বিলাসের পিছনে এই বিপুল পরিমাণ জাতীয় অর্থ অপচয়ের দায়ভার মাথায় নিয়ে শাহ্জাহানের কবরে চলে যাওয়া। জাতীয় অর্থে অনধিকার চর্চা করে, জাতীয় আমানতে খেয়ানত করে তিনি সেই স্থানে শয়ন করে আছেন, যে স্থানের প্রত্যেকটি পাথর কণা তার সেই অনধিকার চর্চা ও খেয়ানতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন! নতুবা এই স্থাপত্য শিল্পের মনোরম স্বপ্নপুরী তার জন্য দুর্ভোগপুরী হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি তা-ই হয়, তাহলে কী হবে সেই প্রেম দিয়ে, যে প্রেম অনন্ত শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়? ধিক্ এই প্রেমের প্রতি! ধিক্ এই নশ্বর পৃথিবীর মায়াজালের প্রতি!!

এই চশমা চোখে দিয়ে শাহ্জাহান-মমতাজের সমাধির কাছে যাবেন। তাজের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি অষ্টভূজ কক্ষ। সেই কক্ষের মাঝখানে একটি অষ্টবাহু মর্মর-বেষ্টনী সমাধি ফলক দু'টিকে ঘিরে রেখেছে। যেখান থেকে সোপান বেয়ে একটি ভূগর্ভ কামরায় মূল কবরের কাছে যাবেন। আপনার মনে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের গোপনে নিভৃতে অভিসারের কথা উদয় হবে না। বরং আপনার মন দ্বিধা-শংকায় আন্দোলিত হবে। হাদীছের ঐ বাণীটি পুনরায় আপনার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে উঠবে–

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের একটা গর্ত! (তিরমিযী)

www.maktabatulabrar.com

নারী নির্যাতন সমস্যার সমাধান দর্শন

হ্যাঁ আপনি নিশ্চয় পূর্বের আলোচনায় দেখতে পেয়েছেন কোন ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শের লেবেল লাগানো চশমার একটার দেখার সঙ্গে আরেকটার দেখার বৈপারীত্য থাকে। যার চোখে যেমন চশমা আঁটানো, তিনি সবকিছুকে সেভাবে দেখছেন। চশমার আয়না যেমন, সবকিছুকে দেখাচ্ছে তেমন। এর উদাহরণ আমাদের জীবনে যে কত, তার হদ্দ ও হিসাব করা কঠিন।

ধরুন, আপনি সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নির্যাতিত হওয়া এবং স্বামীদের থেকে নারীদের ন্যায্য ভরণ-পোষণ না পাওয়ার সমস্যার সমাধান কি তা জানতে চান। সমাজের সামনে বিষয়টা তুলে ধরলেন। অমনি শুনবেন সমাজতান্ত্রিক বলয় থেকে এর সমাধান বলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকর্তৃক নারী-পুরুষ সকলের সমান ভরণ-পোষণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের মুখাপেক্ষী না থাকায় পুরুষ কর্তৃক তার নির্যাতিত হওয়ারও অবকাশ দেখা দেয় না। যদিও তাদের চশমায় এটা দেখা যাবে না যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের পারিবারিক বন্ধন গড়ে না উঠার ফলে সেখানে নারীরা ডেইরি ফার্মের গরু-ছাগলের মত সন্তান প্রসাব করে। কারও মাতা-পিতার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। ফলে মাতা-পিতার বার্ধক্যে তাদের ভরণ-পোষণ করা ও যত্ন নেয়ারও কেউ থাকে না এবং রাষ্ট্রও তাদের থেকে শ্রম নিতে পারে না বিধায় তাদের ভরণ-পোষণ দেয়াকে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হিসাবে গণ্য করে। অবশেষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এরূপ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রের জন্য বোঝা মনে করে শেষ সমাধান হিসাবে তাদেরকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠিয়ে দেয়। আর নারীবাদীদের বলয় থেকে বলা হবে, অধিক হারে নারীদেরকে চাকরি দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলাই এর সমাধান। যাতে নারী পুরুষের মুখাপেক্ষী না থাকে এবং পুরুষ কর্তৃক তার নির্যাতিত হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি না হয়। উপসংহারে নারীবাদীদের পক্ষ থেকে এ সমস্যার জন্য মৌলিকভাবে পুরুষ শাসিত সমাজকে দায়ী করে পুরুষদের উপর তাদের মনের ঝালও মিটাতে দেখবেন। যদিও নারী শাসিত রাষ্ট্রগুলোতে নারী নির্যাতনের হার পূর্বের চেয়ে হ্রাস পায়নি বরং বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে নারীবাদীদের চশমায় এ দিকটা দেখা যাবে না।

তাছাড়া নারীদেরকে নির্যাতিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য চাকরি দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে গেলে তারা যে অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতিত হয়, কিংবা এর ফলে সংসারের কর্তৃত্ব পুরুষের বদলে নারীর হাতে চলে গেলে যে কি কি পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হয় সে সাইডটাও নারীবাদীদের চশমায় দেখা যায় না।

এ সমস্যার আর একটি সমাধান ধরা পড়বে ইসলামের প্রাকৃতিক চশমায়। এ চশমায় দেখা যাবে নারী প্রাকৃতিকভাবে পুরুষের তুলনায় দূর্বল। সামগ্রিক বিচারে –শারীরিক, মানসিক, মেধাগত সবভাবেই– নারীর এ দুর্বলতা অনস্বীকার্য। অতএব প্রাকৃতিক যুক্তি অনুসারেই নারী পুরুষেরই কর্তৃত্বাধীন থাকবে। আর কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে রাখার জন্য নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে পুরুষের উপর। নারীর যত অধিকার রাখা হয়েছে ইসলামে, সে অধিকারগুলো বাস্তবায়িত হলে নারী সমাজের অবস্থার নিশ্চিত উন্নতি হবে। পুরুষ যেন নারীর এ অধিকারগুলো আদায় করে, সে জন্য পুরুষকে ইসলামী অনুশাসনের অনুগত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক সমাজকে গড়ে তুলতে পারলেই এ সমস্যাসহ সব সমস্যার সমাধান হবে।

ঢাকা শহরের যানজট দর্শন

নানান মতবাদের চশমায় পৃথিবীকে দেখার জন্য যে সফরে বের হতে চেয়েছিলাম। এখান থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সে সফর শুরু করলাম। নাখালপাড়া বায়তুল আতীক জামে মসজিদ থেকে বায়তুল মুকাররমের উদ্দেশে ফার্মগেট এলাম। ফার্মগেট থেকে মিনিবাসে চড়ার চেষ্টা করছিলাম। উপচে পড়া মানুষের ভিড়। বাস, মিনিবাস, রিক্সা, সি এন জি, প্রাইভেটকার– কোন যানবাহনের অভাব নেই। গাড়িতে গাড়িতে রাস্তা যেন গাড়ির সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। এত যানবাহন থাকা সত্ত্বেও কোন যানবাহনে উঠার যেন সুযোগ নেই, কোন যানবাহনে যেন তিল ধারণেরও ঠাই নেই। তার মধ্যে মিনিবাসে চড়তে গেলে তো রীতিমত মিনিযুদ্ধে লিপ্ত

www.maktabatulabrar.com

হতে হয়। ধাক্কাধাক্কি করে কোন রকমে একটু চড়তে সক্ষম হলেও ভিতরে গিয়ে সিট নিতেও যুদ্ধ করতে হয়। রাস্তায় যানবাহনগুলো চলছেও যুদ্ধ করে। ধাক্কাধাক্কি গুতোগুতি ছাড়া কোন যানবাহনই সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। তারপরও সামনে তেমন অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শুধু গাড়ি আর গাড়ি। গাড়িতে গাড়িতে জমাট বেঁধে পূর্ণ সড়ক যেন গাড়ির একটা ইউনিটে পরিণত হয়ে গেছে। সেই ইউনিটি ভেঙ্গে কারও পক্ষেই আর স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় কে তার গন্তব্যে কখন পৌঁছবে, কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। সময়মত অফিস-আদালতের কার্যক্রম শুরু হতে পারবে না। বিঘ্নিত হবে কর্মস্থলের কাজকর্ম। বিঘ্নিত হবে কাজকর্মের রুটিন। বিঘ্নিত হবে পরিকল্পনা। ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ ও জাতির অর্থনীতি। ত্যাক্ত-বিরক্ত হবে অপেক্ষমান লোকজন। হয়ত এর ফলে অনেকের সুসম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ তো এক বিরাট সমস্যা। যে সমস্যা থেকে মুক্ত নয় ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত কোন স্তর। যাত্রার শুরুতেই সম্মুখীন হলাম এ রকম একটা বড় সমস্যার। অগত্যা এ সমস্যার সমাধান কি তা একটু দেখেই নেয়া যাক বিভিন্ন রংয়ের চশমায়।

ঝুলি থেকে একজোড়া চশমা বের করলাম। এটি হল বুদ্ধিজীবীদের চশমা। কোন্ কোম্পানীর তৈরী তা জানতে হলে ফ্রেমের ভিতর সাইডের লেখাটি দেখতে হবে। তবে সে লেখাটি খুবই ছোট সাইজের, খালি চোখে তা বুঝা যায় না। ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের সহযোগিতা নিতে হয়। যে গ্লাসের মধ্য দিয়ে দেখলে দ্রষ্টব্য পদার্থটিকে বড় দেখায়। বাংলায় এটাকে বলা হয় বিবর্ধক কাচ। এরূপ ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের সহযোগিতা নিলে আপনি দেখতে পাবেন এ চশমাটি 'এন্টি রিলিজন্ কোম্পানী লিমিটেড'-এর তৈরী। তবে রিলিজন্ (ধর্ম) শব্দের পরে ব্রাকেটে আরও সুক্ষ্মভাবে ইসলাম শব্দটি লেখা আছে। এটি একটি লিমিটেড কোম্পানী হলেও স্টক এক্সচেঞ্জ–এর রেজিস্ট্রার্ড নয়। সাধারণ স্টক মার্কেটে এর শেয়ার কেনা-বেচাও হয় না। সব মৌসুমে সব স্থানে এর শেয়ার পাওয়াও যায় না। যখন দেশে সেক্যুলারিজমের বাতাস অনুকূলে বইতে থাকে, তখন মাঝে মধ্যে এর দোকানীরা টি, এস, সি-র চত্বরে কিংবা বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গনে অথবা রমনা বটমূলে এর পসরা খুলে বসেন। তখন এর শেয়ারের

মার্কেট-ভেল্যু বেশ চড়া হয়। আবার এ মৌসুম চলে গেলে তখন দেখা যায় ফেস ভেল্যুও চুপসে যায়।

এ চশমার জেনারেল মেন্যুয়েল থেকে জানা যায়, এটি চোখে দিলেই ইসলাম ধর্ম এবং এর ধারক-বাহকদেরকে দেখা যায় নন্দ ঘোষের মত। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ!' যে কোন সমস্যার জন্য ইসলাম এবং তার ধারক-বাহকদেরকেই দায়ী মনে হয়। এই ধরুন অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশের পিছিয়ে থাকার ব্যাপারটা। এ চশমা চোখে দিলে দেখবেন এর পিছনেও মোল্লা-মৌলভীরাই দায়ী। নানান রকম হালাল-হারামের ফতুয়া দিয়ে মৌলবাদীরাই অর্থনীতির সাধারণ অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। বিশ্ব যখন সূদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কল্যাণে (?) এগিয়ে চলছে, তখন এই ফতুয়াবাজ মৌলবাদীরা সুদকে হারাম ফতুয়া দিয়ে আমাদেরকে পিছিয়ে রাখছে। পাশ্চাত্যে যেখানে নারী-পুরুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে ইসলাম নারীদের উপর সেকেলে পর্দা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে অবগুণ্ঠিত করে রাখছে। অধুনা এই প্রগতির যুগে ইসলামের সেকেলে ধ্যান-ধারণা উন্নতি-অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার জন্য দায়ী মূলত মানুষের দুর্নীতি, অনিয়ম, দায়িত্বে অবহেলা প্রভৃতি। আর দুর্নীতি, অনিয়ম, দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি দূর করার জন্য চাই নৈতিক শিক্ষা। এই নৈতিক শিক্ষা দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। অতএব, ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করলেই প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। ইসলামী শিক্ষা বর্জন করাই মূলত এ সমস্যার জন্য দায়ী। অথচ বুদ্ধিজীবীদের চশমায় ব্যাপারটা দেখা যায় সম্পূর্ণ উল্টো। 'উল্টো সমঝিলিরে রাম।'

আসলে বুদ্ধিজীবীদের এ রকম উল্টো না বুঝে কোন গত্যন্তরও নেই। এরকম না বুঝলে তাদের বুদ্ধির বাজারে গ্রাহক পাওয়া যাবে না। সব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে– একথা বললে তারা ক্রেতা পাবে কোথায়? তাহলে তো তাদের জীবিকায় টান পড়বে, আঁতে ঘা লাগবে। মৎসজীবীরা যেমন মৎস বেচাকেনা করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, কৃষিজীবীরা যেমন কৃষির উপর ভর করে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে, তেমনি বুদ্ধিজীবীরা তাদের বুদ্ধি বিক্রি করে পেট চালায়। তাই আসল

www.maktabatulabrar.com

কথাটা বলে দিলে তাদের বুদ্ধি ক্রয় করার মত কোন গ্রাহক আর জুটবে না, সব গ্রহীতা তখন আসল বাজারে ছুটবে। এই ভয়ে তারা আসল কথাটা বলতে পারছেন না। পেটের চিন্তা বড় চিন্তা! তাছাড়া বুদ্ধিজীবীদের এই চশমার অপারেটিং মেন্যুয়েল থেকেও জানা যায় যে, এই চশমা ব্যবহার করলেই বুদ্ধিজীবী বলে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, যতক্ষণ ইসলাম এবং ইসলামের ধারক-বাহকদেরকে সব সমস্যার জন্য চোখ-কান বুজে দায়ী করা না হয় এবং কথায় কথায় মোল্লা-মৌলভীদেরকে মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি বুলি-বচনে বিভূষিত করা না হয়।

যাহোক, প্রথমে বুদ্ধিজীবীদের এ চশমা দিয়েই যানজট সমস্যাটাকে দেখতে চাইলাম। চশমা চোখে আঁটতেই দেখলাম, জনসংখ্যার বিস্ফোরণই এ সমস্যার মূল কারণ। জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ প্রতিহত করার জন্য চাই নিষ্ঠার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। কিন্তু ফতোয়াবাজরা এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করে রেখেছে। ফলে এই পরিকল্পনাটি কাংখিত রেজাল্ট দাঁড় করাতে পারছে না। এই ফতোয়াবাজরাই সব সমস্যার মূল। এদেরকে উৎখাত করতে না পারলে দেশের উন্নতি-অগ্রগতির সব পরিকল্পনা গোল্লায় যাবে!

অদ্ভুত! মেন্যুয়েলে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই পাওয়া গেল। সত্যিই এ চশমা চোখে আঁটতেই কত সুন্দরভাবে ইসলাম-বিদ্বেষ চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্বার্থক 'এন্টি রিলিজন কোম্পানী লিমিটেড!' নকল-ভেজালের এ যুগে কমিটমেন্ট অনুযায়ী যথাযথ গুণাগুণ সমৃদ্ধ পণ্য সরবরাহের জন্য কোম্পানীকে সাধুবাদ! তবে এর শেয়ার হোল্ডার ও উদ্যোক্তাদের জন্য একটু আগাম দুঃসংবাদও রয়েছে বৈকি। সেটা হল অচিরেই কোম্পানীটির নাকানি-চুবানি খাওয়ার সংবাদ। অবাস্তবতার বেসাতি সাপ্লাই দিয়ে, মোকিয়াভেলি করে খুব বেশি দিন কোন কোম্পানী টিকে থাকতে পারবে না। অতীতেও পারেনি কখনও। কম্যুনিজম কোম্পানী তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। দেশের সব মানুষ একই রকম জীবন মানের অধিকারী হবে, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না– এ রকম চটকদার প্রচারণার কারণে এক সময় এ কোম্পানীটির শেয়ার বিক্রি হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু এই দর্শন ছিল বাস্তবতা বিরোধী। অফিসের বস আর পিয়ন যদি একই মানের হয়, তাহলে পিয়ন কেন

বসের বশ্যতা স্বীকার করতে যাবে? আর বসই বা তাহলে কীভাবে বসগিরী করতে পারবে? রাজা-প্রজার ভিতর যদি তফাৎ কিছু না-ই থাকবে, তাহলে রাজা সেই প্রজাদের শাসন করতে সক্ষম হবে কীরূপে? ছোট-বড়-এর তফাৎ থাকতেই হবে; এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এর বিরোধিতা করা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করা, বাস্তবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই বাস্তবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কারণে এবং অবাস্তবতার বেসাতি সাপ্লাই দেয়ার কারণেই কম্যুনিজম কোম্পানীর ভরাডুবি হয়েছে। কান সুখ করা প্রচারণায় সম্বিতহারা মানুষের সম্বিত ফিরে আসার পর তারা এই কোম্পানীর বেসাতিকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। সেই ডাষ্টবিনের পাশ দিয়ে চলা পথিকরা এখন দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য নাকে রুমাল গুজে দ্রুত হেঁটে চলে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের চশমা ব্যবহারকারী 'এন্টি রিলিজ্ন্ কোম্পানী'-র শেয়ার হোল্ডারদেরকে কম্যুনিজমের শেয়ার পতনের এই দৃশ্য থেকে চোখ-কান বুজে না থাকার পরামর্শ দেয়া গেল। আপনারা চোখ-কান বুজে মোল্লা-মৌলভীদেরকে গালি দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়তো না-ই মানলেন। কিন্তু নিজেদের শেয়ার পতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আপনাদের কোম্পানীর ভরাডুবি চিহ্নিত। কারণ এখানে চলছে অবাস্তবতার বেসাতি। যেখানে যানজটের জন্য ট্রাফিক আইন অমান্য করা, দোকানীদের ফুটপাতসহ মূল সড়কের বহু অংশ দখল করে রাখা, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা প্রভৃতি বহুবিধ বাস্তব কারণ দায়ী, সেখানে আপনারা যানজটের কারণ হিসাবে সম্পূর্ণ অবাস্তব কাহিনী গেয়ে যাবেন, তাহলে কে ভরাডুবির হাত থেকে আপনাদের এ কোম্পানীকে রক্ষা করতে পারবে? বহু নিরপেক্ষ জনগণের চোখ-কান খোলা আছে, যারা বাস্তবটা দেখতে পায়। সেই চোখ-কান খোলা জনগণ যখন অবাস্তব কথা শুনে শুনে ক্ষেপে উঠবে, তখন বুড়িগঙ্গার চুবানি থেকে এ কোম্পানী রক্ষা পাবে না।

এতক্ষণ বুদ্ধিজীবীদের চশমা দিয়ে যানজট সমস্যার কারণ এবং এই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি– তা খুঁজে দেখছিলাম। এরপর ঝুলি থেকে বের করলাম আরেক জোড়া চশমা। এ হল মওদূদী এণ্ড কোম্পানী-র তৈরী 'ইসলামী হুকুমত'-এর চশমা। এটা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মুসল্লী

www.maktabatulabrar.com

স্টাইলের চশমা– পরণে প্যান্ট-শার্ট, মাথায় টুপি এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চেহারা বিপ্লবী। এ চশমা চোখে আঁটলে শুধুই দেখা যায় বিপ্লব আর বিপ্লব। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে রিচার্স করে এ চশমা উদ্ভাবন করেছেন। এ চশমা চোখে দিলেই আপনার চোখের সামনে অদূরে ভেসে উঠবে একটি মনোরম, শান্তিময়, সুখী সমৃদ্ধ রাজ্যের ছবি। এটি হল ইসলামী হুকুমত বা ইসলামী রাষ্ট্রের ছবি। এ রাষ্ট্রে দেখতে পাবেন গুমটি ঘরের মত কাউন্টারযুক্ত অসংখ্য সেল। হেন কোন সমস্যা নেই, যে নামে কোন কাউন্টার নেই। এসব কাউন্টার থেকে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়। ইসলামী হুকুমতই (ইসলামী রাষ্ট্রই) হল সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু সেই রাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছতে হলে মাঝপথে রয়েছে অসংখ্য ঝোঁপ-ঝাড়, কাটা-গুল্ম, আগাছা, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি। এসব ঝোঁপ-ঝাড় ও আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করা চাই। সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি মেরে ফেলা চাই। অতএব চাই লাঠি-সোটা, হকিষ্টিক, চাইনিজ কুড়াল ইত্যাদি। এ রাজ্যে পৌঁছতে হলে আরও রয়েছে অসংখ্য প্রতিকূলতা ও বাধা। কায়েমী স্বার্থবাদীদের বাধা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভীত অপরাধ জগতের বাধা। এসব বাধাকে অতিক্রম করা চাই। এর জন্য চাই বিপ্লব, চাই সংগ্রাম, চাই জেহাদ। ভিতর থেকে শ্লোগান উদ্বেলিত হয়ে উঠবে–

জেহাদ, জেহাদ, জেহাদ চাই!
জেহাদ করে বাঁচতে চাই!!
বিপ্লব বিপ্লব!
ইসলামী বিপ্লব!!

প্রতিষ্ঠাতা ভদ্র মহোদয় নিজস্ব কোম্পানীর তৈরী এই চশমা চোখে এঁটে কুরআন-হাদীছের পাতায় যখন ফোকাস মারলেন, তখন দেখলেন কুরআন-হাদীছ পুরোটাই হল ইসলামী হুকুমতের একটি সংবিধান। সর্বত্র ইসলামী হুকুমতের কথাই বলা হয়েছে এতে। ইসলামী হুকুমতের বাইরে আর কিছু নেই এখানে। এমনকি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর কথা যা কিছু বলা হয়েছে, তাও ইসলামী হুকুমতের স্বার্থেই বলা হয়েছে। ইসলামী হুকুমতই হল ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। আর নামায, রোযা ইত্যাদি হল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ট্রেনিং কোর্স। কোন রাজ্য দখল করার জন্য যেমন দক্ষ সেনাবাহিনীর প্রয়োজন, আর

সেই সেনাবাহিনীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন কোন কমান্ডারের অধীনে তাদের লেফ্ট রাইট করানো, মার্চ করানো, তেমনি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দক্ষ সৈনিক হিসাবে মুসলমানদেরকে গড়ে তোলার জন্য ইমাম রূপ কমান্ডারদের কমান্ড অনুযায়ী তাদেরকে লেফ্ট রাইট করানো হয়। এটাই হল নামাযের হাকীকত। এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদতগুলোও সৈন্যদের নিয়মিত রুটিন ওয়ার্কের মত। তাই সব ইবাদতই হল ট্রেনিং কোর্স।

এভাবে নিজস্ব উদ্ভাবিত চশমা দিয়ে তিনি দেখলেন ইবাদত হল ট্রেনিং কোর্স, দ্বীন কোন ধর্ম নয়; বরং দ্বীন হল রাষ্ট্র ও সরকার, শরীআত হচ্ছে তার আইন-কানুন। তিনি দেখলেন ইসলাম কোন ধর্ম এবং মুসলমান কোন ধর্মভিত্তিক জাতির নাম নয়; বরং ইসলাম হল একটা বিপ্লবী মতাদর্শের নাম, আর মুসলমান হল আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল (international Revolutionary party)-এর নাম। এভাবে তার চশমায় দ্বীন-ধর্ম, ইসলাম-মুসলমান, ইবাদত-বন্দেগী এবং শরীআত-তরীকত– সব কিছুর হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত চেহারা পাল্টে গেল। এমনকি পাল্টে গেল খোদার চেহারাও! ইলাহ বা রব বলতে এতদিন খোদা বা ইবাদতের যোগ্য পরিচয়ে যে সত্তার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠত, এ চশমায় সে সত্তার চেহারা হয়ে গেল শাসকের চেহারা। এতদিন যাবত ওলামায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে কেরামের চশমায় খোদাকে মনে হয়েছিল এক প্রেমময়ী সত্তা, এক করুণাময়ী সত্তা– যিনি তাঁর প্রেম ও করুণাসিক্ত চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সৃষ্টি করলেন এই ধরাধাম। যার হাতে রয়েছে অবারিত করুণার ভাণ্ড। দয়া-করুণা যার প্রবল তাঁর রুদ্র রোষের চেয়ে। কিন্তু এ চশমায় দেখা গেল, খোদা হলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রুদ্র চেহারার এক ভয়ংকর শাসক, যিনি সর্বক্ষণ ডাণ্ডা হাতে নিয়ে থাকেন বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা করার জন্য।

নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে রিচার্স করে উদ্ভাবন করা এই চশমায় তিনি যা দেখলেন, দ্বীন ধর্মের যে নতুন চেহারা তিনি দেখলেন, সে দেখাকে তার এতই নির্ভুল মনে হল যে, শত শত হাজার বছর যাবত কেউ যে এরূপ চেহারা দেখতে পায়নি, সে জন্য তার নিজের দেখাকে পুনঃবিচার করার মনোভাব জাগ্রত হল না। বরং তিনি স্বদম্ভে ঘোষণা করে দিলেন, এই

www.maktabatulabrar.com

চৌদ্দশত বৎসর যাবত দ্বীন, ইলাহ, রব ইবাদত, শরীআত, ইসলাম ও মুসলমান– এ সবের আসল চেহারা সকলের কাছেই পর্দায় আবৃত ছিল। কেউ এগুলোর আসল চেহারা দেখতে পাইনি। ইসলামের চার ভাগের তিনভাগ আসল চেহারা কি-তা আজ পর্যন্ত ছিল প্রচ্ছন্ন! তিনি হয়ে গেলেন এক মহা আবিষ্কারক!

দ্যুলোক ভূলোক, গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি
বিশ্ব বিধাত্রীর!
বল বীর, চির উন্নত মম শির
শির নিহারি আমারি নত শির
ঐই শিখর হিমাদ্রির!!

যাহোক, এই ইসলামী হুকুমতের চশমা দিয়ে যানজট সমস্যার সমাধান কি তা দেখতে চাইলাম। চশমা চোখে আঁটতেই দেখলাম সর্বত্র অনিয়ম, আইন অমান্যকরণ ও দুর্নীতিই এ সমস্যার কারণ। যানবাহন ট্রাফিক আইন মান্য করছে না। যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করে রাস্তা ব্লক করে রাখা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশের দোকানীরা তাদের ব্যবসায়িক মালামাল রাস্তার উপর রেখে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা এগুলোর প্রতিকার করবে, কিন্তু তারাও ঘুষ খেয়ে না দেখার ভান করে থাকছে। এভাবে গোটা প্রশাসনই দুর্নীতির শিকার হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকারের জন্য চাই ইসলামী শাসনব্যবস্থা। ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে। এ ছাড়া এদেরকে দোরস্ত করার আর কোন পথ নেই। এজন্য বিপ্লব ঘটাতে হবে, জেহাদ করতে হবে!

কিন্তু এ চশমায় একটি বাস্তব জিনিস দেখা গেল না। আইন দিয়ে যে সব দুর্নীতিকে দুর করা যায় না– তা তো একটা বাস্তব সত্য। আইনের চক্ষু সব অপরাধ দেখতে পায় না। পর্দার অন্তরালে কিংবা লোক-চক্ষুর আড়ালে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেগুলো তো আইন দিয়ে প্রতিহত করা যায় না। তাছাড়া আইন প্রয়োগ করা হবে যাদের দ্বারা, তারাই যদি অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়, অথবা আরও আগে বেড়ে বলা যায় তারা যদি হয় অপরাধের হোতা, তাহলে কী উপায়? সরষের ভূত কে ছাড়াবে? তাই

তো তত্ত্বজ্ঞানীদের বিচারে ধরা পড়েছে যে, মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধের উন্মেষ ঘটানো ছাড়া মানুষকে অপরাধ মুক্ত করা সম্ভব নয়। একান্ত অপারগতার মুহূর্তে আইনের প্রয়োগ করতে হবে বৈ কি? এবং তার দ্বারা কিছু লাভও হবে বৈ কি? তবে সেটাই মৌলিক এবং পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত নয়। মূল উপাত্ত হল নীতি-নৈতিকতাবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আদর্শবোধ। এরই জন্য চাই মুখ্যত প্রচেষ্টা চালানো।

এরপর 'যানজট' সমস্যার সমাধান কি? তা দেখার জন্য বের করলাম আরেক জোড়া চশমা। এটি কাকরাইল থেকে সংগ্রহ করা। নাম ছয় নম্বরের চশমা। এ চশমা চোখে আঁটলে ছয়টা পিলারের উপর দাঁড়ানো একটি স্বল্প পরিসরের সুবিস্তৃত ইমারত চোখের সামনে ভেসে উঠে। যার-চৌহদ্দির মধ্যে গাড়াগাদি ঠাসাঠাসি করে সবকিছুকে আঁটা যায়। 'স্বল্প পরিসর' এজন্য বললাম যে, ইসলামের বহু আমলের মধ্যে মাত্র কয়েকটি আমল এখানে আনা হয়েছে। কালেমার পরে নামায, ইল্‌ম ও যিকির, ইকরামুল মুসলিমীন, তাসহীহে নিয়ত এবং তাবলীগ– এই কয়েকটিই এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তারপর 'সুবিস্তৃত' বলার কারণ হল ষষ্ঠ নম্বরে যে 'তাবলীগ' বা দ্বীনের দাওয়াতের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে তো দ্বীন-ধর্মের যাবতীয় বিষয়ের কথাই এসে যায়। তাহলে ব্যাপারটা যেন এ রকম দাঁড়াল যে, এক নম্বর হল এই ..., দুই নম্বর হল এই ..., তিন, চার, পাঁচ নম্বর হল এই ... আর ছয় নম্বর হল সবকিছু।

যা হোক ছয় নম্বরের এই চশমা চোখে লাগিয়ে দেখলাম, রাস্তা-ঘাটে যত মানুষ বের হয়েছে, সকলে বের না হলেও চলত। অনেকেরই প্রয়োজনটা এমন ধরনের ছিল, যা তার অন্য এক ভাই সেরে দিতে পারত। অতএব, এখন যেখানে দু'জনের বের হতে হয়েছে, সেখানে একজনের বের হলেই চলত। তবে এর জন্য চাই একরামুল মুসলিমীন-এর মনোভাব। গাড়িতে ওঠা নিয়ে ধাক্কাধাক্কি এবং সিট দখল নিয়ে যুদ্ধ– এসব সমস্যার সমাধান হত, যদি এক ভাই আর এক ভাইকে একরাম করা শিখত।

সবশেষে বের করলাম মোটা ফ্রেমের চকচকা রংয়ের এক জোড়া জমকালো গর্জিয়াস চশমা। এটি হল বুর্জোয়া চশমা। এ চশমা শুধু ধনিক বণিক শ্রেণীদের সুবিধের দিকটি দেখতে পায়। এ চশমায় গরীবের চেহারা খুব কুৎসিত দেখায়। তাদেরকে ঝাড়পেটা করা হলে, তাদের তলপেটে

www.maktabatulabrar.com

লাথি মারলে কিংবা ভিটেমাটি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হলে এ চশমার কাচের উপর খুশির ঝিলিক খেলে যায়। তাই এ চশমায় দেখা গেল ঢাকা শহর থেকে রিক্সা-ভ্যানকে বিতাড়িত করতে হবে। রিক্সামুক্ত ঢাকা চাই, তাহলেই এ সমস্যার সমাধান পাই।

যাত্রার শুরুতেই যানজট সমস্যার সমাধান দেখতে দীর্ঘ সময় কেটে গেল। এখন তাহলে সামনে অগ্রসর হওয়া যাক।

পি, জি হাসপাতাল ও রাজনীতি দর্শন

মিনিবাসের গেটে ধাক্কাধাক্কি চলছে। এর ভিতর দিয়েই চড়তে হবে। আবার চড়ার সময় সাবধানে থাকতে হয়। কারণ এক শ্রেণীর লোক পকেট সাবাড় করার এ রকম সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকে। যত ভিড় হয়, যত ধাক্কাধাক্কি হয়, ততই তাদের সুবিধে। অনেক সময় প্রকৃত যাত্রীদের এত চাপ না থাকলেও ঐ শ্রেণীর লোকদের গংরা কৃত্রিম ভিড়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়। যাতে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে সুবিধে হয়। যাহোক, পকেট সামাল দিয়ে একটি মিনিবাসে অগত্যা চড়েই বসলাম। ফার্মগেট থেকে নজরুল ইসলাম এভিনিউ হয়ে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে মিনিবাসটি এগিয়ে চলল। বাংলা মোটর পার হয়ে কিছুদূর সামনে গিয়ে বাঁ হাতে হোটেল শেরাটন। এ হোটেলের পশ্চিম পাশ দিয়ে আরও কিছুদূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল মিনিবাসটি। সামনে শাহবাগ চৌরাস্তা। মিনিবাসের হেলপারটি বেশ বড় গলায় হাঁক দিল পিজি, পিজি নামবার আছেননি?

এখানে বাঁয়ে ডায়াবেটিস হাসপাতাল। ডানে আরও একটি হাসপাতাল। এটির নাম পি,জি হাসপাতাল। যুগ যুগ ধরে হাসপাতালটি এ নামেই পরিচিত। তবে বিগত সরকারের আমলে আইন করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" সেই সাথে হাসপাতাল তো রয়েছেই। কাজেই বলতে হবে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল'।

হাসপাতালের দক্ষিণ দিকের গেটে মোছা মোছা অক্ষরে এখনও এ রকম নাম লেখা দেখতে পেলাম। কিন্তু এ নামটি কাউকে বলতে শোনা যায় না। সরকারী সার্কুলার অমান্য করে কেন যে মানুষ এখনও সেই পুরাতন নাম ব্যবহার করে, তা একটু চিন্তা করে দেখলাম। হয়ত পি, জি নামটি সংক্ষেপ, এ কারণেই পি, জি বলতে সহজ বোধ হয়। এর বিপরীত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল'-এত বড় শ্লোক এক দিকে মুখস্থ করাও ঝামেলা, আবার এটা পাঠ করতেও বড় একটা দম-এর প্রয়োজন। পথে-ঘাটে চলতে গিয়ে গাড়ির কাল ধোঁয়া, বায়ু দূষণ ও নানান রকম টেনশন ইত্যাদি কারণে এমনিতেই যেখানে মানুষের শ্বাস ঘন হয়ে আসে, সেখানে লম্বা দম নিয়ে এই কয়েক গজ লম্বা নাম উচ্চারণ করতে কষ্ট বোধ হবে বৈ কি? যারা এই নাম রেখেছিলেন, তারা বোধ হয় এ বিষয়টি চিন্তা করে একটু সংক্ষেপকরণের জন্য ইংরেজী অক্ষরে এটার এব্রিভিয়েশন বের করেছিলেন– বি, এস, এম, এম, ইউ (B.S.M.M.U)। কিন্তু এব্রিভিয়েশনটি মাপে খুব একটা খাটো হয়নি। এত বড় এব্রিভিয়েশনও মানুষ বিরক্তিকর মনে করে। মানুষ এখন পছন্দ করে কত সংক্ষেপে সারা যায়। ঢাকার মহাখালিতে একটা হাসপাতাল আছে। নাম আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র। এটার ইংরেজী নামের এব্রিভিয়েশন করা হয়েছে– আই, সি, ডি, ডি, আর, বি (ICDDRB) কিন্তু মানুষ সংক্ষেপে এটার নাম দিয়েছে 'কলেরা হাসপাতাল'। কারণ এটাই সংক্ষিপ্ত, এটাই সহজ। এই সহজপ্রীতির কারণেই কি এখনো মানুষ পি, জি নামটিই ব্যবহার করে আসছে, না অন্য কোন কারণ রয়েছে? বিষয়টা ভাবতে ভাবতে দৃষ্টি পড়ল পিজির উত্তর গেটের উপর টানানো একটা ব্যানারের প্রতি। কাল রংয়ের ব্যানারটাতে সাদা রং দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে–

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
পি, জি হাসপাতাল
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

পিজি নাম উচ্চারণের কারণ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা চিন্তা করছিলাম, ব্যানারটা দেখে তা সব এলোমেলো হয়ে গেল। নিশ্চয়ই এ ব্যানারটা

www.maktabatulabrar.com

সরকারী উদ্যোগে লেখা হয়েছে। সরকারী লোকেরাই এটা তৈরী করেছে। এখানে লেখার ব্যাপার, কোন বড় নাম উচ্চারণের ঝক্কি-ঝামেলার প্রশ্ন এখানে অনুপস্থিত। তবুও কেন পি, জি হাসপাতাল লেখা হল? কেন লেখা হল না 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল? স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে এখানে সরকারী পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার রয়েছে। ভাল লাগা না লাগার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বাঙ্গালী জাতীয়তা আর বাংলাদেশী জাতীয়তার চশমা লাগিয়ে দেখার ব্যাপার রয়েছে। এক চশমা লাগালে ঐ লম্বা নামটাই কত সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত দেখায়, আবার অন্য চশমা চোখে আঁটলে ওটাকে দেখায় বিরক্তিকর ও অপাঙক্তেয়।

এ দুই চশমার বৈপরীত্যের কারণে ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সাইনবোর্ড ও অনেক ব্যানারে এরকম পরিবর্তন আসে, অনেক অফিস-আদালতে ছবির পরিবর্তন হয়, অনেক কর্মকর্তাদের জার্সি বদল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব কিছু হয় আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে, তবে বেশির ভাগই হয়ে থাকে রাজনৈতিক সচেতনতা বনাম চাটুকারিতার অংশ হিসাবে। তাই সাধারণ জনগণ যখন দেখল পি, জি-র পরিবর্তিত সুবৃহৎ নামের শ্লোক গেয়ে আমাদের কোন টুপাইস জুটবে না, তাহলে অযথা কেন এত বড় নাম উচ্চারণের কসরত করতে যাব? তাছাড়া আবার ক'দিন পরই যখন আগের নাম এসে যাচ্ছে, তখন অন্তর্বর্তিকালীন একটা নতুন নাম রপ্ত করার প্রয়োজনই বা কী? তাও আবার এত বড় সুবিশাল নাম। তাই বুঝি আগের নাম নিয়েই তারা পড়ে থাকল। দেখা গেল জনগণও বেশ রাজনৈতিক সচেতন। তাই আইন-টাইনের প্রতি তাদের তোয়াক্কা কম।

আসলে আমাদের দেশে সকলেই রাজনীতি সচেতন। কুলি, মজুর, রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, বাসের কন্ডাক্টর, হেলপার এমনকি রাস্তার সুইপার পর্যন্ত সকলেই রাজনীতি সচেতন। ধনিক-বণিক প্রমুখ এলিট শ্রেণীর লোকেরা তো রয়েছেই। এই সর্ব সচেতনতার ফলে সর্বত্রই শুধু শুনতে পাবেন রাজনৈতিক আলাপচারিতা। অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে-স্টীমারে, হোটেল-রেস্তোরায়, চায়ের স্টলে, খাবার টেবিলে এমনকি গণশৌচাগারে লাইনে দাঁড়ানো লোকদের মাঝে পর্যন্ত সর্বত্রই শুনবেন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা। রাজনৈতিক

চুটকি মারণে, রাজনৈতিক মন্তব্য করণে এবং রাজনৈতিক সমালোচনায় কেউ কারও চেয়ে কম যাচ্ছে না। অথচ মার্কিন মুল্লুক ও বিলাত –যাদের থেকে আমরা রাজনীতির সবক হাসিল করি– সে সব দেশের মানুষও এত রাজনীতি সচেতন নয়। সেখানকার সাধারণ মানুষকে রাজনীতির হালচাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তারা সাফ বলে দেয় 'ইট ইজ নট মাই যব'– এটা আমার বিষয় নয়, এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না, এর জন্য বিশিষ্ট লোকজন রয়েছেন।

আমাদের দেশের মানুষের রাজনীতি সচেতন হওয়ার কারণ হল– এদেশে রাজনীতি শেখা খুবই সহজ। এর জন্য বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না কিংবা কোন লেখাপড়ারও দরকার হয় না। অন্য দেশে রাজনীতি করতে হলে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মুদ্রানীতি, আন্তর্জাতিক লেন-দেন ও বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয়ের একাডেমিক জ্ঞান থাকতে হয়। এ জন্য প্রচুর লেখাপড়াও করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতি করার জন্য এতসব বিদ্যা-বুদ্ধি বা এতকিছু লেখাপড়ার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। কারণ অন্যদের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের রাজনীতির কোনই মিল নেই। সবকিছুর ক্ষেত্রে আমরা বিদেশী রীতি-নীতি অনুকরণে পারঙ্গম হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বকীয়তার অধিকারী। আমাদের রাজনীতি বিদেশ থেকে আমদানী করা নয়; বরং এটি সম্পর্ণ স্বদেশীয় মাল-মসলায় তৈরী এবং একান্তই নিজস্ব আঙ্গিকে প্রস্তুতকৃত। আমাদের রাজনীতি আয়ত্ত করা এতই সহজ যে, তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক লেখাপড়া তো দূরের কথা, কোন প্রশিক্ষণেরও দরকার হয় না। যদা মিয়া পদা মিয়ারাও ডাটসে রাজনীতি করতে পারে। শুধু শর্টহ্যান্ডের মত কয়েকটা ধারা মুখস্থ রাখতে পারলেই চলে।

একবার আমার এক বন্ধু মহলে গেলাম। তারা একটা ছাত্র সংগঠনের কর্মীদেরকে দক্ষ রাজনীতিক হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছিল। আলোচনায় প্রস্তাব হল কিছু মেধাবী ছাত্র নির্বাচন করে তাদেরকে রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনায় লাগানো হোক। রাজনীতি বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য আবুল মানসুর আহমদ রচিত 'আমার দেখা রাজনীতির ৪০ বছর', তোফায়েল আহমদ আলিগড়ী রচিত 'রওশন মুস্তাকবিল', সাইয়্যেদ মুহা. মিয়া রচিত 'শানদার মাযী' প্রভৃতি গ্রন্থ

www.maktabatulabrar.com

প্রাথমিকভাবে অধ্যয়নের প্রস্তাব গৃহীত হল। আমি তখন বললাম, মেধাবী ছাত্রের কী প্রয়োজন? আমাদের দেশে রাজনীতি করার জন্যে তো মেধার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং মেধা না থাকলেই সুবিধে। কর্মী হলে তার কাজ নেতা/নেত্রীর কথায় নাচতে থাকা। নেতা/নেত্রীর কথায় নর্তন-কুর্দন ছাড়া কর্মীর আর কোনো কাজ নেই। নেতা/নেত্রীর কথার বাইরে মেধা প্রয়োগ করতে গেলে তো তাকে কিক মেরে মাঠ ছাড়া করে দেয়া হবে। তাই সিটি স্ক্যান করে যার মস্তিষ্ক ঘিলুশূন্য পাওয়া যাবে, তাকেই রাজনৈতিক কর্মী বানানো ভাল।

শুধু কর্মী কেন, প্রধান নেতা বাদে অন্যান্য ছোটখাট নেতা, পাতি নেতা সকলের দশাই তো এমন যে, দলীয় প্রধানের কথায় সজোরে মাথা নিচের দিকে ঝাঁকুনি দিতে না পারলে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাকে দল থেকে নির্বাসিত করে দেয়া হয়। তাই যৌক্তিক-অযৌক্তিক, ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে যা-ই দলীয় নেতা/নেত্রী বলবেন, বিনা বিচারে তাতেই তথাস্তু বলে সায় জানাতে হবে। আনন্দ প্রকাশের জন্য বগল বাজানোর অভ্যাস থাকলে আরও ভাল। আর দেশনায়ক বা দেশনায়িকা যখন অমাত্যবর্গকে নিয়ে নীতি নির্ধারণী বৈঠকে নীতিবাক্য শেখাবেন, তখন প্রত্যেকটা কথার পর ডুগডুগিতে আঙ্গুলের আঁচড় দিয়ে সমস্বরে কোরাস গেয়ে উঠতে হবে– আহা বেশ বেশ! যেমন কথাই বলুক, তাতেই ঐ কোরাস গেয়ে উঠতে হবে। ঐ কোরাস গাইতে গাইতে আপনাকে এমনই মত্ত হয়ে যেতে হবে যে, কখনো আপনাকে অমুকের বাচ্চা তমুকজাদা বলে গালি দিয়ে বসলে তাতেও আপনার মুখ থেকে বের হবে আহা বেশ বেশ! আপনি যদি এমন একটা কোরাসের নমুনা শুনতে চান তাহলে চলুন।

ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শাহী দরবার। অমাত্যবর্গ ডুগডুগি হাতে নিজ নিজ আসনে সমাসীন। দেশে বিরাজমান উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে। বিরোধী দলের সরকার হটাও আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। সরকারকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। আলোচনা চলছে। রাষ্ট্রনায়ক/নায়িকাকে নিরুত্তাপ মনে হচ্ছে, যেন বিরাজমান সমস্যার সমাধান তার হাতের মুঠোয় রয়েছে। তিনি বাণী দিতে শুরু করবেন। অমাত্যবর্গের মধ্যমা আঙ্গুলগুলো সজাগ হয়ে উঠল। নিজ নিজ ডুগডুগির তারের কাছে আঙ্গুলগুলো নিশপিশ করতে থাকল। বাণী প্রদান শুরু হল–

বিরোধীদের প্রতি যত
আছে হিংসা-দ্বেষ,
চরিতার্থ নাওগো করে
আছে সুযোগ বেশ;
আহা বেশ বেশ!
ক্ষমতাটা মোদের হাতে
ঠ্যালার দেখ শেষ,
মারো ধরো জেলে পুরো
অপজিশন শেষ;
আহা বেশ বেশ!
গণতন্ত্র মুখের চর্চা-
কাজে নেই তার লেশ,
মিটাও মনের যত খাহেশ
বড়ই মজার দেশ;
আহা বেশ বেশ!
ক্ষমতার নেই কোনই বিশ্বেস
কখন হয় নিঃশেষ!
তাই
সময় থাকতে আখের গোছাও
মন করি নিবেশ;
আহা বেশ বেশ!

এই শুনলেন কোরাসের একটু নমুনা। এ থেকেই অনুমান করা যায় ছোট খাট নেতা বা পাতি নেতাদের মেধা প্রয়োগের কোনো পরিবেশ আদৌ আছে কি না? আর টপ নেতাদেরও তেমন কোন মেধার প্রয়োজন পড়ে না। হাতে গোনা কয়েকটা গদবাঁধা পলিসী প্রয়োগ করতে থাকলেই সারে। এগুলোকে আপনি রাজনীতির শর্টকোর্সও বলতে পারেন। মোটামুটিভাবে শর্টকোর্সটি নিম্নরূপ–

(১) অন্য দলের কিছু দোষ-বদনাম আর নিজ দলের কিছু কীর্তি মুখস্থ করে রাখা। বক্তৃতা-বিবৃতি, বয়ান-ভাষণ সবখানেই গড়গড় করে এগুলো বলতে থাকা। রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতির অর্থই হল নিজ দলের

www.maktabatulabrar.com

গুণকীর্তন করা আর অন্য দলের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করা। খিস্তী খেউড় করতে জানলে তো সোনায় সোহাগা। যেখানেই যাবেন, ঐ মুখস্থ ক্যাসেট ছেড়ে দিবেন। চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন না থাকায় কথা মুখে আঁটকাবে না। অল্প কয়েক দিনেই তুখোড় বক্তৃতাবাজ হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে পারবেন।

(২) প্রতিপক্ষের কোন গুণের স্বীকৃতি না দেয়া। প্রতিপক্ষ যত ভাল কিছুই করুক না কেন, সেটাকে ভাল বলে স্বীকৃতি দেয়ার মত উদারতা অতি অবশ্যি পরিহার করে চলতে হবে। প্রতিপক্ষ যদি মসজিদও বানায়, তবুও তার মধ্যে সমালোচনার ক্লু খুঁজে বের করতে হবে। এর বিপরীত নিজের দল যত খারাপ কিছুই করুক না কেন, সারের ন্যায্য দাবীতে বের করা কৃষকদের মিছিলে গুলি চালানো হোক বা ধর্মীয় কথা বলার স্বাধীনতা চেয়ে বের করা তৌহীদী জনতার মিছিলে গুলি চালানো হোক, তাতে নিজেদের দোষ স্বীকার করা যাবে না। বরং কথার মেকিয়াভেলিতে সেটাকে অন্যরকম রূপ দেয়ার চেষ্টা চালাতে হবে। পারলে নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ফেরেশতা সেজে বসে যেতে হবে। সরকারী দল হলে বলতে হবে, এটা বিরোধীদের সাবোটাজ। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস, ইত্যাদি। আর বিরোধী দল হলে বলতে হবে এটা বিরোধী দলের বিররুদ্ধ সরকারের চক্রান্ত বা এ জাতীয় কিছু।

(৩) প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য, হত্যা-গুম করার জন্য ক্যাডার বাহিনী রাখতে হবে। সাদা বাংলায় এই ক্যাডার বাহিনী অর্থ খুনী বাহিনী। এদেরকে দিয়ে শুধু প্রতিপক্ষের লোকজনকেই খুন করা হয় না, নিজেদের লোকজনকেও খুন করা হয়, আর সেই খুনের দায় প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপকৌশল নেয়া হয়। এই ক্যাডার বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং তাদের রসদ যোগানোর জন্য চাই অস্ত্র-শস্ত্র, চাই প্রচুর অর্থকড়ি। সাদা টাকা দিয়ে এত অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব নয়। তাই চাই কালো টাকা। অতএব কর চাঁদাবাজি, সহযোগিতা নাও মাফিয়া চক্রের গডফাদারদের। অবলম্বন কর আরও যত উপায় আছে কালো পথে টাকা উপার্জনের।

(৪) যখন যেখানে যেমন, তখন সেখানে তেমন রূপ ধরতে হবে। মীলাদের মজলিসে গিয়ে দুরূদে টান দেয়া আর বখাটেদের মজলিসে গিয়ে

গাঁজার কল্কেয় টান দেয়া সবটাতেই পারদর্শী হতে হবে। সীরাত মাহফিলে টুপি মাথায় দিয়ে রসূল-প্রেমের দরদভরা বক্তৃতা ঝেড়ে রসূলের আশেক সাজার চেষ্টা করতে হবে, আবার চন্দন তীলক চর্চিত হয়ে কালি মন্দিরে গিয়ে কালি-প্রেমে গদগদ হয়ে উঠতে হবে। এমন বাহাত্তুরে ধরা বহুরূপী না হতে পারলে সর্বমহলের নন্দিত নেতা হওয়া যাবে না।

(৫) উপরোক্ত ৪ দফা হল সব সময়কার জন্য প্রযোজ্য। আর নির্বাচনের সময় আসলে দলের সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে ফেলতে হবে। নেতাদের চেহারা যেমনই থাকুক, মেকআপ রূমে নিয়ে চেহারা বদলে দিতে হবে। নির্বাচনে প্রার্থী কোন নেতা যদি সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ বা জনগণের জন্য ত্রাসও হয়ে থাকে, তবুও মেকআপ রূমে নিয়ে তাকে বানিয়ে ফেলতে হবে বিশিষ্ট সমাজ সেবক, জনদরদী, জনগণের দুঃসময়ের বন্ধু আলহাজ অমুক তমুক। হজ্জ ওমরা না করে থাকলে সদ্য করিয়ে আনতে হবে। পূর্বে করে থাকলেও আবার তাজা তাজা ঘুরে আসলে ভাল হয়। তাতে নির্বাচনী সিজন টুপি তাসবীহসহ কাটানোর আনুকূল্য সৃষ্টি হবে। এতটা না পারলেও অন্তত পায়জামা পাঞ্জাবী লাগানো, টুপি মাথায় দেয়া এবং মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা– এতটুকু তো করতেই হবে। বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতীমখানায় গিয়ে গিয়ে মোটা অংকের দানের প্রতিশ্রুতি প্রদানও অপরিহার্য। এসব প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলেও অসুবিধে নেই। কারণ নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি এমনই হয়ে থাকে। তাই সাধ্য-অসাধ্য চিন্তা না করে জনগণকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে, যাতে জনগণ মনে করে এবার এই দল/প্রার্থীকে নির্বাচিত করলে আমরা মনের সুখে দুধের সাগরে সাঁতার কাটতে পারব।

নির্বাচনে জেতার জন্য মাস্তান ভাড়া করা, বিড়ি সিগারেটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা, মরা মুরগির দামে ভোট কেনা, স্বামী বা পিতার নাম বদলে ভোট দেয়ার মত লোক রেডি রাখা, কবরস্থান বা শ্মশান থেকে লোক তুলে এনে তাদেরকে দিয়ে ভোট দেয়ানো, অর্থাৎ, তাদের নামে অন্যদেরকে দিয়ে সিল মারানো, ভোট-বাক্স ছিনতাই ইত্যাদি পুরনো ঐতিহ্য চর্চা তো বহাল রাখতেই হবে। নতুবা ভোট সংস্কৃতিকে অবমাননা করা হবে!

এতসব কিছু করার পরও যদি নির্বাচনী ফলাফল অনুকূলে না আসে, তাহলে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে উঠতে হবে এ ফলাফল মানি না– নির্বাচন সুষ্ঠু

www.maktabatulabrar.com

হয়নি, কারচুপি করা হয়েছে, চক্রান্ত করে আমাদের বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে ইত্যাদি। এ জাতীয় কথা লেখা ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ড আগে থেকেই রেডি রাখতে হবে। যাতে ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করা যায়। আর যদি ফলাফল অনুকূলে আসে, তাহলে যেন বিজয় মিছিল বের করা যায়– এমন কিছু কথা লেখা ব্যানার ইত্যাদিও আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে হবে।

আমাদের দেশে রাজনীতি করতে হলে এরকম অনেক ধরনের ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ড, বিবৃতি ইত্যাদি স্টান্ডবাই রাখতে হয়। যখন বাজেট অধিবেশন শুরু হবে, তখন বিরোধী দল হলে আগে থেকেই ব্যানার-বিবৃতি প্রস্তুত রাখতে হবে– 'এ গণবিরোধী বাজেট, গরীব মারা বাজেট মানি না' ইত্যাদি। আর সরকারী দল হলে গণমুখী বাজেট, উন্নয়নমূলক বাজেট ও যুগোপযোগী বাজেট–এর জন্য অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা ব্যানার-বিবৃতি প্রস্তুত রাখতে হবে। বিরোধী দল হরতাল ডাকলে পরের দিন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পত্রিকায় বিবৃতি আসবে– 'স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ'। আর সরকারী দলের বিবৃতি থাকবে 'জনগণ হরতালকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' হতে পারে নেতা/নেত্রীরা হরতালের দিন দেশে উপস্থিত থাকবেন না, তাই আগে থেকেই ওরকম বিবৃতি তৈরী করে তাতে নেতা/ নেত্রীর সই রেখে দিতে হবে। পরে বাস্তব অবস্থা যা-ই হোক না কেন।

(৬) সর্বশেষ বিষয়টি হল– কথা কাজে গরমিল কেন বা আগে পরের কথায় বৈপরীত্য কেন? কোন চক্ষু লজ্জাহীন সাংবাদিক বা বেরসিক কোন ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন করে বসলে সেটার উত্তর দিতে হবে– 'রাজনীতিতে কোন শেষ কথা নেই।' এ কথাটি রাজনৈতিক অঙ্গনের একটা বড় হাতিয়ার। যখন যেমন যা ইচ্ছা বলে যাবেন, যখন যেমন যা ইচ্ছে করে যাবেন, পূর্বের কথা বা কাজের সঙ্গে গরমিল হলেও কোন সমস্যা নেই। প্যাঁচে পড়লেই বলবেন, 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।' এ নীতির আওতায় চুটিয়ে সব মুনাফেকিতা চালিয়ে নেয়া যাবে। শি'আ সম্প্রদায়ের একটা নীতি আছে, যার নাম 'তাকিয়া'। 'তাকিয়া' হল মনে যা আছে, কথা বা কাজে তা ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ করা। এরূপ তাকিয়া করা শি'আ ধর্মে শুধু বৈধই নয়; বরং অনেক ছওয়াবেরও কাজ। বর্তমান ইরানের বার

ইমামপন্থী শি'আগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমর (রা.)সহ সিংহভাগ সাহাবীকে (নাউযুবিল্লাহ!) গুমরাহ, ফাসেক, জালেম ইত্যাদি মনে করে! তাদের বড় বড় নেতাদের লিখিত ধর্মীয় বই-পত্রেও এসব সাহাবীদের প্রতি স্পষ্ট বিষোদগার দেখতে পাওয়া যায়। অথচ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে যে, এসব সাহাবী হকপন্থী ছিলেন। এখানে তারা তাকিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেই মনের কথার বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে।

এক সময় মনে করতাম, তাকিয়ার নামে মুনাফেকিতাকে বৈধ করার এমন সনদ বোধ হয় শি'আ সম্প্রদায় ছাড়া পৃথিবীর আর কোন গোষ্ঠি প্রদান করেনি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম 'রাজনীতির কোন শেষ কথা নেই'– বলে রাজনীতিক গোষ্ঠিও মুনাফেকিতার সনদ দিতে শি'আদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে থাকেনি বরং আরও কয়েক হাত অগ্রসর। শি'আরা শুধু ধর্মীয় আদর্শগত মনের কথাটা গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই তাকিয়ার আশ্রয় নিয়ে থাকে। আর রাজনীতিকরা রাজনৈতিক জীবনের সর্বস্থানে প্যাঁচ ছাড়ানোর সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে ঐ দর্শনটা ব্যবহার করে থাকে। এমনকি স্বার্থ উদ্ধার হতে না দেখে জার্সী বদল করে এতদিন গলা ছেড়ে যে দলকে গালি দিত সেই দলে যোগ দিলেও যখন নাক কাটা সাংবাদিকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তখনো তারা এই বলে আত্মরক্ষা করে যে, 'রাজনীতির কোন শেষ কথা নেই।' এই হল মোটামুটি রাজনীতির শর্টকোর্স।

এবার ফিরে যাওয়া যাক সেই শাহবাগের মোড়ে। যেখানে একই প্রতিষ্ঠানের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও পিজি হাসপাতাল'-এ দুই নাম নিয়ে প্যাঁচে পড়া গিয়েছিল। এবার চোখে দেশীয় রাজনীতির চশমা আঁটুন, যে রাজনীতি প্রতিহিংসা ও জীঘাংসায় ভরপুর, যে রাজনীতি প্রতিপক্ষকে বরদাশ্ত করতে পারে না ক্ষণিকের জন্যও, যে রাজনীতি শুধু আপন দলের কীর্তির ফলাও-প্রচার দেখতে চায় সর্বত্র। এই রাজনীতির চশমা চোখে আঁটুন! এক দলের চশমা চোখে আঁটলে দেখবেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণটি স্বার্থক নামকরণ হয়েছে। এর মধ্যে যেন জাতির আবেগ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আরও সুন্দর হত যদি জাতির জনক শব্দটিও এর সঙ্গে যোগ করে দেয়া হত! তখন তা আরও স্বার্থক হত। যারা এই নাম বর্জন করে 'পিজি হাসপাতাল' নামে

www.maktabatulabrar.com

ব্যানার ঝুলিয়েছে, সামনে সুযোগ আসলে তাদেরকে এক হাত দেখে নেয়ার জন্য রক্ত ঝিলিক মারতে থাকবে। যদিও ততক্ষণে তারা ব্যানার পাল্টে ফেলবে এবং অতীত কর্মের ব্যাপারে বলবে-'রাজনীতির কোন শেষ কথা নেই।' এর বিপরীত আর একটা প্রতিপক্ষ দলের চশমা চোখে আঁটলে দেখবেন পি, জি নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ একটা বিরক্তিকর বাড়াবাড়ি। এটা একটা অপাঙক্তেয় নাম। এটা না মোছা পর্যন্ত যেন স্বস্তি বোধ হচ্ছে না।

শুধু এ নামকরণটাতে নয়, এভাবে দেশের সব কিছু দর্শনে, সবকিছু বিবেচনায় এ দু'টো দলের চশমায় এরূপ বিপরীতমুখিতা, এরূপ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে। এ কারণেই চলছে এত হিংসা, প্রতিহিংসা, জিঘাংসা। সেই প্রতিহিংসার আগুনে মাঝখানে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে জাতির আশা-ভরসা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে হতাশার অমানিশা। জাতি খুঁজে পাচ্ছে না তার চলার পথের দিশা। জাতির মনে বার বার উত্থিত হচ্ছে একটা জিজ্ঞাসা– কবি ফররুখ আহমদের পাঞ্জেরী কবিতার সেই প্রসিদ্ধ পংক্তিটি–

'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী'

শিশুপার্ক ও রমনা পার্ক দর্শন

শাহবাগ চৌরাস্তা থেকে পশ্চিম দিকের রাস্তাটি গিয়েছে হাতিরপুল, এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরী, গাউসিয়া ও নিউ মার্কেটের দিকে। দক্ষিণ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, টি এস সি। পূর্ব দিকে ঢাকা ক্লাব ও শিশু পার্কের মধ্য দিয়ে সড়কটি এগিয়ে গেছে মৎস ভবন ও সড়ক ভবনের দিকে। এ রাস্তা দিয়ে মিনিবাসটি এগিয়ে চলছিল। এর বাঁ দিকে রমনা পার্ক, ডান দিকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান –এক কালের রেস কোর্স ময়দান। এই উদ্যানেরই এক প্রান্তে গড়ে তোলা হয়েছে শিশু পার্ক। এটি নামে শিশু পার্ক হলেও কার্যত আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই পার্ক। সব শ্রেণীর সব বয়সের নারী-পুরুষেরই সরগরম সমাবেশ হয় ওখানে। তবে বয়স যাই হোক না কেন, ওখানে প্রবেশের পর সকলেই শিশু হয়ে যায়।

তাই দেখা যায় নিজ নিজ বয়সের বাছ-বিচার ভুলে গিয়ে সকলেই কাঠের তৈরী ঘোড়ায় চড়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, খেলনা বিমানে আরোহণ করছেন। আরও কত কিছু শিশুর মত করছেন। এভাবে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবন জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষেরা শিশুদের মত নির্মল আনন্দে চিত্তের প্রশান্তি ঘটাচ্ছেন, চিত্তবিনোদন করছেন। এই চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যটাই এখানে কার্যত মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে তরুণ-তরুণীদের বেশি ভিড় বোধ হয় এ কারণেই। শুধু এই শিশু পার্ক নয়, পাশের সোহরাওয়ার্দি উদ্যান ও রমনা পার্ক সবটাই হল বিনোদন কেন্দ্র। চতুর্দিকেই বিনোদনের আয়োজন।

মিনিবাসটি কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সড়ক ভবনের সামনে লম্বা সিগন্যালে দীর্ঘক্ষণ আঁটকে রইল। সড়ক ভবনের সামনে এরকম দীর্ঘক্ষণ আঁটকে থাকা নাকি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঢাকা শহরের কোথাও যানজট না থাকলেও এখানে নাকি থাকবেই। বোধ হয় সড়ক বিভাগের উপর সারির কর্মকর্তাদেরকে সড়ক ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা এবং সড়কের বেহাল অবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্যই প্রাকৃতিকভাবে এই আয়োজন। যাহোক, দীর্ঘক্ষণ গাড়িটি এখানে আঁটকে থাকার ফলে পাশে অবস্থিত রমনা পার্কের ভিতর একটু সন্ধানী নজর বুলিয়ে নেয়ার ফুরসত পেলাম।

রমনা পার্ক। রাজধানীর সর্ববৃহৎ পার্ক। বিশাল এরিয়া জুড়ে বিস্তৃত, বিহার বিনোদনের বিশাল আয়োজনসমৃদ্ধ পার্ক। দেশী বিদেশী রকমারী গাছ-পালায় ভরা এ পার্ক। লতা-পাতা, ফল-ফুল সবরকম গাছের প্রচুর সমারোহ। মাঝে মাঝে রয়েছে বিভিন্ন গাছের তলায় বা আশেপাশে নির্মিত পাকা বেঞ্চ ও রঙ্গিন ছাতা। আরও রয়েছে আঁকা-বাঁকা লেক। এই সব কিছু মিলিয়ে রমনা পার্ক হয়ে উঠেছে রমনীয়। রমণীদের রমরমা পদচারণা সেটিকে করে তুলেছে আরও রমণীয়। বেঞ্চে বেঞ্চে বা গাছের তলায় তলায় কপোত-কপোতীরা জোড়ায় জোড়ায় রমণ কার্যে আছে রত। রমণেচ্ছু পুরুষ কর্তৃক সেই রমণীরা হচ্ছে রমিত। এভাবে বোধ হয় রমনা পার্ক যে উদ্দেশ্যে নির্মিত, তা হয়ে উঠেছে স্বার্থক ও স্বীকৃত। যদিও অনেকের কাছে এসব কেলিকর্ম হয়ে থাকে ধিকৃত। কারণ তাতে চরিত্র হয়ে যায় বিকৃত। কেউ এসবের প্রতি চরমভাবে বিমুখ, আবার কেউ এসবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মূলত এই মত বিভিন্নতা নির্ভর করছে– কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে এগুলোকে দেখছেন, তার উপর। যে যেমন চশমা এঁটে

www.maktabatulabrar.com

দেখছেন, তার কাছে এগুলো তেমন মনে হচ্ছে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের চশমা চোখে এঁটে আমরাও বিষয়টাকে একটু দেখে নিতে পারি।

ঝুলি থেকে প্রথমে বের করলাম একটি গ্রামীণ চশমা। এটি সাদামাটা হাবাগোবা গ্রাম্য লোকের চশমা। এ চশমা পরিহিত গ্রামীণ লোকেরা পল্লীর মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-ঝিল, ফসলের ক্ষেত, পশু চারণের ক্ষেত্র, মেঠো পথ আর কাদা পানির দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। রাতের আঁধারে আলো বলতে যারা দেখে থাকে কেরোসিনের চেরাগ, হারিকেন বা বেশির থেকে বেশি বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হলে হ্যাজাক লাইটের আলো। অবশ্য ইদানিং পল্লী বিদ্যুতের স্বল্প ভোল্টেজের বাতিও অনেক স্থানে সংযোজিত হয়েছে। এই চশমা চোখে আঁটতেই ঢাকা শহরের এই সব জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ দেইখ্যা মনের আশা পুরাইয়া গেল। এই সব লাল লাল, নীল নীল বাতি দেইখ্যা নয়ন জুড়াইয়া গেল। কত রং বেরংয়ের পোশাকে সাইজ্যা মাইয়্যা-পোলারা পার্কের মইধ্যে ঘুরতাছে, জোড়ায় জোড়ায় লেকের পাড়ে কিংবা রঙ্গিন ছাতার তলায় বইস্যা কত সুন্দরভাবে মনের সুখে গল্প করতাছে। এই সব মনোরম দৃশ্য দেইখ্যা মন পরাণ জুড়াইয়া যাইতাছে। আহা কী মধুর! কী সুন্দর! প্যাটের থেইক্যা উথলাইয়া উঠতাছে–

ঢাকা শহর আইসা আমার ...!
রং বেরংয়ের বাতি দেইখ্যা ...!!

এরপর পরিবেশ বিজ্ঞানের চশমা চোখে আঁটলাম। মানুষের জীবন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধে গাছপালা ও বৃক্ষ লতার প্রয়োজন চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই গাছপালা বৃক্ষ-লতা আমাদের জীবন রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। জীবন রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন অক্সিজেন। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি। আবার ব্যবহৃত অক্সিজেনকে যখন বর্জ্য আকারে বর্জন করি, তখন সেটা হয়ে যায় কার্বনডাইঅক্সাইড নামক এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস। এভাবে প্রতিনিয়ত অক্সিজেন কার্বনডাইঅক্সাইডে পরিণত হচ্ছে। গাছ পালা বৃক্ষ লতা এই কার্বনডাই অক্সাইডকে শোষণ করে নেয় এবং আমাদের জন্য নির্মল অক্সিজেন সরবরাহ করে। এভাবে গাছপালা ও বৃক্ষলতা আমাদের জীবন রক্ষায় অদৃশ্য অথচ অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

এ ছাড়াও বায়ু দূষিত হচ্ছে নানান ভাবে। কলকারখানার চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া ও যানবাহনের কালো ধোঁয়ার দ্বারা এবং নানান রকম বিস্ফোরক দ্রব্যের বিস্ফোরণ দ্বারাও বায়ু দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই সব রকম বায়ু দূষণ প্রতিরোধে গাছপালা ও বৃক্ষলতা অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতি সমৃদ্ধ এই ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ যেখানে চরম মাত্রায় উপনীত হয়েছে, সেখানে ঢাকা শহরের কেন্দ্রে গাছপালা ও বৃক্ষলতার এই বিশাল আয়োজন নাগরিক জীবনের জন্য কত যে অপরিহার্য, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এক একটি বৃক্ষ যেন জীবন রক্ষার এক একটি অপরিহার্য উপাদান। তাই রমনা পার্ক, সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, উসমানী উদ্যান ও বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি হল আমাদের জীবন ও পরিবেশ রক্ষার অপরিহার্য আয়োজন।

এরপর বের করলাম আর একটি চশমা। এটি হল তথাকথিত চিত্ত-বিনোদনের চশমা। "তথাকথিত" বলার কারণ হল চিত্ত-বিনোদন কথাটি আমার কাছে নিতান্তই দুর্বোধ্য। তারপরও অনেকে বলেন, তাই আমিও বললাম। শুধু যে দুর্বোধ্য তা নয়, যেসব কর্মকাণ্ডকে বল্গাহীনভাবে চিত্ত-বিনোদন বলে চালিয়ে দেয়া হয়, তাকে কোনক্রমেই স্বীকৃত চিত্ত-বিনোদন বলে মেনে নেয়া যায় না। তবুও সেগুলোকে চিত্ত-বিনোদন বলা হচ্ছে। কাজেই "তথাকথিত" শব্দটি ব্যবহার করা বৈ গত্যন্তর রইল না।

এই চিত্ত-বিনোদনের চশমা চোখে আঁটলে গান-বাদ্য, নাচ-ড্যান্স, নারী-পুরুষের ঢলাঢলি, গলা-গলি, নর্তন-কুর্দন, সিনেমা-বাইস্কোপ ও নাটক- থিয়েটার ইত্যাদি সব কিছুকেই চিত্ত-বিনোদনের উপকরণ বলে মনে হয়। অবাধ যৌন চাহিদা মেটানোর যত রকম কেলিকর্ম, ফ্রী সেক্স নীতির যত রকম অনুশীলন, সবই তখন চিত্ত-বিনোদনের লেবেলে স্বীকৃতি পেয়ে বসে। রমনা পার্কের নিভৃত বৃক্ষের ছায়ায় আইল ঠেলে যত পয়মালি হয় কিংবা কাউকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে লেকের পাড়ে নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া যতই ডিঙ্গানো হয়, তার কোনটাই আর স্বীকৃতি পেতে বাদ যায় না। এমনকি বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষের লিভ টুগেদার পর্যন্ত সেই চিত্ত-বিনোদনের আওতায় পড়ে যায়। এই চিত্ত-বিনোদনের নেই কোন নির্ধারিত সীমানা বা চৌহদ্দি। যৌন বিষয়ক সব রকম মাতামাতি, ঢলাঢলি, সুড়সুড়িমুলক সব রকম গুটি চালাচালি, সবই এর আওতায় পড়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

এই চিত্ত-বিনোদনবাদীদের একটাই যুক্তি। তা হল চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে। "চিত্ত" অর্থ মন, হৃদয়, অন্তকরণ। আর "বিনোদন" অর্থ প্রফুল্লতা বিধান, আনন্দ দান, তুষ্টি সাধন। অতএব চিত্ত বিনোদনের অর্থ হল মনের প্রফুল্লতা বিধান, মনকে আনন্দ দান, মনের তুষ্টি সাধন। কাজেই যা কিছু মনকে প্রফুল্ল করবে, যা কিছুই মনকে আনন্দ দিবে, তা সবই "চিত্ত-বিনোদনের" আওতায় পড়বে এবং প্রয়োজন হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

এই চিত্ত-বিনোদবাদীরা কোন্ অভিধান ব্যবহার করেন জানি না। সম্ভবত তাদের অভিধানে বেহায়া-বেলেল্লাপনা, অশ্লীলতা, নগ্নতা, বখাটেপনা ইত্যাদি শব্দগুলো নেই। নারী অপহরণ, নারীর সতীত্ব হরণ, রাস্তা-ঘাটে মা বোনদেরকে নাজেহাল করণ, পরের মেয়েকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করণ ইত্যাদি ধারণাগুলোও তাদের সমাজে নেই। কারণ এ সবই তো চিত্ত-বিনোদনের আওতায় পড়ে। কেউ কোন নারীকে অপহরণ করে তার সতীত্ব লুটে নিয়ে যদি চিত্তের আনন্দ বিধান করতে চায়, তাও "চিত্ত-বিনোদন"-এর আওতায় পড়া চাই। কিন্তু কোন চিত্ত-বিনোদনবাদীর জায়া কন্যার ক্ষেত্রে সেরূপ ঘটলে কেন তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা বুঝে উঠতে পারি না। নিজের বেলায় এটা চিত্ত-বিনোদন বলে প্রয়োজনীয় ও স্বীকৃত আখ্যায়িত হলে অন্যের বেলায় কেন সেটাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য আইনের আশ্রয় খোঁজা হবে? এ জন্যই বলেছিলাম "চিত্ত-বিনোদন" কথাটার অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গেল। আর চিত্ত-বিনোদন কথাটার আভিধানিক ব্যাপকতার আওতায় সব রকম নষ্টি-ফষ্টি যদি বৈধ হয়ে যাবে, তাহলে মা কন্যা প্রমুখের সঙ্গেও ইয়ে টিয়ে সব এক প্রবাহে লীন হয়ে যাবে। তা কেমন করে মেনে নেয়া যায়? অবাধ চিত্ত-বিনোদনবাদীরাও বোধ করি তা মেনে নিবেন না। নিশ্চয় এখানে এসে তারা চিত্ত-বিনোদনের একটা চৌহদ্দি দাঁড় করাবেন এবং অন্তত এ ক্ষেত্রগুলোকে ব্যতিক্রম রাখবেন। তাহলে কিন্তু "চিত্ত-বিনোদন"-এর অবাধ অর্থ আর রইল না। এ ক্ষেত্রগুলোকে ব্যতিক্রম রাখার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা নীতি-নৈতিকতা বোধ কাজ করবে। অতএব কারও নীতি-নৈতিকতা বোধ যদি আরও ব্যাপক হয় এবং তার বিচারে "চিত্ত-বিনোদন"-এর আওতা থেকে আরও অনেক ক্ষেত্র ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হয়, তাহলে চিত্ত-বিনোদনবাদীদেরকেও নীতিগতভাবে তা মেনে নিতে হবে। কারণ

নীতি-নৈতিকতার আওতায় ব্যতিক্রম সাধনের মূলনীতি তারাও স্বীকার করেন। তাই বলেছিলাম বল্গাহীনভাবে সব রকম সুড়সুড়িমূলক কর্মকাণ্ডকে চিত্ত-বিনোদন বলে চালিয়ে দেয়াকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না।

যাহোক, আমাদের কাছে অবোধগম্য থাকুক বা না থাকুক, আমরা মেনে নেই আর না নেই, চিত্ত-বিনোদবাদীদের একটা চশমা রয়েছে, যে চশমায় অনেক কিছুকেই তারা চিত্ত-বিনোদনের উপকরণ হিসাবে দেখতে পায়। এই চশমা চোখে এঁটে রমনা পার্কের দিকে দৃষ্টি বুলাতেই চিত্তের মাঝে আনন্দের প্রবাহ খেলে গেল। এখানে চিত্ত-বিনোদনের সব রকম উপকরণ রয়েছে। দু'জনে দু'জনার হয়ে যাওয়ার মত নিভৃত কোণও রয়েছে। পাড় বাঁধানো লেকের পাশে, গাছের তলায় পাকা বেঞ্চে কিংবা রঙ্গিন ছাতার তলে যেখানেই ইচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় নিবিড় হয়ে বসে পড়া যায়। সেই বসাতে সালাদ সংযোজনের জন্য পাওয়া যায় বাদাম, বুট, চটপটি, ফোসকা। আরও রয়েছে আশে পাশে চাইনিজের ব্যবস্থা। জীবন-জ্বালায় অতিষ্ট মানুষের চিত্তের জ্বালা প্রশমনের তরেই এই সব আয়োজন। আটপৌরে জীবনে বৈচিত্র আনতে হলে এখানেই চলে আসুন। সম্ভব হলে নেগেটিভ পজিটিভ জোড়া বেঁধে আসুন। জীবনটাকে উপভোগ করা চাই। খাও দাও ফূর্তি কর। নীতি নৈতিকতার জঞ্জাল (?) থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতির হাওয়ায় ডানা মেলে উড়াল দাও। যুগ ঢেউয়ের তালে তালে জীবন তরীর বৈঠা বেয়ে চল। যখন যে দিকের হাওয়া আসে, সে দিকে পাল খাটাও, সহজে সামনে এগিয়ে যাবে। জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। নীতি-নৈতিকতার শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে চার দেয়ালের মধ্যে আঁটক থাকতে চাই না। আমি হতে চাই মুক্ত বিহঙ্গ/বিহঙ্গী।

ইন্টারনাল অর্গানগুলো যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। ভিতর থেকে এ ভাবনাগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। সফর পথে এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাই চোখ থেকে চিত্ত-বিনোদনের চশমা জোড়া সহসা খুলে ফেললাম।

এবার সাদা চোখে অর্থাৎ, প্রাকৃতিক চশমায় বিষয়টাকে দেখতে চাইলাম। এ চশমা শান্ত শিষ্ট, উগ্রতামুক্ত, নিরুত্তাপ ও নিরুদ্বিগ্ন। এ চশমা চোখে এঁটে দেখলাম চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজন আছে। একটু ফুর্তি, একটু মনের প্রফুল্লতা ছাড়া জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। জীবনের দুঃখ, কষ্ট, শ্রম ও

www.maktabatulabrar.com

সাধনার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মাঝে একটু আনন্দ-সুখের অনুভূতি ছাড়া জীবন চলতে পারে না। এই ফুর্তি, মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দ সুখ উপভোগ করা, এটাই হল চিত্ত-বিনোদন। এই চিত্ত-বিনোদন ছাড়া কেউ চলতে পারে না। চিত্তের এতটুকু চাহিদা না মেটালে সে চিত্ত অচল হয়ে পড়বে। তবে চিত্তের চাহিদার ধরন ও তা পূরণের পদ্ধতি কি, তা অবশ্যই বিচার্য। সব চিত্তের দাবী পূরণ করা যায় না, আবার সব পদ্ধতিতেও পূরণ করা যায় না। কেউ যদি আকণ্ঠ মদ পান করে চিত্তের বিনোদন করতে চায়, কিংবা গলা ছেড়ে কাউকে গালি দিয়ে চিত্তসুখ অনুভব করতে চায়, অথবা ছিনতাই-ডাকাতি করে চিত্ত-বিনোদনের সাশ্রয় করতে চায়, তাহলে তা স্বীকৃতি পেতে পারে না। সারকথা চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজন স্বীকৃত, তবে তা লাগামহীন নয়, তার একটা চৌহদ্দি থাকতে হবে।

এই চৌহদ্দিটা কি, তা নির্ধারণের দায়িত্ব মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না। তাহলে যার চিত্ত যেমন, সে অনুযায়ী সে চৌহদ্দি নির্ধারণ করবে। আর তাহলে সেই চৌহদ্দি অমীমাংসিতই থেকে যাবে। তাই আল্লাহ্ স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর চৌহদ্দি। শরীয়তের বিধি-বিধান হল অন্য সব কিছুর মত এরও চৌহদ্দি। কুরআনে কারীমে ইসলামের বিধি-বিধানগুলোকে তাই "হুদূদুল্লাহ" অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত চৌহদ্দি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শরীয়ত প্রবর্তক রসূল (সা.) সেই চৌহদ্দির মধ্যে থেকে চিত্ত-বিনোদন করে হাতে কলমে দেখিয়ে গেছেন চিত্ত-বিনোদনের ধরন ও পদ্ধতি কেমন হবে। সেটাই হল চিত্ত-বিনোদনের স্টান্ডার্ড রূপ। আল্লাহর রসূল বিবির সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে ঈমান-আকীদার সীমানা লংঘন না করে, কারও আত্মমার্যাদায় আঘাত না দিয়ে নানান কৌতুক ও হাস্য রসিকতা করেছেন। নিজে ঘোড়া সেজে নাতী হাসান হোসাইনকে পিঠে চড়িয়ে চার হাত পা দিয়ে হেঁটেছেন। এভাবে আল্লাহর রসূল চিত্ত-বিনোদন করেছেন। চিত্ত-বিনোদনের স্টান্ডার্ড রূপ তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন। এটাই হল স্বীকৃত চিত্ত-বিনোদন। চিত্ত-বিনোদনের এই স্টান্ডার্ড রূপ–এর মানদণ্ডে যখন রমনা পার্কের তথাকথিত চিত্ত-বিনোদনের স্টাইলগুলোকে মেপে দেখা হবে, তখন সেগুলোকে চিত্তের স্বীকৃত বিনোদন নয়; বরং চিত্তের বিকৃত অনুশীলন বলা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। এখন

চর্চিত যেসব কেলিকর্মকে চিত্ত-বিনোদন বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার দ্বারা চিত্তের উন্নতি হয় না বরং অধঃগতি হয়।

সবশেষ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চশমায় দেখা রমনা পার্কের প্রয়োজনের উপর একটু নজর বুলিয়ে নিতে চাই। মানুষের জীবন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষলতার যে ভূমিকার বয়ান তারা দিয়েছেন, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেও বলা যায়, রমনা পার্ক কিন্তু আদৌ এ উদ্দেশ্যে সাজানো হয়নি, তাহলে এর মধ্যে এত চেয়ার টেবিল আর ছাতি লাঠির আয়োজন রাখা হত না। এর মধ্যে এত টাকা খরচ করে লেক বানানো আর তার মধ্যে বিহারের জন্য কিম্ভুত-কিমাকার নৌকা-বৈঠার ব্যবস্থা রাখা হত না। এসব যোগাড় আয়োজন দেখে স্পষ্টতই বুঝা যায় জীবন আর পরিবেশ রক্ষার বৃহৎ উদ্দেশ্যে এ বাগান আদৌ সাজানো হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য হল উপরোক্ত তথাকথিত চিত্ত-বিনোদন।

ইতিমধ্যে দীর্ঘ সিগন্যালের অবসান ঘটল। মিনিবাসটি সামনে অগ্রসর হতে শুরু করল।

জাতীয় ঈদগাহ দর্শন

মিনিবাসটি মৎস ভবনের সম্মুখস্থ গোল চক্কর ঘুরে ডান দিকে মোড় নিয়ে দক্ষিণ দিকে কিছু দূর অগ্রসর হল। এখানে সড়কের পূর্ব পার্শ্বে পূর্তভবন, তার কিছু দক্ষিণে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অফিস। আর সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত একটা বিশাল ময়দান। এটা হল জাতীয় ঈদগাহ ময়দান। ঈদগাহের এ ময়দানটাকে জাতীয় ঈদগাহের ময়দান আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ রকম অনেক কিছুকেই 'জাতীয়' বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। যেমন– জাতীয় মাছ ইলিশ, জাতীয় ফল কাঠাল, জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় স্টেডিয়াম, জাতীয় যাদুঘর, জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাতীয় মসজিদ ইত্যাদি। এই 'জাতীয়' কথাটির অর্থ কি তা এখনও আমি সঠিকভাবে স্থির করে উঠতে পারিনি।

'জাতীয়' কথাটির অর্থ যদি হয় সরকারী, তাহলে জাতীয় ঈদগাহ, জাতীয় স্টেডিয়াম, জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাতীয় মসজিদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে

www.maktabatulabrar.com

এটি প্রযোজ্য হতে পারবে; কারণ এগুলো সরকারী তত্ত্বাবধানে এবং সরকারী ব্যয়েই পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে জাতীয় মাছ, জাতীয় ফল, জাতীয় ফুল, জাতীয় পাখি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে পারবে না; কারণ এগুলোর সঙ্গে সরকারের তত্ত্বাবধান বা ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

যদি ধরা হয় 'জাতীয়' বিশেষণটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মর্যাদার প্রতীক হিসাবে সংযোজিত হয়েছে, তাহলে আরও হাজার লক্ষ বিষয় আছে যা এরূপ মর্যাদার প্রতীকী বিশেষণ লাভ করার অধিকার রাখে, তাদের কী অপরাধ? তারা কেন এ থেকে বঞ্চিত হল? জাতীয় জীব-জন্তু, জাতীয় কীট-পতঙ্গ, জাতীয় বৃক্ষলতা, জাতীয় খাল-বিল, জাতীয় নদী-নালা, জাতীয় রাস্তা-ঘাট, জাতীয় থালা-বাটি, জাতীয় ঘটি-লোটা, জাতীয় লাঠি-সোটা এরকম কত কিছুকেই তো জাতীয় বিশেষণে বিভূষিত করা যেত। আর করলেই কি এগুলোর মর্যাদা বেড়ে যেত? এই বিশেষণ লাভ করার পরও তো দোয়েল পাখি বাগানের মোকা-মাকড় খেয়েই জীবন নির্বাহ করে চলেছে। এই বিশেষণ লাভ করার পরও তো শাপলা ফুল হাওর-ঝিলে অবহেলিতই পড়ে থাকে। এমনকি শোনা যায় জাতীয় কবি-র অধস্তনরাও নাকি অর্থাভাবে অপাংক্তেয় জীবন যাপন করছেন। তাহলে এরূপ বিশেষণ কি শুধুই প্রহসন?

আর যদি 'জাতীয়' কথাটি জাতির জন্য মর্যাদাজ্ঞাপক হয়ে থাকে, তাহলে জাতীয় ফল কাঠাল, জাতীয় ফুল শাপলা আর জাতীয় পাখি দোয়েলের দ্বারা জাতির মর্যাদা কিভাবে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা মোটেই বোধগম্য নয়। তাই বলছিলাম এই 'জাতীয়' কথাটির অর্থ কি তা এখনও স্থির করে উঠতে পারিনি। তারপরও রয়েছে জাতীয় শব্দটির উৎপত্তিমূল–'জাতি' শব্দের কি অর্থ তা নিয়ে অস্থিরতা বা সিদ্ধান্তহীনতা অর্থাৎ, জাতি কি বাঙালী না বাংলাদেশী– এ নিয়ে ঐকমত্যহীনতা। তাছাড়া জাতীয়তা নির্ণীত হয় কি ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে? না ধর্ম, বংশ, ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে– এ নিয়ে প্রাচীন বিতর্ক তো রয়েছেই।

সম্ভবত এই জাতি, জাতীয়তা, জাতীয় ইত্যাদি শব্দগুলো সবযুগে সবস্থানে ঝামেলাই বৃদ্ধি করে থাকে। সেই অতীতে হিটলার মুসোলিনীও এই জাতীয়তার ধুয়া তুলেই সারা বিশ্বে কী হুলস্থূল কাণ্ডটাই না ঘটাল। আর নিকট অতীতেও হিন্দু মুসলিম জাতীয়তার প্রশ্নে ভারতবর্ষে কম কিছু

ঘটেনি। আর এখনও চলছে আমাদের দেশে বাঙালী আর বাংলাদেশী জাতীয়তার ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। তার পর যখন একজন নেতার নামের শুরুতে যোগ হল জাতির পিতা, তখনও সেটা বিবাদ-বিসংবাদই ডেকে আনল, যার কোন অবিসংবাদিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হল না। বোধ হয় এই জাত শব্দ এবং তা থেকে উৎপন্ন অন্যান্য শব্দগুলোর কপালেই এমন অমীমাংসা রয়ে গেছে। তাই 'জাতীয় ঈদগাহ'-এর 'জাতীয়' কথাটির অর্থেরও কোন মীমাংসা করা গেল না। জাত শব্দটি এমন বেজাত কেন হল কি জানি!

জাতীয়তা বিষয় নিয়ে শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই সব যুগে একটা হুলস্থূল কারবার রয়েছে। অথচ এ সম্পর্কে কেউই আজ পর্যন্ত কোন দ্ব্যর্থহীন সমাধান বের করতে পারেননি। এমনকি পারেননি জাতীয়তা-র কোন দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞাও বের করতে। তাই এখানে "জাতীয়তা" বিষয়টাকে যৎকিঞ্চিত লম্বা চওড়া করে দেখে নিতে চাই।

"জাতীয়তা" দর্শন

"জাতি" এবং "জাতীয়তা" কথা দুটো একটা আরেকটা থেকে সৃষ্ট। আরবীতে "কওম" (قوم) অর্থ জাতি। আর এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে "কওমিয়্যাত" (قوميت) তথা জাতীয়তা।

এই কওম ও কওমিয়্যাত তথা জাতি ও জাতীয়তা–এর কোন একক ও দ্ব্যর্থহীন বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা অর্থ আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অভিধানে তাই "জাতি" অর্থ লেখা হয় ধর্ম, জন্মভূমি, রাষ্ট্র, আদিম বংশ, ব্যবসা প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণী বিশেষ। কোন কোন অভিধানে "জাতীয়তা" বা হধঃরড়হধষরংস-এর অর্থ করা হয়েছে স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ। এটা একটা মোটামুটি অর্থ, নতুবা আমাদের দেশেও জাতীয়তা নির্ধারিত হয় ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে না ভাষার ভিত্তিতে অর্থাৎ, বাংলাদেশী জাতীয়তা না বাঙালী জাতীয়তা তা নিয়ে এখনও মতবিরোধ বিরাজমান। অথচ উভয় মতাবলম্বীই স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ–এর প্রবক্তা, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

www.maktabatulabrar.com

কেউ কেউ "জাতীয়তা"–এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– জাতীয় মঙ্গলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ। কিন্তু এ সংজ্ঞায় উল্লেখিত "জাতীয় মঙ্গল" কথাটির মধ্যে "জাতীয়" কথাটার কি অর্থ তা-ই তো অস্পষ্ট রয়ে গেল। সংজ্ঞার মধ্যে এটা স্পষ্ট করাই তো মূল প্রতিপাদ্য ছিল। তদুপরি এতে জাতীয়তার ভিত্তি কি (ধর্ম, না ভাষা, না ভৌগোলিক সীমারেখা, না সাংস্কৃতিক ঐক্য, না অন্য কিছু) তারও কোন দ্ব্যর্থহীন সমাধান বের হয়ে আসেনি।

প্রাচীন আরবদের নিকট কওমিয়্যাত বা জাতীয়তার ভিত্তি ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশীয় পরিচয়ের ঐক্য। যাদের রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয় এক, তারা এক কওম এবং তাদের এই স্বতন্ত্র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য কওমিয়্যাত বলে অভিহিত হত। এ অর্থে কওম বা জাতি হল একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত জনগোষ্ঠি বা গোত্র। কুরআনে কারীমে "কওম" শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত নূহ, হূদ, সালেহ প্রমুখ নবীগণের দাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁরা তাদের আদর্শ অমান্যকারীদেরকে يَاقَوْمِىْ অর্থাৎ, হে আমার জাতি! বলে আহবান করতেন তা কুরআনে কারীমে উল্লেখিত হয়েছে। তারা নবীদের আদর্শিক ঐক্যে একীভূত জাতি ছিল না বরং তারা ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যে একীভূত জাতি।

নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরোক্ত অর্থেই "কওম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ, (রসূল [সা.]-এর নিকট ইসলাম গ্রহণকারী জিনগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল,) হে আমাদের কওম (সম্প্রদায়), তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তাহলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (সূরা আহ্‌কাফ : ৩১)

আবার আদর্শিক ঐক্যে একীভূত জাতি অর্থেও কুরআন-হাদীছে "কওম" বা জাতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন– হাদীছে এসেছে–

اُولٰٓئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. (بخارى)

অর্থাৎ, তারা (কাফেরগণ) এমন কওম (সম্প্রদায়), যাদের ভাল কাজের বদলা তাদেরকে পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। (বোখারী) আর এক হাদীছে এসেছে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (احمد و ابو داؤد)

অর্থাৎ, যে অন্য কওমের (জাতির) সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে সেই কওমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

কুরআনে কারীমে জাতি কথাটার আরও এক রকম প্রয়োগ দেখা যায়। হযরত লূত (আ.) মূলত ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ছিল ইরাকে। তিনি নবী প্রেরিত হয়েছিলেন সাদূম এলাকার অধিবাসীদের নিকট। সেখানে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কেউ ছিল না। তার নিকট বালকের আকৃতিতে ফেরেশতারা আগমন করলে সে এলাকার লোকেরা অসদুদ্দেশ্যে তাদের নিকট আসে। তখন হযরত লূত (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা প্রয়োজনে আমার কন্যাদেরকে বিবাহ কর, তবুও আমার মেহমানদেরকে তোমরা অপমানিত কর না। আয়াতটি এই–

قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ. الاية.

অর্থাৎ, হে আমার জাতি, এই আমার কন্যাগণ রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য (নিয়মানুসারে) অধিক পবিত্র (হতে পারে)। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে তোমরা আমার মেহমানদের বিষয়ে অপমানিত কর না। (সূরা হুদ : ৭৮)

স্পষ্টতই তিনি তাদেরকে আদর্শিক ঐক্য বা রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যের ভিত্তিতে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেননি। বরং বলা যায় আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতেই তিনি তাদেরকে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কুরআন-হাদীছে জাতি ও জাতীয়তার এমন বহুরূপী প্রয়োগ থাকার কারণে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি হল ধর্ম। আবার এটাও বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি বংশ, বর্ণ, বা ভৌগোলিক সীমারেখা বা অন্য কিছু।

মূলত ইসলাম 'জাতি' বা 'জাতীয়তা'-কে কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধক পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে অবস্থার

www.maktabatulabrar.com

প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এ দুটোকে পরিভাষায় রূপ দিয়েছে এবং জাতীয়তার ভিত্তি কি সে বিষয়ে নিজ নিজ স্বার্থ বা অবস্থার ভিত্তিতে মতামত প্রদান করেছে। বিংশ শতাব্দির প্রথম কয়েক দশক উছমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব দেশসমূহের জাগরণ ও আরব জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের অর্থে আরব জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার শুরু হয়। তারপর আরবদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামাজিক বিপ্লবের উপায় হিসাবে তারা আরব জাতীয়তাবাদ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। তখন থেকে আরব জাহানের চিন্তাবিদগণ আরব জাতীয়তাবাদকে একটা দৃঢ় মতবাদের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তীনে আরব মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ নব শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমানকালে আরব জাতীয়তাবাদের বড় সোচ্চার কণ্ঠ হল বাথ (Bath) পার্টি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এ পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি তা আজও অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন রয়ে গেছে। এভাবে বিভিন্ন সময় উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়, তুরস্কে, ইরান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নকে মুখ্য বিবেচনায় সব ধর্মের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বহু আলেম মুসলিম হিন্দু ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বী এক জাতি– এরূপ এক জাতিতত্ত্বের ধারণা পেশ করেন। আবার মুসলিম স্বাতন্ত্র ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনবোধকে উদ্বুদ্ধ করার চেতনায় অনেকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দর্শন পেশ করেন। তারা হিন্দু মুসলিম দুই জাতি– এরূপ দ্বিজাতি-তত্ত্ব–এর ধারণা পেশ করেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য বরাবরই রাজনৈতিক ও কৃষ্টি-কালচার ভিত্তিক এক জাতীয়তার দর্শন পেশ করে আসছে।

কেউ কেউ ন্যাশনালিয্‌ম্ বা জাতীয়তাবাদ কথাটিকে জাতীয় মঙ্গল ও উন্নতির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বিবেচনা করে এর পক্ষ নিয়ে থাকেন। তাদের ধারণায় এর বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার মধ্যে রয়েছে স্বদেশ প্রেম, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধ এবং জাতীয় লক্ষ্যের উপর বিশ্বাস। তারা

বলেন, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদ কথাটার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। তারা মনে করেন এটা জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে। আবার কেউ কেউ জাতীয়তাবাদ কথাটিকে অপছন্দ করেন এ কারণে যে, এর দ্বারা এক ধরনের উগ্রতাবোধ জাগ্রত হয়, যা অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনে। ১৯শ শতকে বিভিন্ন দেশে উদ্ভব হওয়া উগ্র জাতীয়তাবোধের ফলে বহু দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অনেক সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করা যায় না। হিটলার মুসোলিনী যে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিল, তার ক্ষতি জগতবাসী স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণে তারা জাতীয়তাবাদকে পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি বলে মনে করেন।

সারকথা জাতি বা জাতীয়তা কোন ইসলামী পরিভাষা নয়। এ পরিভাষা কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধকও নয়। এটা অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা এটাকে ভিত্তি করে কোন দর্শন ও আন্দোলন দাঁড় না করানোই শ্রেয়।

হাইকোর্ট দর্শন

জাতীয় ঈদগাহের উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ প্রাচীন স্টাইলের এক বিশাল ভবন। এটি হল হাইকোর্ট ভবন। অর্থাৎ, উচ্চ আদালত ভবন। এটি হল মামলা মোকদ্দমার সর্বোচ্চ প্রাঙ্গন। এখানে যা কিছু হয়, তা সবটাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের। যে মামলা মোকদ্দমাগুলো এখান পর্যন্ত উপনিত হয় সেগুলোও সর্বোচ্চ পর্যায়ের। এখানকার উকীল-ব্যারিস্টারদের ফী-ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের। কিন্তু বাইরে থেকে এত সব কিছুই টের পাওয়া যায় না, যেন শান্ত-শিষ্ট ভবনটি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের গম্বুজের মত ভবনটির মাথা বুকটান করে কিসের যেন মৌন সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। আশপাশে কোন লোকজন দেখা যায় না, যেন তার ভাব গাম্ভীর্যের সামনে কেউ ভিড়তে পারছে না। কিংবা এমনও হতে পারে বিপদসঙ্কুল স্থান হেতু পারতপক্ষে কেউ সেখানে ভিড়ছে না। এই বিপদটা যে কোথায়, তা ভুক্তভোগীরাই ভাল জানেন।

www.maktabatulabrar.com

তাই বুঝি ভুক্তভোগীদেরকে এই কোর্টসহ সবকোর্ট থেকেই আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতে দেখা যায়। তারা আল্লাহর কাছে মিনতি জানান কাউকেই যেন জীবনে কোনদিন কোর্টের বারান্দা মাড়াতে না হয়। কেন তারা এরকম পানাহ চান, কেন তারা এরকম মিনতি জানান, তা তারাই ভাল জানেন, ভাল বোঝেন। এরূপ ভুক্তভোগীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় কোর্টে গেলে নাকি মানুষ আর মানুষ থাকে না, তাদের মানুষ রাখা হয় না, বরং পাগল বা ছাগল বানিয়ে ফেলা হয়। আর এসব কিছুর অনেকটাই নাকি হয়ে থাকে উকীল-ব্যারিস্টার এবং ইউর অনার স্যারদের কল্যাণে। তবে একথার ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে আগেভাগেই আর একটা কথা বলে রাখতে চাই। তা হল উকীল-ব্যারিস্টার এবং হাকিম জজদের বিরুদ্ধে আমি নিজের থেকে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কখন তারা আবার বিব্রত বোধ করে বসেন এবং আমাকে পুলিশের ধাওয়া খেতে হয়। অযথা পুলিশের ঠেঙানি খাওয়া কিংবা বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেল হাজতে পঁচার মত দুঃসাহসের বড্ড অভাব আমার মধ্যে! আমি শুধু ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির যৎকিঞ্চিত বর্ণনা তুলে ধরছি মাত্র। তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে জানা যায় কোন মামলা-মোকদ্দমার উদ্দেশ্যে উকীল ব্যারিস্টারদের কাছে গেলে নাকি তারা প্রথমেই প্রেসক্রিপশন দেন যে, শুধু সত্য কথায় মামলা চলে না, মামলা চালাতে গেলে মিথ্যা বলতেই হবে, মিথ্যা লিখতেই হবে, নতুবা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সম্ভব হবে না। গোবেচারা মক্কেলরা তখন সেটাতেই সম্মত হয়ে যায়।

তার পর একটা মিথ্যাকে ঢাকা দেয়ার জন্য দশটা মিথ্যার প্রয়োজন পড়ে। এই বাস্তবতার চক্করে পড়ে বাদী বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যেই লেগে যায় মিথ্যার বেসাতী সংগ্রহের তোড়জোড়। কেউ যখন সত্য এবং বাস্তবতার সীমানার বাইরে চলে যায়, তখন সে আর নিজেকে সামাল দিতে পারে না। বরং আপনার খেই হারিয়ে ফেলে। এরূপ খেই হারা অবস্থার মধ্যে বাদী বিবাদী দুই পক্ষের মক্কেলরাই দিশেহারা, সম্বিতহারা পাগলের মত উকীলদের শেখানো বুলি বচন আওড়ে যেতে থাকে এবং যন্ত্রের মত তাদের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক কাজ করে যেতে থাকে। দুই পক্ষ থেকেই জমা হতে থাকে মিথ্যার স্তুপ। মিথ্যার সেই বিশাল স্তুপের মধ্য থেকে কিঞ্চিত সত্যকে বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ে বিচারকদের পক্ষে।

মামলা হতে থাকে দীর্ঘস্থায়ী। তদুপরি মামলাকে দীর্ঘস্থায়ী করে মক্কেলদের পকেট উজাড় করার অপকৌশল তো রয়েছেই। সেই দীর্ঘস্থায়ী মামলার ব্যয়ভার বহন করতে বাদী বিবাদী পক্ষকে হালের বলদ, জমিজমা, বসতবাটি, লোটা-ঘটি সব বিক্রি করে দিতে হয়। এভাবে এক সময় সে সর্বস্বহারা পথের ভবঘুরেয় পরিণত হয়। এ-ই হল কোর্টে গিয়ে মক্কেলদের পাগল হওয়ার বিবরণ।

আর ছাগল হওয়ার ঘটনা হয়ত অনেকে শুনেছেন। যারা শোনেননি তাদের জন্য সংক্ষেপে বলছি,

প্রকাশ্য দিবালোকে বহু মানুষের খোলা চোখের সামনে একজন লোককে হত্যা করা হল। সকলেই দেখে নিল হত্যাকারীকে। এবার যাবে কোথায়? বহু লোক এ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী। নির্ঘাত ফাঁসি হবে হত্যাকারীর। যথারীতি মামলা হল। বিবাদী হত্যাকারী চোখে শর্ষের ফুল দেখতে লাগল। ছুটে গেল এক নামজাদা উকীলের কাছে। তিনি আশ্বস্ত করলেন– ভয় নেই, তোমার মুক্তির উপায় করে দিব। মোটা অংকের সেলামী নির্ধারিত হল। তারপর বিচারকের দরবার বসল। আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। তাকে জেরা করা শুরু হল। তুমি অমুক লোককে হত্যা করেছ? সে উকীলের শেখানো মোতাবেক বলল, ভ্যা। তারপর তাকে যত কিছু নিয়েই প্রশ্ন করা করা হল, সব প্রশ্নের জবাবেই সে ছাগলের ডাকের মত শব্দ করল– ভ্যা। এক পর্যায়ে আসামীর উকীল দাঁড়িয়ে বলল, ইউর অনার স্যার, আমার মক্কেল একজন পাগল, তার কোন বোধ-সোধ নেই, আসল হত্যাকারীকে আড়াল করার জন্যই হয়ত তার উপর এই হত্যাকাণ্ডের মিথ্যা দায়ভার চাপানো হয়েছে। আমার মক্কেলের মত এরকম নির্বোধ লোকের পক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসম্মুখে এমন হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব নয়। অবশেষে তাকে বেকসুর খালাস করে দেয়া হল। এ-ই হল মক্কেলকে ছাগল বানানোর ঘটনা।

এ ঘটনার শেষ অংশটুকু হল মুক্তির পর যখন তার কাছে উক্ত উকীল নির্ধারিত সেলামীর অর্থ দাবী করেছিল, তখনও সে বলে উঠেছিল, ভ্যা। উকীল মশাই তখন বলেছিলেন, এটা তো তোমাকে শিখিয়েছি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জেরার জবাব দেয়ার সময় বলার জন্য, আমাকে বলার জন্য নয়। তখনও সে বলে উঠেছিল, ভ্যা।

www.maktabatulabrar.com

তাই বলছিলাম হাইকোর্ট ভবনের আশপাশে লোকজন-শূন্য-অবস্থা কেন বিরাজ করছে, এটাকি হাইকোর্টের ভাবগাম্ভীর্যের কারণে, না এর বিভীষিকার কারণে? হাইকোর্ট ভবনকে আপনি যে রকম চশমায় দেখবেন, সে রকমই মনে হবে। যদি সাধারণ মানুষের চশমায় দেখেন, তাহলে এই ভবনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হবে– এটি হল সেই ভবন, যার ছবি আমরা পাঁচশত টাকার নোটে দেখতে পাই। কত গুরুত্বপূর্ণ ভবন! নইলে কি আর পাঁচশত (!) টাকার নোটে ছবি ছাপা হত। এখানে মামলা পরিচালনা করেন কত বড় বড় ডাকসেটে উকীল ব্যারিস্টারগণ। যাদের একেকজনকে মামলা পরিচালনার জন্য দশ বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা ফী দিতে হয়। এখানে বিচার করেন দেশের বড় বড় বিচারপতিগণ। কত হাইফাই ব্যাপার স্যাপার। বাপরে বাপ! চোখ দু'টো বিস্ময়ের ঘোরে ছানাবড়া হয়ে উঠবে।

কিন্তু যদি ভুক্তভোগীর চশমায় এটাকে দেখেন, তাহলে হয়তো রাগে ক্ষোভে আপনার মজলূম রক্ত টগবগিয়ে উঠবে কিংবা কোন অনাকাংখিত বিভীষিকার আশংকা আপনার রক্তকে শীতল করে দিবে। আপনার স্মৃতিপটে ভেসে উঠবে কীভাবে অসাধু উকীল ব্যারিস্টারদের কথার মারপ্যাঁচে দিন রাতে পরিণত হয় কিংবা তিল তাল হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে বড় দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে– অসাধু প্রতিপক্ষরা জজ হাকিমদের পিছনের দরজায় ঘুর ঘুর করে কীভাবে সৎ পক্ষকে ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত করে দেয়। এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি হাইকোর্ট ভবনকে কোনক্রমেই মনের মধ্যে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হতে দেয় না।

ঠিক এর বিপরীত দেখা যাবে আর একটি চশমায়। সেটি হল স্থূল তত্ত্ববিশারদদের চশমা। এই স্থূল তত্ত্ব বিশারদগণ সব কিছুর তত্ত্ব-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে থাকেন। তারা হাইকোর্ট ভবন এবং হাইকোর্ট প্রাঙ্গনকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনকেও পবিত্র অঙ্গন বলে থাকেন। জাতীয় সংসদ ভবনের চত্বরকেও পবিত্র অঙ্গন বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। জানি না এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'পবিত্র' কথাটির কী অর্থ। আমরা মসজিদকে পবিত্র বলে থাকি, যেখানে শারীরিক, মানসিক, আঙ্গিক, পারিপার্শ্বিক সব রকম পবিত্রতা রক্ষা করা হয় এবং রক্ষা করতে হয়। এমনকি কথোপকথন ও বুলি-বচনেও পবিত্রতা রক্ষা করতে

হয়। ফলে মসজিদের ভিতরে অপবিত্র কিছু রাখা বা অপবিত্র শরীরে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। অশালীন, অশ্লীল ও অপবিত্র কথা-বার্তা বলাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। 'পবিত্র' কথাটি বললে এমন একটা আঙ্গিক এবং এমন একটা রূপরেখাই আমাদের মনে উদয় হয়ে থাকে। কিন্তু তত্ত্ববিশারদদের কথিত উক্ত স্থানসমূহের পবিত্রতা কোন্ অর্থে? বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতেও কি উযূ-গোসলের প্রয়োজন হয়? বরং শোনা যায় উযূ-গোসল নষ্ট হওয়ার কারবারগুলোই সেখানে দেদারসে চলে থাকে। তবুও কি ওখানকার পবিত্রতা নষ্ট হয় না? অশ্লীল ও অশালীন কথা বার্তায় মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে থাকে, পবিত্র সংসদ ভবনের পবিত্রতাও কি তাতে নষ্ট হয়? সেখানে তো শুনেছি একজন আর একজনকে নষ্টা, বেশ্যা ইত্যাদি জঘন্য গালিও দিয়ে থাকে, ছোট-খাটো গালি গালাজ, কটুক্তি ও দুনিয়াবী কথাবার্তার বিষয় না হয় বাদই দিলাম। তাই বলছিলাম তত্ত্ববিশারদদের কথিত 'পবিত্র' কথাটির কী অর্থ, তা বুঝে উঠতে পারিনি। তারা যা বলেন, তার গভীরে তলিয়ে দেখেন না, তাই তাদেরকে স্থূল তত্ত্ববিশারদ নামে আখ্যায়িত করাই সমীচীন।

সবশেষে ইসলামের চশমায় উচ্চ আদালতকে একটু দেখে নিতে চাই। ইসলামের দৃষ্টিতে আদালতের ক্ষেত্রে নিম্ন উচ্চ–এর কোন তারতম্য নেই। অর্থাৎ, নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত এমন কোন শ্রেণীভেদ ইসলামে নেই। ফলে উচ্চ আদালতে আপিলের কোন ধারণা বা ব্যবস্থা ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কোন বিষয়ে একজন বিচারক যে রায় দিবেন, সেটাই চূড়ান্ত রায় বলে বিবেচিত হবে। উপর কোর্টে আপিলের অর্থ নিম্নের আদালতের বিচারকের রায়কে অবমাননা করা কিংবা নিম্ন আদালতের বিচারককে অযোগ্য আখ্যায়িত করা। যদি সে অযোগ্যই হয়ে থাকবে, যার রায়ের উপর আস্থা করা যায় না, তাহলে তেমন অথর্ব কালাগাছকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেয়া হল কেন? আর যদি যোগ্যই হয়ে থাকবে, তাহলে উচ্চ আদলতে আপিলের ব্যবস্থা রাখার মাধ্যমে তার রায়কে চ্যালেঞ্জ করার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? এটা তো তাকে অবমাননা করার শামিল। যদি কেউ বলেন, একজনের রায়ে ভুল থাকার সম্ভাবনা বিদ্যমান, ফলে উচ্চ আদালতের মাধ্যমে সেটাকে যাচাই করার ব্যবস্থা থাকাই বিধেয়। এ যুক্তির ব্যাপারে বলা যায়– উচ্চ

www.maktabatulabrar.com

আদালতের বিচারকগণও ভুলের সম্ভাবনামুক্ত নন। তাহলে উচ্চ আদালতের উপর মহা উচ্চ আদালতের ব্যবস্থা রাখুন এবং হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্ট, তারপর মহা সুপ্রিম কোট, তারপর ভেরি হাই সুপ্রিম কোর্ট, তারপর ভেরি ভেরি হাই সুপ্রিম কোর্ট– এভাবে গড়ে যেতে থাকুন এবং বিচারকে কেয়ামত পর্যন্ত যাচাই করার সুযোগ রাখুন। আর উচ্চ আদালতের রায়ে সন্দেহ থাকলেও যদি সেটাকে মেনে নিতে পারেন, তাহলে সেই মেনে নেয়াটা নিম্ন আদালতেই সের ফেলুন, তাহলে কোর্টে এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মামলা ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকবে না, দ্রুত বিচারকাজ সম্পন্ন হবে। আর বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলে অপরাধীরা সময় হাতে পেয়ে ফাঁক-ফোকড় বের করার সুযোগ কম পাবে, অসাধু উকীল-ব্যারিস্টারগণ মক্কেলদের পকেট উজাড় করে পথে বসানোর সুযোগ কম পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা কোন অপরাধ সম্পর্কে পাবলিকের সেন্টিমেন্ট তাজা থাকতেই সে অপরাধের বিচার হয়ে গেলে পাবলিকের মনে আইনের ভয় সৃষ্টি হবে; যা তাদেরকে অপরাধ থেকে বিরত রাখবে। এটাই তো ছিল আইন ও শাস্তি বিধানের মূল উদ্দেশ্য। কোর্টের পর কোর্ট বিচার গড়ানোর ফলে যে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং শাস্তি প্রয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে, তাতে শাস্তি যখন হচ্ছে, তখন ইতিমধ্যে পাবলিক সেন্টিমেন্ট নেতিয়ে পড়েছে। ফলে আইন ও শাস্তি তার প্রভাব হারিয়ে ফেলছে।

হাইকোর্ট মাজার দর্শন

জাতীয় ঈদগাহের পশ্চিমে হাইকোর্ট মাজার। এটি ঢাকার হাই লেভেলের একটি মাজার। এখানে শায়িত আছেন হযরত খাজা শরফুদ্দীন চিশতী ওরফে বাবা ওলী বাংলা, ওফাত ৯৯৮ হি.। মাজার এলাকার দক্ষিণ পার্শ্বের সুউচ্চ তোরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে উত্তর দিকে কিছুটা অগ্রসর হলেই বাম হাতে একটি হাইফাই মসজিদ। এরই মধ্যে অবস্থিত উক্ত মাজারটি। মাজারের সম্মুখে কয়েকটি ছোট ছোট দোকান। এ দোকানগুলোতে মোমবাতি, আগরবাতি ও ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। মাজার জিয়ারতে আগন্তুকরা এখান থেকে মোমবাতি, আগরবাতি ও ফুলের মালা কিনে নিয়ে মাজারে নিবেদন করে থাকেন।

৪ঠা রমযান ১৪২৩ হি. রোববার বিকেল বেলায় মাজার দর্শনে গেলাম। মাজার দর্শনের জন্য মিনিবাস থেকে নেমে পড়লাম। মাজারের সম্মুখে অবস্থিত উক্ত দোকানগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ বিক্রি হচ্ছে। আগন্তুকদের অনেকেই মোমবাতি, আগরবাতি কিনছেন এবং ভক্তি ভরে সেগুলো মাজারে নিবেদন করেছেন। কিন্তু এত মোমবাতি, আগরবাতি মাজারে জ্বালিয়ে শেষ হবার নয়; দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা একাধারে জ্বালালেও যে পরিমাণ নিবেদন হচ্ছে, তার কিয়দাংশও ফুরাতে পারবে না। তাই বুঝি মাজার থেকে এগুলো আবার দোকানে রিটার্নব্যাক করে। এভাবে দোকান টু মাজার, মাজার টু দোকান বার বার সফর করছে কিছু মোমবাতি ও আগরবাতির প্যাকেট। সেই প্যাকেটগুলোর বিধ্বস্ত মলিন চেহারা দেখলে সহজেই বুঝা যায় বিরতিহীনভাবে সফর করার ফলে ওরা কতটা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে! শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ মাজার-ভক্তদের চশমায় এসব বিষয় হয়তো ধরা পড়ে না। মাজারে মোমবাতি জ্বালানোর ফায়দা কি, তা-ও তাদের চশমায় ধরা পড়ে না। এই চশমা সুক্ষ্ম কোন কিছু দেখতে পায় না; এমনকি স্থূল কিছুও না। কার্যত চশমা থেকেও ওরা অন্ধ। কারণ চশমা থেকেও ওরা ঠিকঠাকমত সব কিছু দেখতে পায় না। চশমায় পরিমিত মাত্রার চেয়ে পাওয়ার বেশি থাকলে যেমন ঠিকমত সব কিছু দেখা যায় না, তেমনি ভক্তির স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা ছেড়ে গেলে সেই ভক্তির চশমায়ও কোন কিছু ঠিকমত দেখা যায় না। তাই বুঝি অতিভক্তদেরকে অন্ধভক্ত বলা হয়। মাজারে শায়িত ব্যক্তি যদি প্রকৃত বুযুর্গ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কবর তাঁর আমলের নূরে উদ্ভাসিত থাকবে। আর যদি অন্যথা হয়, তাহলে মাটির উপর জ্বালানো এই মোমবাতির আলো যে কবরের মধ্যকার অন্ধকার একটুও ঘুচাতে পারবে না, তা তো স্থূল বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। তাহলে মাজারে মোমবাতি জ্বালানো কি নিতান্তই ছেলেখেলা নয়? আপনি এরূপ আরও একটি ছেলেখেলা দেখতে পাবেন আজীমপুর গোরস্তানে গেলে। আজীমপুর পুরাতন গোরস্তানে ঢুকতেই মাঝখানের যে পথটি সোজা সম্মুখে এগিয়ে গেছে, তার শুরুতে বাম হাতে ছাদ করা ঘরের মত একটা পাকা কবর। এখানে বৈদ্যুতিক বাতি তো লাগানো রয়েছেই, একটা বৈদ্যুতিক পাখাও ঝুলানো রয়েছে। প্রায়শই পাখাটা চলতে থাকে। এই পাখার বাতাস দিয়ে কি কবরস্থ ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা করা যাবে? শুনেছি এটা নাকি

www.maktabatulabrar.com

মতিঝিলের নামকরা একটা সিনেমা হলের মালিকের কবর। আল্লাহ্ তাকে মাফ করুন; নইলে কবরে আগুন জ্বালানোর যে রগরগে ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন, সে আগুন কি এই পাখা দিয়ে ঠাণ্ডা হবে? এই বালখিল্যতা দেখে হাসিও পায় আবার এমন অজ্ঞতার প্রতি করুণাও জাগে।

যাহোক, মাজারের দিকে অগ্রসর হলাম। মাজারের সম্মুখে বড় একটা নোটিশ-বোর্ড ঝুলানো রয়েছে। এতে বেশ কিছু উপদেশবাণী লেখা রয়েছে। যেমন– মাজার যিয়ারতের এসে শির্‌কে লিপ্ত হবেন না, কবরে সেজদা করা হারাম ইত্যাদি। কিন্তু এসব নসীহত এই নোটিশ-বোর্ডেই সীমাবদ্ধ থাকে। মাজারে রীতিমতই অনেকে সেজদা করে যাচ্ছে, পীরের কাছে সন্তান কামনা করার মত শির্‌কে লিপ্ত হচ্ছে ইত্যাদি।

মাজার ও মসজিদে প্রবেশের দরজা একই। মসজিদে প্রবেশের নিয়মিত অভ্যাস মত স্যাণ্ডেল জোড়া হাতে নিয়ে ঢুকতে যেয়েই বাধাগ্রস্ত হলাম। এখানে জুতো-স্যাণ্ডেল নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। জুতো-স্যাণ্ডেল বাইরে রেখে যেতে হবে। একটা ধাক্কা অনুভব করলাম। আল্লাহর ঘর মসজিদে জুতো-স্যাণ্ডেল নিয়ে যাওয়া যায়, মাজারে কেন যাওয়া যাবে না– এমন একটা প্রশ্ন ভেতরে জেগে উঠল। তাহলে কি আল্লাহ্‌র ঘরের চেয়ে পীরের লাশের ঘরের মর্যাদা বেশি হয়ে গেল? অন্তত বাহ্যিক এই আচরণ থেকে তো সেটাই প্রতিভাত হচ্ছে।

শুধু এটাই কেন, এই তো আমাদের চোখের সামনে গুলিস্তান গোলাপ শাহ মাজার ও মসজিদের ঘটনা ঘটে গেল। এখন যেখানে গোলাপ শাহ মাজার অবস্থিত, ওখানে মাজার সংলগ্ন মসজিদও ছিল। রাস্তায় চলাচলের সুবিধের অজুহাত দাঁড় করিয়ে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিন্তু মাজারকে অক্ষতই রাখা হয়। এখানেও আল্লাহ্‌র ঘরের চেয়ে যে মাজার ঘরের মর্যাদা অন্তরে বেশি, সেটাই বাহ্যিকভাবে দেখানো হল। তবে কি ভারসাম্যহারা এই সাধারণ মানুষেরা আল্লাহ্‌র চেয়ে পীরকে বেশি বড় মনে করে এবং আল্লাহ্‌র চেয়ে পীরকে বেশি ভয় পায়? আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ ভাঙ্গতে ভয় পেল না; কিন্তু মাজার ভাঙ্গতে ভয় পেল। এতে স্পষ্টতঃই জাহির হয়ে গেল যে, তারা আল্লাহ্‌র চেয়ে পীরকে বেশি ভয় পায়। এ প্রসঙ্গে ছোট আর একটি ঘটনা শুনুন।

একবার বাড়ীর উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে কোচ যোগে খুলনায় যাচ্ছিলাম। কোচ ড্রাইভার তার অভ্যাস মত গানের ক্যাসেট ছেড়ে দিল।

যাত্রীরাও তাতে উৎফুল্লবোধ করল। আমরা কয়েকজন ড্রাইভারকে গান বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধ জানালাম। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলে চলার পথে বিপদ ঘটতে পারে– এ কথাও তাকে বললাম। কিন্তু কোন কথায় কাজ হল না। তার পর এক সময় কোচটি যশোর পার হয়ে নওয়াপাড়ার কাছে পৌঁছতেই আপনা থেকেই ড্রাইভার সাহেব গানের ক্যাসেট বন্ধ করে দিল। এখন কেন বন্ধ করলেন– প্রশ্ন করায় ড্রাইভার জানালেন, সামনে নওয়াপাড়া পীর সাহেবের মাজার তাই। উল্লেখ্য, নওয়াপাড়া পীর সাহেবের মাজার থেকে দুই দিকে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত উভয় দিকে চলাচলকারী বাসেই গান-বাজনা বন্ধ রাখা হয়। আমি তখন বললাম, ড্রাইভার ভাই! আগে আল্লাহর কথা বলে গান বন্ধ করতে অনুরোধ জানালাম, কিন্তু বন্ধ করলেন না। এখন পীর সাহেবের ভয়ে/খাতিরে বন্ধ করলেন, তাহলে কি আল্লাহ্‌র চেয়ে পীর সাহেবকে বেশি ভয় পান? ড্রাইভার কোনো উত্তর করল না। আসলে তার কাছে কোন সদুত্তর ছিলও না।

এভাবে অনেক মানুষই পীর-মুরশিদ ও ওলী-আউলিয়াদের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের শিকার। হক্কানী পীর-মুর্শিদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তারা পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেন, আল্লাহবিমুখ মানুষকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রেমের ডোরে বেঁধে দেন। তারা সমাজের জন্য দ্বীনের রাহবার। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনদারির চেতনা বিকাশে তাঁদের অবদান চিরস্বীকৃত। তাঁদের প্রতি ভক্তি-মহব্বত অবশ্যই প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু অতিভক্তিতে তাঁদেরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়াকে কোনক্রমেই স্বীকৃতি দেয়া যায় না। কুরআন শরীফে ইয়াহুদী-নাসারাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের ধর্মীয় গুরুদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে। এখন দেখছি, আমাদের সমাজেও কিছু লোক এর চেয়ে কম যাচ্ছে না; বরং বেশি যাচ্ছে। এরা পীর বাবা ও খাজা বাবাদেরকে খোদা নয়; বরং খোদার চেয়ে উপরে তুলে দিয়েছে। এদের মুখ থেকে বের হচ্ছে–

খোদার ধন রসূলকে দিয়া,
খোদা গেছেন খালি হইয়া।
রসূলের ধন খাজাকে দিয়া,
রসূল গেছেন ফকীর হইয়া।
টিন্ টিনা টিন্‌ন্...

www.maktabatulabrar.com

এরকম ধারণার শিকার হয়ে তারা খাজা বাবাদেরকে মূল্যায়ন করছে। তারা ভাবছে এখন খাজা বাবাদের হাতেই সব কিছু। তাই ছেলে/মেয়ে চাই, খাজার কাছে চাও! ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি চাই, খাজার দরবারে চল! সব কিছুর জন্য খাজার শরণাপন্ন হও! খাজার দরবারেই সব কিছু মিলবে এবং মিলবেই-খাজার দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবে না।

'খাজার-ই দরবারে
কেউ ফেরে না খালি হাতে!'

নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা! এভাবে খাজা বাবাদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। বরং খোদার চেয়ে বড় বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। আর এরকম ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে তারা যখন মাজার যিয়ারতে যাচ্ছে, তখন মাজার যিয়ারতের সহীহ নিয়ত তাদের মধ্যে থাকছে না, মাজার যিয়ারতের সহীহ তরীকা তাদের মধ্যে থাকছে না। মাজারে যাওয়ার পেছনে যে সব ভ্রান্ত উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে কাজ করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে–

মাজারে গেলে বিপদ-আপদ দূর হয়, মাজারে গেলে মকসুদ হাসেল হয়, মাজারে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হয়, আয়-রোজগার বৃদ্ধি পায়, সন্তান চাইলে সন্তান পাওয়া যায়। মাজারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়, মাজারে টাকা-পয়সা, নজর-নিয়াজ দিলে ফায়দা হয়, মাজারে ফুল, মোমবাতি ও আগরবাতি দিলে ছওয়াব হয় ইত্যাদি। এ তো হল গলদ নিয়তের বিবরণ। আর মাজার যিয়ারত করতে যেয়ে গলদ তরীকা যা যা অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে কবরে সেজদা করা, মাথা, কপাল, গাল ও হাত ইত্যাদি কবরের দেয়ালের সঙ্গে বা আশে পাশে ঘষতে থাকা, কবর বা কবরের আশপাশে বিভিন্ন স্থানে হাত লাগিয়ে সেই হাত মাথা, চেহারা ও সীনা ইত্যাদি স্থানে ফিরাতে থাকা। কবর বা কবরের আশপাশের বিভিন্ন স্থানে চুমু খাওয়া, কবরে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো, ফুল দেয়া ইত্যাদি।

কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে মাজার/কবর যিয়ারতের পশ্চাতে যে নিয়ত থাকতে পারে, তা হল সাধারণভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয়। যেমন– কলব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায়। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, এই দুনিয়া ছেড়ে সকলেই চলে যেতে

হবে– এই চেতনা জাগ্রত হয় ইত্যাদি। বিশেষভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়েযও লাভ হয়। সাধারণভাবে এই হল কবর/মাজার যিয়ারতের ফায়দা। এ রকম নিয়তে কবর/মাজার যিয়ারত করা যায়। আর কবর/মাজার যিয়ারতের তরীকার মধ্যে রয়েছে–

কবরস্থানে প্রবেশ করে কবরবাসী/সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম করা–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَنَسْائِلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

‘হে মু’মিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থলের অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও আল্লাহ্ চাহে তো তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য শান্তির আবেদন করছি।’

অতঃপর উদ্দিষ্ট মাইয়েতের পায়ের দিক থেকে চেহারার (কেবলার) দিক যেয়ে দাঁড়াবে বা বসবে। বসলে জীবদ্দশায় তার সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক, সে অনুযায়ী নিকটে বা দূরে বসবে।

সালামের পর কেবলার দিকে পিঠ এবং মাইয়েতের (কবরের) দিকে মুখ করে যথাসম্ভব কুরআন শরীফ পড়ে মাইয়েতকে ছওয়াব পৌঁছে দিবে। বিশেষভাবে সূরাা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত তথা– اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পর্যন্ত, সূরা ফাতিহা, সূরা ইয়াসীন, সূরা মুল্ক, সূরা তাকাছুর বা সূরা ইখলাস ১১/১২ বার কিংবা ৭ বার বা যে পরিমাণ সহজে পড়তে পারে, সেই পরিমাণ পড়ে দু‘আ করবে। মাইয়েতের মাগফেরাতের জন্যও দু‘আ করবে।

তিলাওয়াত ও দু‘আ দুরূদ পড়ার পর কেবলামুখী হয়ে (অর্থাৎ, মাইয়েতের দিকে পিঠ করে) দু‘আ করবে।

যাহোক হাইকোর্ট মাজারে প্রবেশ করতে স্যাণ্ডেল বাইরেই রেখে যেতে হল। অগত্যা দুই টাকা রাখালীর বিনিময়ে স্যাণ্ডেল জোড়া বাইরে রেখেই মসজিদের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলাম। সুন্নাত তরীকা মোতাবেক সালাম, কিছু তিলাওয়াত ও দু‘আ সেরে ফিরে এলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অনেক ধরনের ফকীর। কিছু পাওয়ার জন্য তারা উন্মুখ। এখানে

www.maktabatulabrar.com

যে সব ফকীর থাকে, তাদের মধ্যে থাকে জটাধারী, লেংটিধারী, রং-বেরংয়ের তালিযুক্ত কিম্ভুতকিমাকার পোশাকধারী ফকীর। আর স্বাভাবিক ফকীর তো রয়েছেই। এসব জটা তালি দেখে অনেকেই তাদেরকে কামেল ধরনের কিছু মনে করে থাকে। যদিও জটা রাখা শরীআতে হারাম। এরূপ হারাম কাজ করে কেউ কামেল হতে পারে না। আর প্রকৃত কোন বুযুর্গ এরকম শত রংয়ের তালিযুক্ত কিম্ভুতকিমাকার পোশাক পরিধান করেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এতসব বিবেক প্রয়োগ করে না। তাদের ভক্তির শরীয়তসম্মত কোন মাপকাঠি নেই। তারা সম্পূর্ণ লেংটা ফকীরকে পর্যন্ত কামেল মনে করে ভক্তি নিবেদন করে থাকে। মিরপুর ১নং-এর কাছে একটি মসজিদের সামনে এক উলঙ্গ পীরের আস্তানা আছে। তিনি সমস্ত শরীরে শেকল জড়িয়ে রাখেন। তাই সকলে তাকে বলে শেকল শাহ। তিনি সর্বক্ষণ ঐ আস্তানায় থাকেন না, তবে শেকলটা সর্বক্ষণ সেখানে থাকে। বিকেল বেলায় দিগম্বর পীর সাহেব দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম দোলাতে দোলাতে যখন আস্তানায় তাশরীফ আনেন এবং শেকলে জড়িয়ে সার্কাস হয়ে দাঁড়িয়ে/বসে থাকেন, তখন শুরু হয় ভক্তদের টাকা-পয়সা ও নজর-নেয়ায ইত্যাদি অর্ঘদান। ভক্তরা নাকি বলে উলঙ্গ হলে কি হয়, ভিতরে মাল আছে! কিন্তু ভিতরে কী মাল আর অবশিষ্ট থাকল? যা ছিল তা সবই তো উনি বের করে দিয়েছেন। এমন জঘন্য বেহায়া ফাসেক লোককেই যারা কামেল ধারণায় ভক্তি করে, তাদের সামান্যতম বিবেকটুকুও কোথায় গেল তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। সম্ভবত তারা নিজেদের হাতে মোটেও না রেখে পুরো বিবেকটাকেই দিগম্বর পীরের ভক্তির ঝুলিতে খয়রাত ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে এখন তারা পোশাক-পরিচ্ছদে দিগম্বর না হলেও বিবেকের দিগম্বরে পরিণত হয়েছেন। আর তা তো হতেই হয়। এ রকম ভাইটাল পয়েন্টে পীর-মুরীদের মধ্যে ঐক্য থাকতেই হয়। অন্যথায় এ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কীরূপে?

পীর-মুরীদীর নামে বিবেক-বুদ্ধির মাথা খাওয়ার আরও অনেক ঘটনা শোনা যায়। এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর বাবারা আছেন, যাদের দরবারে মদ, গাঁজা ও ভাং আফিম সবই চলতে থাকে। নারী নিয়ে ঢলাঢলি, মাতামাতিও দেদারসে চলে থাকে। এমনকি আইল ঠেলে পয়মালীও নাকি চলে থাকে। আর গান-বাদ্যের আসর তো আছেই। সেই ভণ্ড বাবাদের শেখানো দর্শন

হল– গুরু ভক্তি বিনে মুক্তি নেই। আর গুরুকে খুশী করার জন্য দেহ-মন ও জীবন-যৌবন গুরুর চরণে সবই কর দান। এভাবে নারীদেরকে গুরুর তরে দেহদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়, যেনার শিক্ষা দেয়া হয়। তবুও কিছু মানুষ তাদেরকে ভক্তি করছে। এমনকি স্পষ্ট কুফ্‌রী কথা শিক্ষা দেয়ার পরও তাদেরকে ভক্তি করছে। নিম্নোক্ত গানকে কুফরী ছাড়া আর কী বলবেন–

'মন পাগলরে গুরু ভজনা,
গুরু বিনে মুক্তি পাবি না।
গুরু নামে আছে সুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা,
মন পাগলরে গুরু ভজনা।'

নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা! ভণ্ড পীর বাবাদের এসব কূকীর্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী রচিত কয়েকটা বই থেকে। তিনি ভণ্ড পীর-ফকীরদের ভণ্ডামীমূলক কাণ্ড-কারখানাগুলোকে বেশ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তবে ভদ্র লোকের বইগুলো পাঠ করলে বুঝা যায় তার চোখে পীর-মাশায়েখ বিদ্বেষী চশমা আঁটা রয়েছে। তিনি ভণ্ড পীর ফকীরদের বিরুদ্ধে লিখতে লিখতে পীর মাশায়েখদের প্রয়োজনকেই সমূলে অস্বীকার করেছেন এবং তাসাওউফের সিলসিলা ও আধ্যাত্মিক সাধনার এই ধারাবাহিকতাকেই শরীয়ত-বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা হল নকল/ভেজাল ঔষধের ছড়াছড়ি দেখে ঔষধের প্রতিই ভক্তি হারিয়ে ফেলা এবং প্রকৃত ঔষধের প্রয়োজনকেই অস্বীকার করে বসার মত প্রান্তিকতার শিকার আর কি। এই ভদ্রলোক হক্কানী পীর-মাশায়েখের প্রতিও বেসামাল হয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন। তার মধ্যে যে ব্যালেন্সের অভাব রয়েছে এবং তিনি যে অতিমাত্রায় উগ্র, তা তার বইগুলোর নাম দেখলেও উপলব্ধি করা যায়। তিনি একখানা বই লিখেছেন 'পীরতন্ত্রের আজব লীলা।' এ বইতে তিনি ভণ্ড পীর-ফকীরদের কুকীর্তি তুলে ধরতে ধরতে সমূলে পীর-মুরীদী ও আধ্যাত্মিক সাধনাকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। ফলে একজন মাওলানা সাহেব এর প্রতিবাদ লিখেছেন 'আজব মাওলানার আজব বুলী' নামক একটি বইয়ের মাধ্যমে। তার জওয়াবে বর্ধমানী সাহেব আবার লিখেছেন 'গিরা ওয়ালা বাম্বু'। ছাত্রজীবনে একবার কৌতুহলী হয়ে এ বইগুলো ভি,পি যোগে দিনাজপুর

www.maktabatulabrar.com

থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। যাহোক, যা বলছিলাম 'পীরতন্ত্রের আজব লীলা' নাম থেকেই বুঝা যায় তিনি পীর-বিদ্বেষী চশমা চোখে ধারণ করেই লেখা শুরু করেছেন। আর 'গিরা ওয়ালা বাম্বু' নাম থেকে তার শালীনতা ও নম্রতা বা উগ্রতার পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এমন লোকের লেখা থেকে ভারসাম্য প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত বৈ কি!

সব রকম উগ্রতা, বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ও প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল ইসলামের চশমায় পীর-মুরীদীকে দেখলে এর প্রয়োজন যেমন চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তেমনি ভেসে উঠবে পীর-মাশায়েখের প্রতি সাধারণ মুসলমানের ভক্তি-শ্রদ্ধাকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর লোকের পীর-মুরীদীর নামে হীন স্বার্থ উদ্ধারের অপতৎপরতার চিত্র।

যাহোক, হাই কোর্টের মাজারের ফকীরদের সম্পর্কে বলা শুরু করেছিলাম। নানান বেশভূষা ও নানান ভংচংয়ের ফকীর। কেউ জটাধারী, কেউ লাঠিধারী, কেউ আজব আজব সাইজের তসবীহধারী। আরও কত রকম ধারী অধারী। এর মধ্যে কোন আসল ফকীর অর্থাৎ, কামেল মানুষ থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু আসল ফকীর কয়জন?

'হাইকোর্টের মাজারে
কত ফকীর ঘোরে
আসল ফকীর কয়জনা!'

বস্তুত আমাদের কাছে কোন ভং চং নয়; বরং শরীয়তের মানদণ্ডে যে যতটা উত্তীর্ণ, সে ততটা কামেল। কারও প্রতি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের একমাত্র পূর্বশর্ত হল শরীয়তের মানদণ্ডে তার উত্তীর্ণ হওয়া, দোসরা কিছু নয়।

ফজলুল হক হল ও ধর্মনিরপেক্ষতা দর্শন

হাইকোর্ট মাজারের গেট থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে একটা চৌরাস্তা। বাম দিকে ওসমানগণী রোড সচিবালয়ের সম্মুখ দিয়ে জিপিও, বায়তুল মুকাররম ও গুলিস্তানের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ডান দিকের রাস্তাটা পশ্চিম দিকে দোয়েল চত্বর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গিয়েছে আর সামনে দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা অগ্রসর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের

ফজলুল হক হল ও বঙ্গ মার্কেটের দিকে। রাস্তা পার হয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। মনে মনে ভাবছিলাম রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলা সুন্নাত– শরীয়তের এই আইন পালন করতে যেয়ে রাষ্ট্রীয় আইন লংঘন করতে হচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রের ট্রাফিক আইনে বাম পাশ দিয়ে চলাচল করা নিয়ম। কিন্তু এই নিয়ম মানতে গেলে ইসলামের একটি সুন্নাত বর্জন করতে হয়। ইসলামের উল্টো এই নিয়ম করে অযথাই ইসলাম-প্রিয় মানুষদেরকে একটা উৎকট ঝামেলায় ফেলে রাখা হয়েছে। 'অযথা' বললাম এ কারণে যে, বাম পাশ দিয়ে চলাচল করার পশ্চাতে কোনো উপকারিতা বা যৌক্তিকতা না থাকা সত্ত্বেও এ নিয়মকে অহেতুকই চালু করা ও বহাল রাখা হয়েছে। যে সমস্ত এ্যারাবিয়ান কান্ট্রিতে ডান পাশ দিয়ে চলাচল করার নিয়ম রয়েছে, সেখানে তো সকলে দিব্যি ডান পাশ দিয়ে বিনা সমস্যায়ই চলাচল করছে, সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্নাত পালন করার সুযোগও তারা অনায়াসে অর্জন করতে পারছে। অথচ আমাদের দেশে ইসলামের এই সুন্নাতটি পালন করতে গেলে রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করা বৈ গত্যন্তর থাকছে না। এরূপ মুহূর্তে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সামনে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় ইসলামী আইন মানতে গেলে রাষ্ট্রীয় আইন মানা হয় না, আর রাষ্ট্রীয় আইন মানতে গেলে ইসলামী আইন অমান্য হয়ে যায়। এ অবস্থায় তারা কোনটাকে প্রাধান্য দিবে? এ প্রশ্নটা খুব মারাত্মক জটিল হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের সংবিধান মানতে গিয়ে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়। অথচ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইনের অথরিটি বলে স্বীকৃতি দেয়া ঈমান-আকীদা পরিপন্থী। এমতাবস্থায় সংবিধান মানতে গেলে খোদাদ্রোহী হয়ে পড়তে হয় আর সংবিধান না মানলে হয়ে দাঁড়াতে হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে দুনিয়ার কারাগারে যেমন ঢুকতে চাই না, তেমনি অতি অবশ্যি কামনা করি আখেরাতের কারাগার– জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে, তাই কোনক্রমেই হতে চাই না খোদাদ্রোহী। কোন দ্রোহী যেন হতে না হয় সংবিধানের ধারাগুলোকে এমন সমান্তরালে নিয়ে আসা কি সম্ভব নয়?

www.maktabatulabrar.com

এসব কথা ভাবতে ভাবতে ফুটপাত ধরে সামনে এগিয়ে চলছিলাম। কিছুদূর সামনে গিয়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রাচীন ছাত্রাবাস দেখতে পেলাম। রাস্তার সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতির দুটো মিনারা বিশিষ্ট একটি গেট। গেটে লেখা আছে– ফজলুল হক হল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একটু ভিতরে আরও একটি গেট। এটি চার মিনারা বিশিষ্ট, চতুর্গম্বুজ রীতিতে নির্মিত স্বল্প উন্নত একটি তোরণ দ্বার। এতে লেখা আছে– ফজলুল হক মুসলিম হল। একটু কেমন খটকা অনুভূত হল। মনের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রশ্ন জাগল। সামনের গেটে 'ফজলুল হক হল' আর ভিতরের গেটে 'ফজলুল হক মুসলিম হল'– একই হলের নাম এই দুই রকম লেখা কেন? সামনের গেট থেকে 'মুসলিম' শব্দটি মুছে দেয়া হয়েছে, নাকি ভিতরের গেটে সেটির সংযোজন ঘটানো হয়েছে? এই পার্থক্য কি আপনা আপনি সূচীত হয়েছে, নাকি এটা কোন পরিস্থিতির শিকারজনিত? কোন্টা কেমন লাগে? এবার চশমার ঝুলির শরণাপন্ন হতে হয়।

ঝুলি থেকে প্রথমে বের করলাম স্থূল মুসলিম জাতীয়তাবাদের চশমা। 'ফজলুল হক মুসলিম হল' নাম দেখেই এ চশমার আয়নায় খুশির ঝিলিক খেলে গেল। এ নামের মধ্যে যেন শোনা যাচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সুর মূর্ছনা। একটি হলের ছাদে চতুর্কোণে চারটি গম্বুজ যেন মুসলিম জাতীয়তা- বাদের ঐতিহ্যকে আরও সমুন্নত করে তুলেছে। মসজিদের গম্বুজসদৃশ মিনারা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী ইসলামী প্যাটার্নের এই ইমারতটি ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবের একটি মৌন সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইমারতটির নির্মাণশৈলীই বলে দিচ্ছে এটি শুধু হল্ নয়, মুসলিম হল্। অতএব 'ফজলুল হক মুসলিম হল' নামকরণটিই বিলক্ষণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাস্তা সংলগ্ন গেটের নাম থেকে মুসলিম শব্দটির বিমোচন একটি দুঃখজনক বৈসাদৃশ্যের অবতারণা করেছে মাত্র। যে বা যারা করেছে তাদের প্রতি একটা চাপা অসন্তোষ ভিতরে মোচড় খেয়ে উঠতে থাকল। চোখ থেকে খুলে ফেললাম এ চশমা জোড়া। ভিতরটা প্রশমিত করে নিলাম।

তারপর বের করলাম আর এক জোড়া চশমা। এটি হল হিন্দু জাতীয়তাবাদের চশমা। এ চশমা চোখে আঁটতেই সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেখতে পেলাম। 'ফজলুল হক মুসলিম হল' নামের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বেসুরো ধ্বনী বেজে চলছে, হল-গেট ও হল-বিল্ডিংয়ের

নির্মাণশৈলীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা কত মারাত্মক ভাবে পাঠাবলি হয়ে গেছে! শরীরে ক্রোধ গিজ গিজ করে উঠল। তবে রাস্তা সংলগ্ন গেটে 'মুসলিম' শব্দের অনুপস্থিতি সেই ক্রোধে কিছুটা জলের ছিটার সংযোজন ঘটাল। এ গেট থেকে যে বা যারা এ শব্দটি বাদ দিয়েছে, ইচ্ছে হয় তাদেরকে শত কোটি নমস্কার জানাতে।

তারপর যখন সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার চশমা এঁটে বিষয়টিকে দেখলাম, তখনও পূর্ববৎ সাম্প্রদায়িকতার ছাপই দেখতে পেলাম। কিন্তু এমন কেন হল? হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি তাহলে সমান্তরালে অবস্থান করছে? তা কেন হবে? হিন্দু জাতীয়তাবাদের চশমাধারীরা হল পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী, তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রবক্তা ও মূর্তি পূজারী, আর ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রবক্তা নেতা-নেত্রীদেরকে তো মাথায় টুপি বা পট্টি পরে এক আল্লাহ ওয়াদাহু লা-শারীকা লাহু-র উদ্দেশ্যে সেজদায় মাথা ঠুকতে দেখি। দুই পক্ষের মধ্যে আদর্শগত এতটা মৌলিক তফাৎ বিরাজমান, তবুও কেন উভয় পক্ষের চশমায় 'মুসলিম' শব্দ ও মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে একই সাম্প্রদায়িকতার ছাপ সমানভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে? দেখতে ভুল করছি না তো? চোখটা ভাল করে রগড়ে নিলাম। কিন্তু না, কোনই ফারাক মনে হচ্ছে না। এই তো স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে 'ফজলুল হক মুসলিম হল' নামের মধ্যে 'মুসলিম' শব্দটা সংযোজন করে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা করা হয়েছে। হল-গেট ও হল-বিল্ডিংয়ের স্থাপত্যে সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী কলংক এঁটে রাখা হয়েছে। যে বা যারা রাস্তা সংলগ্ন গেট থেকে 'মুসলিম' শব্দটা মুছে/বাদ দিয়েছে, তারা সাম্প্রদায়িকতা উৎখাত ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত পালন করেছে। তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

হিন্দুবাদ আর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের চশমার দর্শন সমান্তরালে কেন অবস্থান করছে তা অনুধাবন করার জন্য বোধ হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিচয়টা আর একটু জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তারা যদিও ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে আসলে কি বুঝায়, তা কখনও সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেন না। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে চালু হওয়া

www.maktabatulabrar.com

ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েমের অভিযানের শুরু লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত দেয়া তাদের দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন বক্তব্য ও মন্তব্য থেকে এখন এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলে তারা ইসলাম বিরোধীতাকেই বুঝিয়ে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং ধর্মহীনতা বা ধর্মনির্মূলতা চান। প্রমাণ তার অনেক। তবে প্রমাণ পেশ করার আগে দু'টো কথা বলে রাখি।

এক নম্বর কথা হল– ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা কথা দু'টোকে সমার্থবোধক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যারা তাদের কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী তারাই সাম্প্রদায়িক। আর ইসলাম নির্মূলতা ও ইসলাম বিরোধীতাকেই যেহেতু তারা ধর্মনিরপেক্ষতা মনে করে থাকেন, তাই তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম হল সাম্প্রদায়িকতা আর ইসলামপন্থী মুসলমানরা হল সাম্প্রদায়িক। এ বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে তথাকথিত একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বিচারপতি জনাব কে, এম সোবহানের বক্তব্য থেকে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অন্য কিছু নয়, ইসলামই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। কারণ তিনি বলেছিলেন ইসলামী শাসন প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে মাওলানা ভাসানীই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করেন। (দৈনিক বাংলা, ১০ই আগষ্ট, ১৯৮৯ দ্র.) আর ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা কথা দু'টোকে যে তারা সামর্থবোধক মনে করেন, তা বেশ ভাল করে বুঝা গিয়েছিল সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি এরশাদ সাহেব কর্তৃক ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণার পর। তখন সেই রাষ্ট্রধর্ম বিল প্রসঙ্গে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতাদের কাছে মতামত জানতে চাওয়া হলে তাদের অনেকেই স্পষ্ট ভাষায় এটাকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছিলেন। তখনকার পত্র-পত্রিকা পাঠকদের এখনও তা মনে থাকার কথা।

দুই নম্বর কথা হল– ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা একমাত্র ইসলাম ধর্মকেই ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী এবং সাম্প্রদায়িকতা মনে করে থাকেন, খৃস্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম প্রভৃতিকে তারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম মনে করেন না। তাই দেখা যায় বিসমিল্লাহ বলে বা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করলে এর মধ্যে তারা সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধ বোধ করে প্রায় বমি করে

ফেলেন। অথচ এই তারাই আবার বেশ মস্তির সঙ্গে ঢাক বাজিয়ে, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে, ওম শান্তি! ওম শান্তি!! উচ্চারণ করে অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করেন 'নমোঃ তস্য ভগওয়াতো অরহোতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য' বলে। (উল্লেখ্য- ঢাকের বাদ্য, মঙ্গল প্রদীপ এবং ওম শান্তি– এ তিনটা হল হিন্দু সমাজের পূজার তিনটা আবশ্যিক উপকরণ। আর 'নমোঃ তস্য ভগওয়াতো অরহোতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য'–এই বাক্যটা হল নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধদের একটা প্রিয় স্তুতি।) ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকার বৃটিশ কাউন্সিল হলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। আরও ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। একবার প্রেস ক্লাবে এই শ্রেণীর লোকদের একটা অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি। তখন এরূপ কয়েকজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে উঠেছিল, তাহলে তো বাইবেল এবং গীতাও পাঠ করতে হবে, নতুবা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন। কিন্তু জানি না, বৃটিশ কাউন্সিল হলে উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত না হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপিত হল না কেন? এতে করে স্পষ্টতই বুঝা গেল ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক হওয়ার জন্য মুসলমানদের ইসলামের আদর্শ ও সভ্যতা সংস্কৃতি বর্জন করে অমুসলিম আদর্শ চর্চা করা আবশ্যক। কিন্তু হিন্দুদের অহিন্দু আদর্শ চর্চা করা, খৃষ্টানদের অখৃষ্টান আদর্শ চর্চা করা, বৌদ্ধদের অবৌদ্ধ আদর্শ চর্চা করা আবশ্যক নয়। বরং তারা যে মুসলমান নন– এটাই তাদের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, একমাত্র ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামী আদর্শ চর্চা করাকেই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতা মনে করে থাকেন।

এবার আসা যাক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা যে ইসলাম ধর্ম বিরোধিতা ও ইসলাম ধর্ম নির্মূলতা চান, তার প্রমাণ প্রসঙ্গে। এতক্ষণের আলোচনাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করি। তবুও কেউ আরও বাড়তি প্রমাণ চাইলে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন শুরু হওয়ার সূচনা লগ্নেই যা কিছু কাণ্ড-কারখানা শুরু হয়েছিল তা একটু স্মরণ করে দেখতে পারেন। উল্লেখ্য, তখন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাগণ রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত মুছে ফেলে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের

www.maktabatulabrar.com

নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ উৎখাত করে হাতে কলমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইসলাম নির্মূল করণের স্বরূপ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। রাস্তা দিয়ে বয়ে যাওয়া এরকম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কোন মিছিল কর্তৃক 'ফজলুল হক মুসলিম হল'–এর রাস্তা সংলগ্ন গেটের 'মুসলিম' শব্দটি আক্রান্ত হয়েছে কি না তা আমার নিশ্চিত জানা নেই।

এ ছাড়া ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের কোন রকম উত্থান হতে দেখলেই এই চিহ্নিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ প্রচণ্ডভাবে চেঁচামেচি শুরু করেন এবং সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করে তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে দাঁড়ান, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করেন, কবিতার আসর বসান, প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং এদের নেতা-নেত্রীরা ঘন ঘন বিদেশে গিয়ে বিশেষভাবে পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক শাসিত দেশে যেয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সয়লাব বয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বক্তৃতা বিবৃতি দিতে শুরু করেন। ঘন ঘন ঐ চিহ্নিত দেশে যেয়ে এরূপ বয়ানবাজী করা থেকে যদি একটা বিষয় অনুমান করে নেয়া হয়, তাহলে তা বোধ করি তেমন একটা বেখাপ্পা হবে না। বিষয়টা হল ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়েছে বোধ হয় কোন পৌত্তলিক গুরুদেবের আশ্রমে। 'পৌত্তলিক' গুরুদেব বললাম কি কারণে তা তো স্পষ্টই। আর 'আশ্রম' বললাম এ কারণে যে, শুনেছি আশ্রমে নাকি গুরুদেবরা ভাং খেয়ে বুদ হয়ে কিংবা গাঁজার কল্কেয় টান দিয়ে সম্বিতহারা হয়ে এমন সব অলিক তথ্য বলতে শুরু করেন, যা দিব্য চোখে কেউ কোন দিন দেখতে পায় না। ঠিক তদ্রূপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা-নেত্রীদের কথিত সাম্প্রদায়িকতার সয়লাবের এক কাঁতরা জলও কিন্তু আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই না। এই সব কিছু মিলিয়ে তাই অনুমান এসে যায় যে, কোন পৌত্তলিক গুরুদেবের আশ্রমেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম হয়ে থাকবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উভয় পক্ষের চশমায় 'ফজলুল হক মুসলিম হল'–এর মুসলিম শব্দ এবং উক্ত হলের মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে একই রকম সাম্প্রদায়িকতার ছাপ সমানভাবে পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণও আর অস্পষ্ট থাকে না এবং এটা অনুধাবন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় যে, হিন্দুবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চশমার দর্শন সমান্তরালে কেন অবস্থান করছে।

অবশ্য অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অনেককে রীতিমত নামায-রোযা ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম পালন করতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় তাদেরকে ধর্ম-বিরোধী বা ধর্ম নির্মূলকারী হিসাবে চিহ্নিত করা কি অযৌক্তিক নয়? তাদের অবগতির জন্য বলা যায় যে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার মনে করে থাকেন। তাই ব্যক্তিগত জীবনে কেউ কেউ ধর্ম-কর্ম পালন করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কেউ ধর্ম-কর্ম পালন করলে তাতে তাদের কোন আপত্তি থাকে না। তবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ধর্ম-কর্মকে তারা বরদাশত করতে পারেন না। এ সব অঙ্গন থেকে ধর্ম-কর্মকে তারা নির্মূলই করতে চান। তারা স্পষ্টত বলেও থাকেন ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মকে মসজিদেই সীমাবদ্ধ রাখা হোক, রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মকে টেনে আনা ঠিক নয়, এতে ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট(?) হয় ইত্যাদি।

যাহোক 'ফজলুল হক মুসলিম হল'-এর রাস্তা সংলগ্ন গেটে 'মুসলিম' শব্দের অনুপস্থিত থাকার বিষয়টা বিভিন্ন চশমা দিয়ে দেখা শুরু করেছিলাম। একে একে অনেক রকম চশমা দিয়েই বিষয়টা দেখলাম।

সবশেষে ঝুলি থেকে বের করলাম ইসলামের নিরঙা সাদা চশমাটি। এ চশমায় কোন এক পেশে রং নেই। ফলে এতে সবকিছুকে তার আসল রং এবং আসল রূপে দেখা যায়। এ চশমার দর্শনে কোন বাড়তি উত্তাপ-উদ্বেগ নেই। নেই কোন লেজুড়নির্ভর স্নায়ুচাপ। ফলে এ চশমা চোখে দিয়ে সবকিছুকে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে স্বাভাবিক গতিতে দেখে যথাযথভাবে বিচার করা যায়। এ চশমা চোখে এঁটে দেখলাম কোন একটা হলের নামে 'মুসলিম' শব্দ না থাকলে তাতে এমন কিছু এসে যায় না। আল্লাহ নাম-ধাম ও সুরত দেখে কোন কিছু বিচার করেন না, বরং তিনি দেখেন অন্তর বা ভিতরের মূল স্বরূপ আর আমল। এই মর্ম সমৃদ্ধ হাদীছের বাণীটি স্মরণ হল–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও তোমাদের সম্পদ দেখেন না, বরং দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল। (মুসলিম)

www.maktabatulabrar.com

তাই ভাল নাম রেখেও ভেতর খারাপ হলে ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা ভাল নয়; বরং খারাপ বলেই প্রতিপন্ন হয়। মদের বোতলে যদি লেখা থাকে 'পবিত্র ইসলামী সূরা' কিংবা গানকে যদি বলা হয় 'ইসলামী গজল' অথবা ওরস নামক বেদআতী অনুষ্ঠানকে যদি বলা হয় 'মহা পবিত্র ওরস মোবারক' তাতে এগুলো ইসলামসমৃদ্ধ– বৈধ হয়ে যাবে না। আবার কোন আকর্ষণীয় শব্দ প্রয়োগ না করে বা ভাল নাম না দিয়েও যদি ভাল কাজ করা হয়, তবুও ভাল নাম না থাকার কারণে তার ভালত্বের মান হ্রাস পায় না। সাধারণ মানুষের কাছেও অনেক ক্ষেত্রে শুধু নামে বা শব্দে কিছু আসে যায় না। ইসলামে স্বরূপ বা প্রকৃতিই হল মূল বিচার্য বিষয়। তাই তো কালো কুৎসিত কোন মানুষের নাম সুন্দর আলী রাখা হলেও তাকে কালো কুৎসিত বলেই বিচার করা হয়। পক্ষান্তরে বাস্তবে সুন্দর হলে তার কালাচান নাম দেখে কেউ তাকে কুৎসিত ভাবে না। তবে কোন একটা শব্দ/নামকে যদি বদমতলবে অপসরণ করা হয়, তাহলে এখানেও ইসলামের দৃষ্টিতে মনের অবস্থার বিচারে সেটা অপরাধ বলেই বিবেচিত হবে।

গোলাপ শাহ মাজার দর্শন

'ফজলুল হক মুসলিম হল' থেকে একটু দক্ষিণে গিয়ে প্রধান সড়কটি বায়ে মোড় নিয়ে সোজা পূর্বে গুলিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এখানে মোড়ে বা-হাতে রয়েছে সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, ডানে ফুলবাড়িয়া বঙ্গমার্কেট। প্রধান সড়ক ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর সামনে রাস্তার দক্ষিণে পুলিশ হেড কোয়াটার্স, বায়ে উত্তর দিকে ওসমানী উদ্যান। দক্ষিণে নগর ভবন। এটা বিশাল, গুরুগম্ভীর এবং গর্জিয়াস একটা ভবন। এমন গুরুগম্ভীর এবং গর্জিয়াস ভবন ঢাকা মহানগরীতে খুব কম আছে বলে মনে হয়। এই ভবন থেকেই ঢাকা মহানগরীর মেয়রের নেতৃত্বে এই মহানগরীর উন্নয়ন ও পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ভবনটার এই গর্জিয়াস আঙ্গিক দেখলে ধারণা হয়, ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন ও পরিচর্যা কার্যক্রম কতইনা বেগবান ও হাইফাই! কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি সড়ক বাদে এই মহানগরীর বাদ বাকী সড়ক ও অলিগলিসমূহের যে করুণ জরাজীর্ণ অবস্থা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যে মারাত্মক আকাল দেখা

যায়, তাতে সে ধারণা ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়। তখন সন্দেহ হয়– তাহলে কি নগর ভবনের গা গতরের এই রূপ সৌন্দর্য পুরো মহানগরীর রূপ সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েই চর্চিত হচ্ছে? গোটা নগরীর জন্য বরাদ্দকৃত সব স্নো পাউডার কি নগর ভবনের একার চেহারাতেই মাখানো হচ্ছে? ছোট্ট একটা গল্প মনে পড়ে গেল। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া কঙ্কালসার এক ভিক্ষুকের পাশে বিশাল গা গতরের বুর্জোয়া স্টাইলের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সেই ভিক্ষুককে প্রশ্ন করছে– কিরে তোর স্বাস্থ্যের এই দুরবস্থা কেন? তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর স্বাস্থ্যে দুর্ভিক্ষ লেগেছে! ভিক্ষুকটি তখন জবাব দিল– আর আপনাকে দেখে এই দুর্ভিক্ষের কারণটাও বুঝা যাচ্ছে।

যাহোক নগরভবন নিয়ে আর বেশি গবেষণা না করে সম্মুখে অগ্রসর হলাম। কিছুদূর সামনে গিয়ে গোলাপ শাহ মাজার। মাজারটি চৌরাস্তার মাঝে অবস্থিত। এর পূর্বে গুলিস্তান চৌরাস্তা, দক্ষিণের রাস্তা গিয়েছে নর্থসাউথ রোড ও ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের দিকে, আর উত্তর দিকের রাস্তাটি গিয়েছে সচিবালয় এবং জি, পি, ও-এর দিকে। এই গোলাপ শাহ মাজারটি চৌরাস্তার পেটের মধ্যে অবস্থান করছে। এই নিকট অতীতেও মাজার সংলগ্ন একটি মসজিদ ছিল। ব্যস্ততম এই সড়কটির যানজট সমস্যা নিরসনের জন্য বিগত এক সামরিক প্রেসিডেন্টের আমলে মসজিদটি ভেঙ্গে রাস্তা প্রশস্ত করার প্রয়াস নেয়া হয় এবং মুসলিম জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠকে ধামা চাপা দেয়ার জন্য পাশেই চৌরাস্তার উত্তর-পূর্ব কোণে সরকারী খরচে একটি নামাযের ঘর বানিয়ে দেয়া হয়।

এটি গোলাপ শাহ মসজিদ নামেই জনগণের কাছে পরিচিত। তবে মসজিদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন ও আকৃতির সঙ্গে এই মসজিদের ডিজাইন ও আকৃতির বেশ তফাৎ রয়েছে। এমন প্রকট তফাৎ যে, হঠাৎ দেখলে এটি মসজিদ না অন্য কিছু তা ঠাহর করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ছাদটি পল্লী এলাকার দোচালা ছনের ঘরের চালের মত। দেখলে মনে হয় হয়তোবা কোন ত্রাণ সংস্থার গুদাম ঘর হয়ে থাকবে। এক পাশে মিনারার মত উঁচু করে যা বানানো হয়েছে, তা দেখলে মনে হয় ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডের পানি মাপার কোন মিটার বুঝি। আর মসজিদটির স্লাইডিং গ্লাসের দরজা দিয়ে প্রবেশকালে মনে হবে কোন অত্যাধুনিক অফিসে প্রবেশ করছি। সারকথা এর কোন কিছুতেই মসজিদের ঐতিহ্যবাহী

www.maktabatulabrar.com

চিরাচরিত ডিজাইন ও আকৃতি রক্ষা করা হয়নি। হয়তো নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াসে এমনটি করা হয়ে থাকবে। যদি তাই-ই হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়াসটি সফল হয়েছে বলতে হবে। নতুনত্ব প্রয়াসী সাধারণ মানুষের চশমায় তাই মসজিদটি সুন্দরই লাগে। এরূপ চশমা চোখে লাগালেই মনে হবে বাহ, কী নতুন ডিজাইনের মসজিদ! আর এই চশমাধারী ব্যক্তিটি যদি বিশেষ একটা পার্টির ভক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি রীতিমত এটাকে দলীয় কীর্তি প্রচারের একটি প্লাস পয়েন্ট হিসাবেও নিতে পারবেন। যদিও মূল গোলাপ শাহ মসজিদ ভাঙ্গার মাইনাস পয়েন্ট এরই পাশে অবস্থিত, আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাসই ফল দাঁড়ায়। তাতে কি, দলীয় কীর্তি প্রচার করতে চাইলে শুধু প্লাস পয়েন্টগুলোই গেয়ে যেতে হয়। তাই বুঝি এখনো একটা দলকে রমনা পার্কে কাকরাইল মসজিদের জন্য জায়গা বরাদ্দের বিষয়টিকে প্লাস পয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করতে শোনা যায়, যদিও এই দল কর্তৃক উক্ত পার্কেই কালি মন্দির ও শিখা চিরন্তনের জন্য জায়গা বরাদ্দ করার মত একে একে দুইটা মাইনাস পয়েন্ট ইতিমধ্যে সংযোজিত হয়ে গেছে।

যাহোক গোলাপ শাহ মসজিদের ডিজাইন ও নির্মাণশৈলীর বিষয়টা দেখছিলাম। জীবন জগতের সব কিছুতে যারা নতুনত্ব প্রয়াসী, তাদের চশমায় এটা সুন্দরই দেখা যায়। কারণ এর ডিজাইন ও আকৃতিতে মসজিদের চিরাচরিত ডিজাইন ও আকৃতি পাল্টে দিয়ে এক নতুন ডিজাইন ও আকৃতি গৃহীত হয়েছে। তবে ইসলামের খাঁটি চশমা লাগিয়ে যখন বিষয়টাকে দেখলাম, তখন মনে হল এটা প্রশংসনীয় নয়; বরং নিন্দনীয় কর্ম হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদ, কা'বা, দাড়ি, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি হল ধর্মের শে'আর বা বৈশিষ্ট্য, যা দেখলে ইসলাম ধর্মের কথা স্মরণ হয়ে থাকে। তাই ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মসজিদের ঐতিহ্যবাহী চিরাচরিত ডিজাইন ও আকৃতি রক্ষা করেই মসজিদ নির্মাণ করা ওয়াজিব বা জরুরী। যাতে একজন অজানা মানুষও দেখা মাত্রই তার মনের মধ্যে জাগরিত হয়ে ওঠে যে, এটি মসজিদ, এটি ইসলাম ধর্মের ইবাদতখানা, এটি নামাযের ঘর। এভাবে মসজিদ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই সেটি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে নামাযের প্রতি স্মরণী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু চিরাচরিত ডিজাইন ও আকৃতির মধ্যে ব্যত্যয় ঘটলে এই স্মরণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়ে থাকে। তাই ইসলাম ধর্মে মসজিদের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন ও আকৃতি ধরে

রাখার উপর সযত্ন প্রয়াস সব যুগে গৃহীত হয়ে আসছে। শুধু ইসলাম কেন সব ধর্মেই সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তাদের উপাসনালয়ের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন ও আকৃতি ধরে রাখে। হিন্দুদের মন্দির, মঠ, খৃষ্টানদের গির্জা, ইয়াহুদীদের সিনাগগ, বৌদ্ধদের প্যাগোডা স্ব স্ব ডিজাইন ও আকৃতি রক্ষা করেই নির্মিত হয়ে আসছে। ফলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে একজন মানুষ দেখামাত্রই বুঝতে পারে এটি মন্দির বা এটি গির্জা বা এটি প্যাগোডা বা এটি সিনাগগ।

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে শে'আর বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বলে তেমন খুব কিছু নেই। তা সত্ত্বেও তারা ধর্মীয় উপাসনালয়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে। অথচ ইসলামে নাম-ধাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, কাঁট-ছাট, গঠন-অবয়ব ইত্যাদি বহু জাহিরী পার্থিব বিষয়েও যেখানে নিজস্ব শে'আর বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যা রক্ষা করার উপর জোর তাগিদও প্রদান করা হয়েছে। এমনকি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছেড়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকে না; বরং সেই ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়– এমন কড়া সতর্কবাণীও হাদীছে উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে নিজেদের ইবাদতখানা-মসজিদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যাপারে কেন জোর তাগিদ থাকবে না? বস্তুত এর গুরুত্ব এতখানি যে, ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন "মসজিদ নির্মাণকালে মসজিদের ঐতিহ্যবাহী চিরাচরিত ডিজাইন ও আকৃতি রক্ষা করা ওয়াজিব। যদি কোন মসজিদ বিধর্মীদের উপাসনালয়ের ডিজাইন ও আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা ভেঙ্গে মসজিদের চিরাচরিত ডিজাইন ও আকৃতিতে পুনঃনির্মাণ করা ওয়াজিব। আর যদি বিধর্মীদের উপাসনালয়ের ডিজাইন ও আকৃতি না থাকে আবার মসজিদের ঐতিহ্যবাহী চিরাচরিত ডিজাইন এবং আকৃতিও রক্ষা না হয়ে থাকে, তাহলে সেরূপ মসজিদ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণতো জরূরী নয়; তবে মসজিদ নির্মাণের এরূপ শৈলী গ্রহণ করা মাকরূহ ও নিন্দনীয়।" ইসলামের এই ফেকাহ শাস্ত্রের চশমায় গোলাপ শাহ মসজিদকে দেখলে দেখা যাবে– গোলাপ শাহ মসজিদের নির্মাণশৈলীতে এই মাকরূহ পন্থাই গৃহীত হয়েছে। অতএব এটা প্রশংসনীয় নয়; বরং নিন্দনীয়।

মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিজাইন ও আকৃতির এই আনুপূর্বিকতা বজায় রাখার কড়াকড়ির পশ্চাতে মূল কারণ হিসাবে কাজ করছে মনের উপর ডিজাইন ও আকৃতির বিশেষ প্রভাব থাকার বিষয়টি। মনস্তাত্ত্বিকদের

www.maktabatulabrar.com

চশমায় এ প্রভাবটি বেশ ভালভাবে ধরা পড়ে। এক এক ধরনের মানুষের চেহারা দেখলে যে মনের মধ্যে এক এক ধরনের প্রভাব পড়ে থাকে, তাও এই ফর্মুলার আওতাভুক্ত। আপনি হয়ত লক্ষ করে থাকবেন, কোন কোন মানুষের চেহারার আদল এমন, যা দেখলেই মনের ভিতরে দয়া-মায়ার উদ্রেক করে থাকে। এ ধরনের চেহারাকে আমরা মায়াবী চেহারা বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। এর বিপরীত এমন আদলের চেহারাও পাওয়া যায়, যা দেখলেই উত্তম-মাধ্যম দিতে ইচ্ছে হয়। কোন কোন চেহারা দেখলে রাগের উপর পানি বয়ে যায়। এ সব কিছুই হয়ে থাকে চেহারার ডিজাইন ও আকৃতির পার্থক্যজনিত প্রভাবের আওতায়।

শুধু ডিজাইন ও আকৃতির নয়, মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মনের উপর কালার তথা রংয়েরও প্রভাব পড়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পরিবেশে নিরীক্ষণ চালিয়ে এগুলো প্রমাণিত করেছেন। যেমন গাম্ভীর্যপূর্ণ লাল রংয়ের মধ্যে দৃঢ়তা, কঠোরতা ও রুক্ষতার প্রভাব রয়েছে। এর বিপরীত গোলাপী রংয়ের মধ্যে রয়েছে নম্রতা, কমনীয়তা ও দুর্বলতার প্রভাব। মনোবিজ্ঞানীরা ইঁদুরের উপর সমীক্ষা চালিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন। তারা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন একটা ইঁদুরকে গোলাপী রংয়ের খাঁচায় বেশ কিছু দিন রাখা হলে অন্যদের তুলনায় সেটি নিরীহ এবং নিস্তেজ প্রকৃতির হয়ে পড়ে। এর বিপরীত আর একটিকে লাল রংয়ের খাঁচায় রাখা হলে সেটি অন্যদের তুলনায় হিংস্র ও রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে ওঠে। লাল রংয়ের মধ্যে এরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতার প্রভাব থাকার কারণেই বোধ হয় অতীতে থানা, পুলিশ ফাড়ি, আদালত ভবন, জেলখানা ইত্যাদির জন্য গাম্ভীর্যপূর্ণ লাল রং নির্বাচন করা হত। আর গোলাপী রংয়ের মধ্যে কমনীয়তা ও নাজুকতার প্রভাব থাকার কারণেই বোধ হয় প্রেয়সীর কমনীয় গালকে গোলাপের সঙ্গে উপমা দেয়ার প্রচলন ঘটে থাকবে। তবে ইদানিংকালে বিভিন্ন থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এমনকি পুলিশ হেড কোয়ার্টারেও সেই ঐতিহ্যবাহী লাল রং ধরে রাখতে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত পুলিশ বাহিনী এখন আর সেই ঐতিহ্যবাহী কঠোরতা ও দৃঢ়তার প্রতীকও থাকেনি এ কারণে। জনগণের মনেও আগের মত এখন আর তাদের প্রতি সমীহসূচক ভয় নেই; বরং ৫০ পয়সা এক টাকার চুরুট দিয়ে তাদের সঙ্গে তারা সখ্যতা গড়ে তুলতে সাহস পায়। পুলিশ বাহিনী এমন সহজ সখ্যতার প্রতীক হয়ে পড়লে কোন

দুর্মুখ যদি তাদের জন্য নারীত্বের প্রতীক গোলাপ রংয়ের পোশাকের প্রস্তাব করে বসে, তাহলে কী হবে?

যাহোক বিভিন্ন রংয়ের বিভিন্ন রকম প্রভাব থাকার মনোবৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির বিষয়টি আলোচনা করছিলাম। শুধু লাল আর গোলাপী রং নয়, অন্য সব রংয়ের মধ্যেও রয়েছে নানান রকম প্রভাব। সবুজের মধ্যে রয়েছে তারুণ্য এবং সজীবতার প্রভাব। তাই বুঝি মনকে সজীব করার জন্য সবুজের সমাহারসমৃদ্ধ পার্ক বা পল্লীতে চলে যায় মন হাঁপিয়ে ওঠা লোকেরা। আবার অনেকে সবুজের পানে দৃষ্টি দেয়াকে চোখের দৃষ্টি সজীব থাকার অনুকূল বলে বর্ণনা দেন। সাদা রংয়ের মধ্যে রয়েছে পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রভাব। এভাবে এক এক রংয়ের রয়েছে এক এক রকম মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব।

রংয়ের এসব প্রভাবের বিষয়টি শরীয়তেও বোধ হয় কিছুটা লক্ষ রাখা হয়েছে। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রভাবসমৃদ্ধ সাদা রংয়ের পোশাককে তাই ইসলামে সর্বোত্তম পোশাক বলা হয়েছে। হযরত রসূল (সা.) সাদা রংয়ের পোশাককেই বেশি পছন্দ করতেন। সজীবতার প্রভাবসমৃদ্ধ সবুজ রংয়ের কাপড়ও তিনি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করেছেন। কুসুম লাল আর গোলাপী রংয়ের মধ্যে নারীসুলভ কমনীয়তার প্রভাব থাকার কারণেই হয়ত পুরুষের জন্য এসব রংয়ের পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ পুরুষের পক্ষে তার পৌরুষ নিয়ে বহাল থাকাই সমীচীন। আর নিরেট লাল রংয়ের পোশাককে করা হয়েছে অনুত্তম। কারণ রুক্ষতার প্রভাব কাম্য নয়।

রং সম্পর্কিত এসব তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করার উদ্দেশ্য হল মসজিদের ডিজাইন ও আকৃতির মত মসজিদের জন্য রং নির্বাচনের বিষয়েও লক্ষ রাখার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও মসজিদের ডিজাইন ও আকৃতির মত রংয়ের ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা শরীয়তে রাখা হয়নি, তবুও রং-এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের প্রতি লক্ষ রেখে মসজিদের জন্য ভাব-গাম্ভীর্য ও শূচীতার অনুকূল কোন রং নির্বাচন করা ভাল হবে বৈ কি! মনে করুন লাল টুকটুকে আর গোলাপী রং মেখে মসজিদকে নারীসুলভ সাজ দেয়া কি মানানসই হবে?

www.maktabatulabrar.com

গুলিস্তান দর্শন

গোলাপ শাহ মাজারের পূর্বদিকে ঐতিহাসিক গুলিস্তান এলাকা। এলাকাটির নাম গুলিস্তান হয়েছে কেন জানি না। এখানে গুলিস্তান নামক একটা সিনেমা হল রয়েছে। সম্ভবত এরই ভিত্তিতে এলাকাটির নাম গুলিস্তান হয়ে থাকবে।

গুলিস্তান শব্দটি একটি ফার্সী শব্দ। গুল অর্থ ফুল, বিশেষভাবে গোলাপ ফুল। আর স্তান অর্থ স্থান। অতএব গুলিস্তান শব্দের অর্থ ফুলের স্থান। এ অর্থে সিনেমা হলের নাম গুলিস্তান কেন রাখা হল তা জানি না। হয়ত কোনকালে ওখানে ফুলের বাগান থেকে থাকবে, কিন্তু এখন তো ওখানে ফুলের কোন কারবার নেই। পুরাতন আমলে ফুলের বাগান থাকার ভিত্তিতে এ স্থানের নামকরণ এরূপ হয়েছিল কি না জানি না। সম্ভবত তা হয়নি। অবস্থাদৃষ্টেই এরকম মনে হয়। বরং এখন ওখানে যা আছে, তা হল নাচ গান ঢলাঢলির কারবার। যে সব সংস্কৃতি কর্মীদের দ্বারা এসব নাচ গান পরিচালিত হয়ে থাকে, তাদেরকে ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়ে গুলিস্তান বলারও বোধ হয় অবকাশ নেই। কেননা, তাদের চরিত্র আর ফুলের মত পবিত্র থাকে না। কারণ, সংস্কৃতির রস সরোবরে ডুব দিলে নাকি গা গতরে ঐই রসের উৎকট গন্ধ না লেগে পারেই না। সেই গন্ধের উৎকট প্রচণ্ডতার চোটে ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ আর পবিত্রতা ভেগে যায় লক্ষ যোজন দূরে। তবে হ্যাঁ "গুল" শব্দের আর একটা অর্থ আছে ধাপ্পা অর্থাৎ, মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতী। এ অর্থে সত্যিই সিনেমা হল একটা গুলিস্তান। কারণ ওখানে যেসব কাণ্ডকারখান দেখানো হয় তা পুরোটাই ধাপ্পা, মিথ্যা, মেকিয়াভেলী ও জালিয়াতী। সম্ভবত এই অর্থ থাকার কারণেই গুলিস্তান এলাকাটি ধাপ্পাবাজী ও জালিয়াতীর এলাকায় পরিণত হয়ে আছে। কারণ নামের অর্থের প্রভাব পড়ে থাকে। কে না জানে গুলিস্তান এলাকায় কত রকমের জালিয়াতী ও ধাপ্পাবাজী হয়ে থাকে? গ্রাম-গঞ্জের মানুষ যারা কখনও এই গুলিস্তানে বা রাজধানী ঢাকাতেই আসেনি, তারাও এই গুলিস্তান এলাকার প্রতারণার বহু কাহিনী শোনাতে পারে।

নামের খুবই প্রভাব পড়ে থাকে। ভাল নামের যেমন ভাল প্রভাব পড়ে, তেমনি খারাপ নামের খারাপ প্রভাব পড়ে থাকে। একদিন হযরত থানবী (রহ.)-এর দরবারে একজন লোক তার এক অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে

আসল। লোকটি বলল, হযরত! আমার এই পুত্র প্রায়শই অসুস্থ থাকে। হযরত থানবী (রহ.) জিজ্ঞাসা করে জানলেন পুত্রের নাম কালীমুল্লাহ। “কালীম” শব্দের অর্থ আহত। হযরত থানবী (রহ.) ভাবলেন সম্ভবত এই নামের আছরেই ছেলেটি এরকম অসুস্থ থাকে। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন সালীমুল্লাহ। সালীম শব্দের অর্থ নিরাপদ। পরে দেখা গেল ছেলেটি আর পূর্বের মত অসুস্থ থাকে না। হয়ত পরবর্তী নামের প্রভাবেই আল্লাহর রহমতে এমনটি হয়ে থাকবে।

আর একটি ঘটনা বলি। ঘটনাটি বলার আগে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটা কথা বলতে হয়। শি‘আ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা.)ই প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য। এবং এ ব্যাপারে রসূল (সা.)-এর ওসীয়তও ছিল। কিন্তু রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ষড়যন্ত্র করে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও পরবর্তীগণ খলীফা হয়েছেন। এ কারণে শি‘আ সম্প্রদায় রসূল (সা.)-এর পর পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) এবং তাদের সমর্থক সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি তারা অত্যন্ত খাপ্পা। এবার ঘটনাটি শুনুন। এক শি‘আ তার দুটো গাধার একটার নাম রেখেছে আবূ বকর, আর একটার নাম রেখেছে ওমর। এর পর একদিন শোনা গেল ঐই দুটো গাধার একটা তার মালিক ঐ শি‘আকে এমন এক লাথি মেরেছে, যার ফলে লোকটার ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। ঘটনার পরে তদন্ত করে দেখা গেল যে গাধাটার নাম সে ওমর রেখেছিল সেই গাধাটাই এমনটি করেছে। ওমর নাম রাখার কারণেই হয়ত গাধাটার মধ্যে ওমরী মেজায এসে গিয়ে থাকবে। তাই বলছিলাম নামের প্রভাব পড়ে থাকে। এ কারণেই রসূল (সা.)-এর কাছে কারও নাম খারাপ বোধ হলে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখে দিতেন।

যাহোক বলছিলাম গুলিস্তান সিনেমা হলের কথা। সিনেমা হলকে এক এক জন এক এক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। সংস্কৃতির চশমায় দেখলে দেখা যাবে এটা সংস্কৃতির এক বিরাট মাধ্যম। এখানে সংস্কৃতি কথাটার অর্থ বুঝা দরকার ছিল। কিন্তু সংস্কৃতির সংজ্ঞা বা তার অর্থ কি তা আমিও

www.maktabatulabrar.com

ঠিক বলতে পারি না। এ প্রসঙ্গে আমার লেখা “কথা সত্য মতলব খারাপ” বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরাই কেউ কারও সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাই হয়তো কোন রসিক লেখক বলেছিলেন, “সমাজ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা যত, সংস্কৃতির সংজ্ঞাও তত।” বড় বড় মাথাওয়ালাদের সংস্কৃতি বিষয়ের উপরে লেখা বই-পুস্তক পড়লে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠতে হয়। কী যে তারা বলেন, তা তারাই ভাল বুঝেন। কারও সংগে কারও মিল নেই। কতগুলো সুন্দর সুন্দর শব্দ আর বাক্য সাজিয়ে যা তারা পেশ করেন, তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে আসে না। ইংরেজী ‘কালচার’ শব্দেরই বাংলা তরজমা করা হয়েছে সংস্কৃতি। সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ তাঁর ‘বাংলাদেশের কালচার’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন– “কালচার”–এর সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরা একশ’ বছরের দীর্ঘ মুদ্দতে ইউরোপ-আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এই ব্যাপারে একমত হইতে পারে নাই।” এই যখন নামী-দামী পণ্ডিতদের অবস্থা তখন আমার মত চুনোপুটির পক্ষে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব কীভাবে? তবে বুদ্ধিজীবিদের ন্যায় শব্দের মারপ্যাঁচ না দিয়ে মোটা বুদ্ধির মানুষ হিসাবে মোটামুটিভাবে আমরা যা বুঝি তা হল– দীর্ঘদিন ধরে নিদৃষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমাজ জীবনের যে রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও আদব-কায়দা গড়ে উঠে তা-ই সে সমাজের সংস্কৃতি বলে পরিচিতি লাভ করে। বলা বাহুল্য মানুষের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও আদব-কায়দা গড়ে ওঠে তারই বিশ্বাস এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে। ‘খাও দাও ফুর্তি কর’ এই যাদের জীবন দর্শন, ডিসকো ডিসকো হুড়োহুড়ি, ডিসকো ডিসকো পোশাক-আশাক ও চালচলন আর মক্ষিরাণীদের মাতাল করা নগ্ন নৃত্য তাদের সংস্কৃতি হবে বৈ কি? আর সুবিধাবাদ যাদের জীবনের মূল দর্শন, তাদের “যেখানে যেমন সেখানে তেমন” নীতির অনুশীলন এবং হাওয়ার তালে তালে নেচে নেচে চলাই হবে তাদের সংস্কৃতি। আস্তিকের সংস্কৃতি আর নাস্তিকের সংস্কৃতি, সাধু আর শয়তানের সংস্কৃতি, কলীমুদ্দীন ও সুনিলদত্তের সংস্কৃতি কখনও এক হবে না। সম্ভবত এই পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে সবার সংস্কৃতিকে এক করার প্রচেষ্টায় একটা খিচুড়ী মার্কা সংজ্ঞা দিতে গিয়েই যত গোলমালটা

বেঁধেছে। আর এই সুযোগে যার যেটা ইচ্ছে সেভাবে সেটাকে সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিচ্ছে। সংস্কৃতি এখন যেন বাজারী নানার মত– যার যেমন ইচ্ছে ইয়ার্কী তামাশা করছে। কিংবা সরকারী খাস জমির মত– যার যেমন ইচ্ছে দখল করছে, বেগুন ক্ষেত করছে। এ যেন হাওর বিল কিংবা গাঙ্গের পানির মত– যার যেমন ইচ্ছে গোসল করছে। নইলে আমাদের এই নব্বই ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত দেশে যেসব জিনিসকে আমাদের সংস্কৃতির নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে তা সম্ভব হত না।

সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটা জাতির ইতহাস, ঐতিহ্য, তার মন-মানস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। এবং এরই মাধ্যমে জাতির অতীতকে তার ভবিষ্যতের কাছে তুলে ধরা যায়। অতএব এ অর্থে একটি জাতির সংস্কৃতির সংরক্ষণ, তার স্বযত্ন লালন-পালন, সংস্কৃতির অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। একটি জাতিসত্তার বিকাশ সাধন ও তার উন্নতি-অবনতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃতিরূপ সভ্যতার নির্যাসকে অশ্রদ্ধা বা হেনস্থা করার কোন উপায় আছে কী?

কিন্তু অধুনা যেসব বিষয়কে সংস্কৃতির নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেগুলোকে আমাদের মুসলমানদের সংস্কৃতি হিসাবে কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। আজকাল 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান', 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা', 'আনন্দ মেলা', 'শিল্প প্রদর্শনী' ইত্যাদি নামের সবকিছুকেই সংস্কৃতি নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর কম-বেশি আমরা সকলেই জানি এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিছক যৌন আবেদনমূলক অশ্লীল ও নগ্ন নারী নৃত্য পরিবেশন, হুড়োহুড়ি, মাতামাতি এবং নাট্যানুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই হয় না। শিল্প প্রদর্শনীর নামে সারা রাত চলতে থাকে নগ্ন নৃত্য আর নানা অসামাজিক কার্যকলাপ। আর এসব যেহেতু সুকুমার শিল্পবৃত্তি, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা (?) ও ঐতিহ্যবাহী লোক যাত্রা, অতএব সরকারের ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এসবকে অনুমোদন দেবেন না? কাজেই এসবের পৃষ্ঠপোষকতাই সরকারের নীতি হওয়া উচিত (?) তাই তো এসব সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যেই এখন গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও নাট্যগোষ্ঠী, যার শিল্পী সদস্যরা উগ্র মেকআপ মেখে রঙ্গিন আলোয় নেই গোছের এক চিলতে ফিনফিনে কাপড় কোনমতে কোমরে-বুকে জড়িয়ে অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে যুবক-তরুণদের মনকে সংস্কৃত

www.maktabatulabrar.com

করে তোলেন। সরকার মহোদয়ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অতিথিদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে আমাদের মা-বোনদেরকে তাদের সামনে উলঙ্গ করিয়ে থাকেন। কিন্তু বুঝি না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে গোটা দেশকে এরকম কীর্তন ঘরে রূপান্তর ও মা-বোনদের ইজ্জত আব্রু লুটিয়ে দেয়ার মহড়া আমাদের সংস্কৃতি হল কীভাবে!

আজকাল আবার আমরা এই সংস্কৃতির নামে প্রাণহীন, বোধশক্তিহীন বর্ষ, বর্ষা, বসন্ত, পৌষ প্রভৃতিকে বরণ করে থাকি। সংস্কৃতির নামে এই প্রকৃতির পূজা মুসলমানদের সংস্কৃতি হল কীভাবে তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। শীতের মওসুম এলে পৌষ মেলা ও পৌষ পার্বনের নামে যে সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হয়, সাবেক কালে এ সব মেলায় কুস্তি খেলাধুলা যেমন– হা-ডু-ডু, কাবাডি, ঘোড়-দৌড় ইত্যাদির আয়োজন করা হত। তাছাড়া বাঁদর নাচ, ছোট-খাট সার্কাস, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা নাকি থাকত। কিন্তু কালের অগ্রগতির ধাপে ধাপে অন্যান্য সব কিছুর মত পৌষ মেলারও চেহারা ছুরত পাল্টে গেছে। হালে এসব মেলায় নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীদের যে জমজমাট ভিড় দেখা যায়, তার একটা বিশেষ আকর্ষণও নাকি এখানেই। হালের পৌষ মেলায় নতুন নতুন যেসব উপকরণ সংযোজন হয়েছে সেগুলোই মূলত এই আকর্ষণের কারণ। আজকের এসব শিল্প সংস্কৃতিসম্বলিত আনন্দ মেলাকে নাকি অনেকাংশে তুলনা করা যায় কোন পতিতালয়ের সঙ্গে। কারণ প্রবেশ তোরণ থেকে শুরু করে যাত্রা, থিয়েটার, যাদু, পুতুল নাচ, সার্কাস এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানগুলোতে অসামাজিক তৎপরতার অংশটাই থাকে বেশি। সম্প্রতি রূপগঞ্জে অনুষ্ঠিত একটা পৌষ মেলা সম্পর্কে একটি দৈনিকে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তাতে লেখা হয়েছে যে, মেলায় প্রদর্শিত যাদু প্রদর্শনীতে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দুইজন সুন্দরী যুবতী। এটা নিন্দেহে নোংরা এলাকার তৎপরতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এবং মেলায় প্রদর্শিত যাত্রায় চলছে নর্তকীদের যৌন উত্তেজনাকর নাচ ও গান। যাদুর নামে প্রতারণা করে সেখানে দেখানো হচ্ছে প্রায় ডজন খানেক নগ্ন নৃত্য। তা ছাড়া দর্শক আকর্ষণ করার জন্য মেলার গেট ও টিকিট কাউন্টারে ৩/৪ জন করে যুবতী দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সার্কাসেও চলছে একই ধরনের

ধিংগী নৃত্য। সেই সংগে আছে মদ, জুয়া ও নীল ছবির প্রদর্শনী। এসব দেখে শুনে মনে হবে যে, এ মেলা তো মেলা নয় হীরামতি কিংবা টানবাজারের মেলা নিশ্চয়ই।

এইভাবে শিল্প সংস্কৃতির নামে মৌসুমী উৎসবে চলছে বেহায়া বেলেল্লাপনার মহড়া। এছাড়া সিনেমা সংস্কৃতি, টেলিভিশন সংস্কৃতিসহ ডজন ডজন তরতাজা সংস্কৃতি তো রয়েছেই, যাতে মারপিট, ধুমধাড়াক্কা, তরুণীদের ধিংগীপনা, যৌন সুড়সুড়ি, ভাঁড়ামী সংলাপ, প্রেমলীলা ছাড়া মুখ্যত সার কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ভাড়ামী, নাটুকেপনা আর সুড়সুড়িমূলক সংস্কৃতিই কি মুসলমানদের সংস্কৃতি? আমাদের পূর্ব পুরুষদের আমলে পুরো দেশটাই কি একটা রঙ্গমঞ্চ ছিল কিংবা নৃত্যশালা? নয়তো এসব আমাদের সংস্কৃতি হলো কীভাবে? কিংবা কখন থেকে সংস্কৃতির অঙ্গনে এ সবের অনুপ্রবেশ ঘঁটল?

যাহোক যা বলছিলাম এই তথাকথিত সংস্কৃতির চশমায় দেখলে গুলিস্তান সিনেমা হলকে সংস্কৃতির একটা জ্বলন্ত মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং একটি ঐতিহ্যবাহী সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মূল্যায়িত হবে। কিন্তু ইসলামের নির্ভেজাল চশমায় দেখলে মনে হবে এটা সংস্কৃতি নয় বরং অপসংস্কৃতি। এটা মনকে সংস্কৃত নয় বরং কলুষিত করে তোলে। এর দ্বারা উন্নতি নয় বরং অবনতি সাধিত হয়। এর দ্বারা লাভ নয় বরং অনেক রকম ক্ষতি সাধিত হয়– চরিত্রের ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতি, অর্থের ক্ষতি, সময়ের ক্ষতি, সর্বোপরি ঈমান ও আমলের ক্ষতি।

জাতীয় মসজিদ দর্শন

গুলিস্তান চৌরাস্তা থেকে পূর্ব দিকে বঙ্গভবন, দক্ষিণ দিকে নবাবপুর, পশ্চিম দিকে গোলাপ শাহ মাজার ও মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজজী হুজুর সড়ক। উত্তর দিকে সোজা সরল রেখায় স্বগর্বে ভাস্বরমান জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম। এ মসজিদটি শুধুই যে ভাস্বরমান, তা নয়; এটি ভাসমানও। কারণ নিচ তলা থেকে এটি মসজিদ নয়। নিচ তলায় মার্কেট, তার উপর মসজিদটি ভাসমান। তাই একজন রসিক মন্তব্য করেছেন, আমাদের জাতীয় মসজিদের তলা নেই! আমাদের জাতীয়

www.maktabatulabrar.com

অনেক কিছুই কি এমন? আমাদের জাতীয় অর্থনীতিরও নাকি তলা নেই, সেটি নাকি তলাবিহীন ঝুড়ির মত! আমাদের জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক নীতি তো আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এক স্থানে শেকড় গাড়তেই পারল না, যখন যেখানে সুবিধে সেখানে– আজ এখানে কাল ওখানে নোঙ্গর গাড়তে হয়। আর জাতীয় চরিত্র তো মাশাআল্লাহ হাওয়ার তালে তালে যখন যেদিকে সুবিধে, সেদিকেই পাল খাটিয়ে চলতে থাকে, যার কোন স্থিতি বলতে কিছু নেই। তাহলে আর জাতীয় কোন্টার তলা থাকল? হয়ত কাকতালীয় ব্যাপারের মতই আমাদের জাতীয় মাছ- ইলিশ মাছও নাকি ইদানিং তলা খুঁজে পাচ্ছে না। নদীগর্ভে পলিথিন ইত্যাদি বর্জ্যে নাকি এমন একটা আবরণ পড়ে গেছে, যার কারণে রুট চিনতে ভুল করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের নদীগুলোতে না উঠে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। যার ফলে এখন ইলিশের আমদানী কম। এর অর্থ হল তারাও তাদের সুপরিচিত তলা খুঁজে পাচ্ছে না। আর শুনেছি জাতীয় পাখি দোয়েল নাকি পা উপর দিকে দিয়ে ডিমে তা দেয়। এর অর্থ হল সে তার আপন তলাই চেনে না।

যাহোক জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের কথা বলছিলাম। 'মসজিদের শহর' বলে খ্যাত এই ঢাকার দর্শনীয় মসজিদ এটি। গ্রাম বাংলার বা মফস্বলের মুসলমান যারা ঢাকা দেখতে আসেন, তাদের দর্শন তালিকায় চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, শিশু পার্ক, রমনা পার্ক, লালবাগ কেল্লা ও এয়ার পোর্ট ইত্যাদির সঙ্গে বায়তুল মোকাররমও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসব দর্শনার্থীদের চশমায় বায়তুল মোকাররমকে ভাব গাম্ভীর্যময়, জাঁক জমকপূর্ণ বিশাল বর্গক্ষেত্রের এক ঐতিহ্যবাহী মসজিদ বলে প্রতীয়মান হয়। ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি চিরাচরিত ভক্তি মাধুরতায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এর সমুচ্চ ছাদে স্থাপিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক থেকে মুয়াযযিনের কণ্ঠে গুরুগম্ভীর আওয়াজে যখন ধ্বনিত হয়– আল্লাহু আকবার ... আযান ধ্বনি, তখন সেই ধ্বনি হৃদয় পটে অনুরণিত হতে থাকে ভক্তির শত-সহস্র ঢেউয়ের ছন্দ ব্যঞ্জনায়। মনে হয় মসজিদের শহর বলে খ্যাত এই ঢাকা শহরের অসংখ্য মীনার থেকে এভাবেই প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে অপরাজিত অনবনত বিজয় ধ্বনি।

এরপর ঝুলি থেকে বের করলাম সেই অনেক দিন আগে ব্যবহার করা বুদ্ধিজীবীদের চশমা জোড়া। পাঠকবর্গের হয়তো স্মরণ থাকবে এটা

'এন্টি রিলিজন্ কোম্পানী লিমিটেড'–এর তৈরী চশমা। এ চশমা চোখে দিলেই ইসলাম ধর্ম, এ ধর্মের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরাম এবং এ ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছুকেই নন্দ ঘোষের মত দেখা যায়। যত দোষ নন্দ ঘোষ! আলেম ওলামা, মসজিদ মাদ্রাসা, দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, তাসবীহ এগুলোই(?) হল সব অনাসৃষ্টির মূল! এই চশমা চোখে দিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদকে দেখতে চাইলাম। চোখে আঁটতেই মনে হল এই সব মসজিদে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার লাউড স্পিকার বাজে। উচ্চ চিৎকার করে এতে আযান দেয়া হয়। এই একঘেয়ে কর্কশ সুর আর বরদাশত হয় না। বিশেষভাবে ফজরের সময় একযোগে এসব মসজিদ থেকে চিৎকার করে ভোর রাতের আরামের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানো হয়। এটা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। তাই তো স্বাধীনতার দেশ বলে কথিত বৃটেনের অনেক অঞ্চলে মুসলমানদের মসজিদে আযান দেয়ার অধিকারকে স্বীকার করা হয় না। গ্লাসগো, নরউইচ, কার্লাইল প্রভৃতি অঞ্চলে আযানে মাইকের ব্যবহারকে রীতিমত বিদ্বেষের চোখে দেখা হয়। গণতন্ত্রের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও মসজিদে আযান দেয়া নিষিদ্ধ আছে। আমাদের দেশেও মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া উচিত। অন্তত মাইকে আযান প্রদান অতি অবশ্যি নিষিদ্ধ করা উচিত। এই আহ্বান শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কবি শামসুর রহমান তার 'জন্মান্ধের মতো' কবিতায় সুন্দরই (?) বলেছেন,

মুয়াজ্জিনের ধ্বনি
যেন ক্যানভাসারের মত
অলজ্জিত বেশ্যাবৃত্তি
অলিতে গলিতে
কারা যেন বাস্তবিক
কুলকুচি করে ফেলে দেয়
স্বপ্ন স্মৃতি মেদমজ্জ
সুন্দরের।

নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা! এমন বে-ঈমানী ভাবনা আর কতক্ষণ? সহসা এ চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে ফেললাম। তবুও আমি অনেক কিছুকে দেখতে চাই অনেক রংয়ের চশমায়। তাই আবারও ঝুলি থেকে

www.maktabatulabrar.com

বের করলাম আর এক জোড়া চশমা। এটি হল 'মেড ইন লেনিন কোম্পানী'-এর সমাজতন্ত্রের চশমা। পৃথিবীর সর্বত্রই এই কোম্পানী গণধিকৃত হয়ে গেছে। এই কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্য জনগণ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। সেই ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে চলা পথিকেরা এখন দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য থুতু নিক্ষেপ করতে করতে নাকে রুমাল গুঁজে দ্রুত হেঁটে পার হয়ে যায়। তবে অন্যান্য দেশে যাই হোক, আমাদের দেশে এখনও এই কোম্পানীর দু'একজন ভক্ত পাওয়া যায়। যারা এখনও এই কোম্পানীর চশমা ব্যবহার করে থাকেন। এসব লোকের স্বভাব হল– পাশ্চাত্য দেশে যে সব জিনিস ব্যবহারের পর ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলোকেই তারা লেটেস্ট মনে করে চোখ-কান বুজে গো গ্রাসে গিলে খেতে থাকেন। যাহোক এই সমাজতন্ত্রের চশমা চোখে আঁটতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ১৯১৭ সালের রাশিয়ার কম্যুনিষ্টগণ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর সেখানকার মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে কৃত কর্মকাণ্ডের দৃশ্যটা। তখন ক্ষমতা দখলের কিছু দিনের মধ্যেই সমাজতন্ত্রীরা সে দেশের ২৬ হাজার মসজিদে কেবল আযান দেয়াই বন্ধ করেনি বরং খোদ মসজিদগুলোই বন্ধ করে দেয়। আর সেই সঙ্গে বন্ধ করে দেয় ২৪ হাজার মাদ্রাসা। লক্ষ লক্ষ আলেমকে হয় সরাসরি হত্যা করে দেয়, না হয় সাইবেরিয়ার নির্বাসিত করে। এভাবে আযান-নামায কোন কিছুই যাতে সে দেশে অবশিষ্ট না থাকে, তার নিশ্চয়তা বিধান করে। এই দৃশ্য চোখের সামনে আসার পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের জৌলুস আর এখানকার আযানের দাপট দেখে গাত্রদাহ শুরু হল। সেই সঙ্গে মসজিদের শহর ঢাকার অলিগলিতে সুউচ্চ মিনারসমূহ থেকে স্বগর্বে উচ্চারিত বলিষ্ঠ আযান ধ্বনি আর আলেম-উলামার বিস্তৃতির কথা স্মরণ হতেই সেই গাত্রদাহে যেন গরম তেলের সংযোজন ঘটল। এগুলো নিঃশেষ না হলে যেন আর স্বস্তি ফিরে আসবে না। কম্যুনিজমের সুবাতাস (?) প্রবাহিত না হলে এই গাত্রদাহ বুঝি আর প্রশমিত হবে না! কিন্তু সারা বিশ্বে রাশিয়ার কম্যুনিজম গণধিকৃত হয়ে পড়েছে। এই কম্যুনিজমকে কীভাবে এ দেশের মানুষের গলাধঃকরণ কারানো সম্ভব? হ্যাঁ, একটা সুন্দর ফন্দি আঁটা যায়, তা হল– আমরা প্রচার করব– আমরা রাশিয়ার সমাজতন্ত্র নয়, আমরা দেশীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এটা হবে দেশীয় গাছ-গাছড়ায় তৈরী,

সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ফর্মুলায় প্রস্তুতকৃত মেড ইন জিঞ্জিরা-সমাজতন্ত্র! হে! হে!! হে!!! বাঙ্গালীদেরকে প্রতারিত করা কত সহজ!

তওবা! তওবা!! কোন মুসলমান এমন চশমা চোখে এঁটে থাকতে পারে? ঝট করে খুলে ফেললাম চশমা জোড়া। চোখ দু'টোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য একটু রগড়ে নিলাম।

তারপর জাতীয় মসজিদকে দেখতে চাইলাম হিন্দুবাদের চশমায়। কিন্তু এই চশমায় কেমন দেখাবে তা এমনিতেই মনে পড়ে গেল। তাই বাড়তি সময় নষ্ট করতে প্রবৃত্তি জাগল না। এ চশমায় কেমন দেখাবে তা মনে পড়ে গেল ভারতের কট্টর হিন্দুবাদী সংঘটন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জনসংঘ প্রভৃতির মুখপাত্র হিসাবে সুপরিচিত কলকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার পেশাদার লেখক অনিল ভট্টাচার্যের একটা ভাষ্য থেকে। উক্ত যুগান্তর পত্রিকার ৫ই অক্টোবর/১৯৮৫ সংখ্যায় তিনি মসজিদ ও আযান ইত্যাদি সম্পর্কে তার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'এই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতিটি বড় মসজিদে চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার নামাযের সময় লাউডস্পিকার বাজে। সব সময় লাউডস্পিকারের উচ্চ চিৎকার নিশ্চয় কানে ভাল লাগে না। ... ইত্যাদি। আরও মনে পড়ে গেল ঐ সকল হিন্দুবাদী সংগঠনের চাপের মুখে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ বন্ধ করে দেয়ার কথা। মাসিক এরাবিয়া, লন্ডন, এপ্রিল/ ১৯৮৬–এর বর্ণনা মতে ইতিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার মসজিদ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিংবা মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। খোদ কলকাতা শহরেই দুটো বড় মসজিদ স্থানীয় কংগ্রেস পার্টির অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ বৈশাখ ১৩৯৬) এ সকল কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হিন্দুবাদী চশমায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ অন্য সব মসজিদকে কেমন দেখাবে, তা আর বুঝতে বাকি রইল না। তবে একটা বিষয় বুঝতে বাকি রয়ে গেল। তা হল কম্যুনিষ্ট, হিন্দু ও বুদ্ধিজীবীদের চশমায় মসজিদ ও আযানকে প্রায় অভিন্ন দেখায় কেন? কম্যুনিষ্ট ও হিন্দুদের মসজিদ ও আযান ইত্যাদিতে অসহিষ্ণুতার একটা বোধগম্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাহল এগুলো স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ইসলামের নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কল্পনা করে তারা হয়ত এক ধরনের বিকৃত মানসিক শান্তি লাভ করে থাকবে। কিন্তু মুসলিম পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী কোন মুসলমান যখন

www.maktabatulabrar.com

ইসলামের জৌলুস দেখে গাত্রদাহ অনুভব করে কিংবা আযানের আহ্বান শুনে প্রায় বমি করে দিতে চায়, তখন তার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? কারণ হয়ত একটাই। তাহল তার চোখের চশমা জোড়া 'এন্টি রিলিজন্ কোম্পানী লিমিটেড'-এর তৈরী। আর এই 'রিলিজন্' বলতে অবশ্যই উদ্দেশ্য হল ইসলাম ধর্ম। অতএব, কারণে-অকারণে ইসলাম ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিদ্বেষ দর্শনই হল এ চশমার জেনারেল মেন্যুয়েল।

এবার ঠাণ্ডা চোখে নিরুদ্বিগ্ন নয়নে পরিধান করলাম ইসলামের কৃত্রিম রংমুক্ত সাদা চশমা জোড়া। দৃষ্টিপটে ভেসে উঠল সূরা হজ্জের ৩২তম আয়াতটি–

وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

অর্থাৎ, 'কেউ আল্লাহর নির্দশনাবলীকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া-পরহেযগারী সঞ্জাত।' (সূরা হজ্জ : ৩২) দৃষ্টিপটে ভেসে উঠল মসজিদ সম্বন্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী–

اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَآئَةِ الْقُرْآنِ.

'মসজিদ হল আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য।' (মুসলিম)

প্রত্যেকটি মসজিদ তাই নামায, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মসজিদ ও মসজিদের মিনার যেন মাথা উঁচু করে এ সমস্ত ধর্মীয় কাজের দিকে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। মসজিদ হল তাই ধর্মের স্মরণচিহ্ন, মসজিদ হল ধর্মের নিদর্শন। যার হৃদয়ে ধর্মীয় চেতনা থাকবে, তার হৃদয়ে তাকওয়া-পরহেযগারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ পাক তাই কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে, তা তো তার হৃদয়ের পরহেযগারীর চেতনা থেকে উৎসারিত বিষয়।'

দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ হল আল্লাহ্র ঘর বায়তুল্লাহ বা ক্বা'বা শরীফের শাখা। তাই মসজিদ দর্শন মাত্রই স্মৃতিপটে জাগরিত হয় বায়তুল্লাহ্র ভাব-গাম্ভীর্যময় পবিত্র অনুভূতি। সেই সঙ্গে জাগরিত হয় মসজিদে নববীর পূণ্য স্মৃতি, যেখানে থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন কিভাবে করতে হয় মসজিদ পরিচালনা

আর কিভাবে করতে হয় মসজিদের পরিচর্যা ও মূল্যায়ন। ইসলামী চেতনার মূল কেন্দ্রবিন্দু এই মসজিদে নববী শুধু ইট-পাথরের একটি আটপৌরে মসজিদ ছিল না। বরং তা ছিল একটি প্রাণবন্ত মসজিদ। যেখানে দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত আইন-কানুন তৈরী হত। এখানেই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ ওহী লিখন দফতর। যে দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বলা হত 'কাতিবে ওহী।' হযরত আলী, উসমান ও মুআবিয়া (রা.)সহ অনেকেই ছিলেন সেই দফতরের দায়িত্বে নিয়োজিত। এটাই ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন যার সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রক। এখান থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি লোকদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতির নিকট দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার কার্যে প্রেরণ করতেন। এখান থেকেই তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট পত্র ও নানাবিধ ফরমান লিখাতেন এবং প্রাপ্ত চিঠি ও তথ্যাবলীর অনুবাদ করাতেন। এ কাজের দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত করেন যায়েদ ইবনে সাবেত ও আব্দুল্লাহ ইবনুল আরকামকে। এ মসজিদ থেকেই তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে জেহাদের জন্য প্রেরণ করতেন। ইসলামী ফৌজকে জেহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণও এখানেই দেয়া হত। এই মসজিদ থেকেই পরিচালিত হত যাকাত, সদকা, জিযয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য। যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) ছিলেন সেই বিভাগের একজন কর্মকর্তা। এই মসজিদেই রাখা হত জাতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব। শুধু জাতীয় আয়-ব্যয় নয়; বিভিন্ন গোত্রের লোক সংখ্যা, তাদের জলাশয় ও কুয়ার হিসাব প্রভৃতি জাতীয় জরিপের কার্যক্রমও পরিচালনা হত এখান থেকে। যার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরকাম ও আ'লা ইবনে উক্‌বা (রা.)। এখানেই বসত দেশী-বিদেশী লোকদেরকে নিয়ে দরবার। বিবদমান দুই পক্ষের বিচারের জন্য এখানেই বসত বিচারসভা। এভাবে চিন্তা করলে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুসারে বলা চলে মসজিদে নববীতেই ছিল আইন প্রণয়ন বিভাগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগ, বিচার বিভাগ, দাওয়াত ও প্রচার বিভাগ, ওহী লেখন বিভাগ, পত্র লিখন ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বিভাগ, সামরিক প্রশিক্ষণ বিভাগ, জাতীয় তহবিল বিভাগ, জরিপ বিভাগ, শিল্প বিভাগ, শ্রম ও জনশক্তি বিভাগ, সমাজ কল্যাণ বিভাগ ইত্যাদি। অর্থাৎ,

www.maktabatulabrar.com

একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদে নববী। মসজিদ কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছিল সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্র। তখনকার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা হিসাবে মসজিদে নববীকে যদি বলা হয় জাতীয় মসজিদ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই জাতীয় মসজিদের ইমাম ও খতীব, তাহলে দেশ ও সমাজে জাতীয় মসজিদের অবস্থান এবং সেই জাতীয় মসজিদের ইমাম ও খতীবের অবস্থান কেমন হতে হয়, তার একটি নমুনা সামনে এসে যায়। যদিও জনসংখ্যা এবং আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় মসজিদকে এখন সকল বিভাগের মূল সচিবালয় হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব বা সঙ্গতও নয়, কিন্তু মসজিদ বিশেষত জাতীয় মসজিদ অবশ্যই থাকবে নামায, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুত্বের মর্যাদায় সমাসীন। যেই জাতীয় মসজিদের গ্রাউন্ড থেকে জাতীয় ইমাম ও খতীব কর্তৃক প্রদত্ত লিগ্যাল এডভাইজ অনুসারে পরিচালিত হবে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র। ইসলামের চশমায় জাতীয় মসজিদের এমন একটি অবয়ব ও রূপরেখাই চোখের সামনে মূর্তমান হয়ে উঠল। সেই অবয়ব ও রূপরেখার সঙ্গে আমাদের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমকে কোনভাবেই এডজাষ্ট করতে পারছিলাম না। আর তা পারবইবা কেমন করে, যখন শুনতে পাই, জাতীয় মসজিদের খতীবের কথায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পরিচালিত হওয়া দূরের কথা স্বয়ং খতীবকেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ইশারা-ইঙ্গিতে লেজ নাড়াতে হয়, অন্যথায় ক'দিন পরপরই শোকজ নোটিশ খেতে হয় কিংবা চাকরিচ্যুতির পত্র পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। গায়ে-গতরে বিস্তৃত হলে কিংবা অঙ্গসৌষ্ঠবে শ্রেষ্ঠ হলেই জাতীয় মসজিদ হয়ে যায় না, জাতীয় মসজিদ হয় জাতির সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দুত্বের মর্যাদায় সমাসীন হলে। অন্তত মুসলিম সমাজের জাতীয় মসজিদের ক্ষেত্রে অবশ্যই একথাটি প্রযোজ্য।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার দর্শন

জাতীয় মসজিদ-বায়তুল মুকাররম দর্শন শেষে প্রস্থান করার পূর্বে মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ সংলগ্ন ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারটি এক নজর দেখে যেতে মনে চাইল। এটি ঢাকা শহরের ইসলামী

পাঠাগারসমূহের মধ্যে একটি বৃহত্তম পাঠাগার। এখানকার গ্রন্থসংখ্যা বিপুল। যার মধ্যে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, ফার্সী প্রভৃতি বহু ভাষার গ্রন্থ রয়েছে। এখানকার সিংহভাগ গ্রন্থ ইসলাম ধর্ম ও তার আনুসঙ্গিক বিবিধ শাস্ত্র সম্বন্ধীয়। কিছু অন্য ধরনের গ্রন্থও রয়েছে। যদিও তার সংখ্যা খুবই সীমিত। ছাত্র জীবনে বহুবার এখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে। পরবর্তীতেও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনাকালে প্রয়োজনে রেফারেন্স সংগ্রহের জন্য এখানে যেতে হয়েছে। তাই ভিতরে গিয়ে গ্রন্থাদি দর্শন বা অধ্যয়ন পূর্বক নতুন কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করার নেই। আজ শুধু আমার ঝুলির কয়েকটা চশমা দিয়ে পাঠাগারটি দেখতে চাইলাম।

প্রথমে ঐতিহাসিকদের চশমায় রাজধানি ঢাকার এই বৃহত্তম ইসলামী পাঠাগারটিকে দেখতে চাইলাম। কিন্তু এই চশমা চোখে আঁটতেই খুব করুণ সব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল। দৃষ্টিপটে ভেসে উঠল যুগে যুগে দেশে দেশে গড়ে ওঠা এরকম বহু বৃহত্তম ইসলামী পাঠাগারের চিত্র। সেই পাঠাগারসমূহের সঙ্গে কৃত বিধর্মীদের বিমাতাসুলভ ও অমানবিক আচরণগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল।

এখানে বলে রাখতে হয় একমাত্র ইসলাম ধর্মেই জ্ঞানচর্চার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে প্রত্যেকের উপর জ্ঞান শিক্ষাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। অন্য কোন ধর্মে জ্ঞানচর্চার প্রতি এরূপ তাগিদ তো নয়ই, উৎসাহ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। বরং কোন কোন ধর্মে জ্ঞান চর্চার প্রতি রীতিমত অনুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ গোষ্টি ব্যতীত অন্য কারও জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার অধিকার পর্যন্ত রাখা হয়নি। এভাবে ঐ ধর্মে জ্ঞানচর্চাকে অনুৎসাহিত বরং সিংহভাগ লোকের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে প্রত্যেকের উপর জ্ঞান শিক্ষাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে এবং ইবাদতের চেয়ে জ্ঞান অর্জনের ছওয়াব বেশি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এভাবে ইসলাম ধর্মে জ্ঞানচর্চার প্রতি উৎসাহ থাকার ফলে জ্ঞান পীপাসু মুসলিম জনগণ কর্তৃক যুগে যুগে দেশে দেশে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল বহু সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও লাইব্রেরী। মুসলিম জ্ঞানসাধক ও মনীষীগণ কর্তৃক রচিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাসমূহের উপর অসংখ্য গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র। আর এ সব গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রের অনেকটার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হয়েছে তখনকার

www.maktabatulabrar.com

গ্রন্থাগারসমূহে। কিন্তু জয় পরাজয়ের চিরাচরিত ধারায় যখনই কোন অমুসলিম শক্তি কোন মুসলিম দেশ দখল করতে সক্ষম হয়েছে, তখনই তারা মুসলানদের সুদীর্ঘ সাধনায় তিলে তিলে গড়ে তোলা পাঠাগারসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই গত মাসেও (মে/২০০৩) দেখতে পেলাম ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী কর্তৃক ইরাকের রাজধানি বাগদাদ জবর দখলের অব্যবহিত পরেই প্রথমে যে কাজগুলো তারা করেছে তার মধ্যে একটা হল বাগদাদের সংগ্রহে থাকা হাজার হাজার বছরের পুরনো বই-পত্রগুলো তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। তার মধ্যে কিছু তারা নিজ মদদে লুটপাট হতে দিয়েছে, আর কিছু তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ইতিহাসের চশমায় চোখের সামনে ভেসে উঠল এই বাগদাদে ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে হালাকু খাঁ কর্তৃক খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহকে পরাজিত করার পর সেখানকার শাহী লাইব্রেরীকে ধ্বংস করে দেয়ার দৃশ্য। হালাকু খাঁর নির্দেশে বিশাল শাহী লাইব্রেরিটির সমুদয় কিতাব-পত্র ও পাণ্ডুলিপি দজলা নদীর গর্ভে ফেলে দেয়া হয়, যার ফলে বাঁধের মত হয়ে দজলা নদীর শ্রোত বন্ধ হয়ে যায় এবং হস্তলিখিত সেই সব গ্রন্থ ও কিতাব-পত্রের কালিতে দজলা নদীর পানি কাল বর্ণ ধারণ করে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে আরও ভেসে উঠল এর চেয়ে আরও করুণ দৃশ্য। সে দৃশ্যটা হল এর পূর্বে দজলা নদীর পানি লাল বর্ণ ধারণ করার দৃশ্য ও তার করুণ সূচনা কিভাবে হল তার কথা। বাগদাদ দখলের পর হালাকু খাঁ মুসতা'সিম বিল্লাহ্‌র মাধ্যমে জোরপূর্বক ফরমান জারী করিয়ে সমস্ত মুসলানকে নিরস্ত্র অবস্থায় বাগদাদের বাইরে সমবেত করে। তারপর ঘটে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্নতম, বর্বরতম এবং নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডটি। একে একে সমস্ত মুসলমানকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করা হয়। বাগদাদ এবং তার উপকণ্ঠের প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয় আর এই সমস্ত মুসলমানের লাশ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের রক্তে দজলা নদীর পানি লাল বর্ণ ধারণ করে। এই লাল বর্ণ ফুরাতে না ফুরাতেই আবার গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির কালিতে দজলা নদীর পানি কাল বর্ণ ধারণ করে। দজলা নদীতে এরূপ দজ্জালী কাণ্ড ঘটানোর সে এক করুণ ইতিহাস।

এভাবে যুগে যুগে অমুসলিম শক্তি মুসলিম গ্রন্থাগারগুলোকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু মুসলিম বিজয়ী শক্তি কখনও কোন গ্রন্থাগার ধ্বংস করেনি।

কারণ জ্ঞানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে। হোক অমুসলিম লেখকের গ্রন্থ, তবুও তা ধ্বংস করা হবে না। অবশ্য মুসলমানদের উপর এমন একটা দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মিসর বিজয়ের পর মুসলিম সেনাপতি হজরত আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা.) নাকি আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়ে ছিলেন– এমন একটা অভিযোগ অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। অভিযোগে বলা হয় খলীফা হজরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশেই নাকি এটা করা হয়েছিল। তিনি নাকি এই যুক্তিতে ঐ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ সকল বইতে যে তথ্য ও বিবরণ রয়েছে তা যদি কুরআন বিরোধী হয় তাহলে তা খোদাদ্রোহিতামূলক এবং যদি কুরআন সমর্থক হয় তাহলে তার আদৌ প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, যে কোন যুক্তিতেই লাইব্রেরীটি ধ্বংসযোগ্য বলে তিনি রায় দিয়েছিলেন। আর সেই রায় মোতাবেক সেনাপতি সে লাইব্রেরীটি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেন।

এ অভিযোগের উত্তর প্রসঙ্গে দৈনিক ইনকিলাবের একটি উপসম্পাদকীয় (কাজির দরবার) থেকে কিয়দংশ তুলে ধরছি। "মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কেবল খৃষ্টানগণ নয় হিন্দুগণও বারবার এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বাংলাভাষায় সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই কল্পকাহিনীটি আমদানী করেন। ঘটনাটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন "আরব সেনাপতি অমরু আলেকজানদ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আলেকজানদ্রিয়ার গ্রন্থশালার কী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তখন খালিফা উত্তর দিলেন, গ্রন্থশালার গ্রন্থগুলি হয় কোরানের মতের অনুযায়ী, না হয় বিরুদ্ধ। যদি অনুরূপ হয় তো এক কোরান থাকিলেই যথেষ্ট, আর যদি বিরুদ্ধমত হয় তো গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর।" {বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার, শ্রী প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা, ১৩৬৪}

এই কাহিনীর উৎপত্তি কোথা থেকে কিভাবে হল সে সম্পর্কে আমার নিজের মনে বরাবরই একটি কৌতুহল ছিল। কারণ বিদ্যা অর্জন করা যে মুসলমানের ফরয করা হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে যাকে সুদূর চীন পর্যন্ত যেতে বলা হয়েছে, সেই মুসলমানের পক্ষে অমন একটি বিশ্বখ্যাত জ্ঞানভাণ্ডার পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা আমার কাছে কেমন যেন আদৌ

www.maktabatulabrar.com

বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ফলে আমি আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত কিঞ্চিত অনুসন্ধান চালাই এবং ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ খৃষ্টান লেখকদের বইপত্র খুঁজতে থাকি। এডওয়ার্ড গিবন, যিনি তাঁর "দি ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এমপায়ার"{মোসেস হাডাস সম্পাদিত ও ১৯৬২ সালে ফসেট ওয়ার্লড লাইব্রেরি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ লন্ডন, ১৭৭৬} নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে "মুহাম্মদ এক হাতে তরবারি এবং অপর হাতে কুরআন নিয়ে খৃষ্টধর্ম ও রোমের ধ্বংসস্তুপের উপর তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছিলেন বলে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন", তিনিও কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে রায় দিয়েছেন। ঐ একই গ্রন্থে তিনি বলেছেন, কাহিনীটি আদৌ সত্য হতে পারে না। কারণ, ওমরের এই কঠিন দণ্ডাদেশ বিবেকবান আলেমদের বিশুদ্ধ সনাতন নীতিবাক্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তারা বারবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত হয় তাতে অগ্নি সংযোগ করা নিষিদ্ধ এবং বিধর্মী বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও কবিদের রচিত গ্রন্থ বৈধ ও সঙ্গতভাবেই বিশ্বাসীগণ ব্যবহার করতে পারে।"

অপর একজন মুসলিম-বিদ্বেষী লেখক হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম ম্যুর! মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ তাঁর "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেই ম্যুর সাহেব তার "দি ক্যালিফেট : ইটস রাইজ ডিক্লাইন এণ্ড ফল" {জঈন এন জঈন কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ লন্ডন, ১৮৮৩} নামক বিখ্যাত এবং বিরাটকায় গ্রন্থে প্রসঙ্গটি উল্লেখ পর্যন্তও করেননি। হযরত ওমর (রা.) আলেকজানদ্রিয়ার গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দিয়ে থাকলে তাঁকে তুলাধুনা করার অমন একটি সুবর্ণ সুযোগ তিনি নিশ্চয়ই হাতছাড়া করতেন না। কারণ তিনি তাঁর "লাইফ অব ম্যাহোমেট"{লন্ডন, ১৮৫৮} নামক অপর একখানি গ্রন্থে কুরআনের আসমানি কিতাব হওয়ার প্রামান্যতায় ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে খোদ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পর্যন্ত প্রতারক বলে গালি দিতে ছাড়েননি। তাহলে গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেয়ার ঐ গালগল্পটি চালু হল কোথা থেকে? বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট লেখক এম এন রায় {মানবেন্দ্র নাথ রায়}তাঁর "দি হিষ্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম" {অধ্যাপক আবুল হাই কর্তৃক ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান নামে বাংলায় অনুবাদিত, তৃতীয়

সংস্করণ, ষ্টুডেন্ট ওয়েব, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৯} নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন যে, মুসলমানদের আলেকজানদ্রিয়া গ্রন্থাগার জ্বালানোর কথিত ঘটনাটি ঘটেছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। অথচ তার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় চার পাঁচশো বছর পর একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে খৃষ্টানদের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থে। সেখানে ঘটনার যে ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষমূলক বিবরণ আছে তাতে নিরপেক্ষ পাঠকের মনে অতি সহজেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মিশর বিজয়ের অব্যাবহিত পর তৎকালীন মিশরের দুইজন বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক এলমাসিন ও ইউসটিসিয়াস যে ইতিহাস রচনা করেন সেখানে ঐ ঘটনার কোনও উল্লেখ মাত্রও নেই। জনাব রায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, সদ্য মুসলিম শাসনাধীনে আসা কায়রো গ্রন্থাগারে তখন লক্ষাধিক বই ছিল। আর করডোভা গ্রন্থাগারে ছিল তার ছয় গুণ। সেইসব বই না পুড়িয়ে মুসলমানগণ কেবল আলেকজানদ্রিয়ার বইগুলি পুড়িয়ে ফেলল, একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। এই পটভূমিকা দিয়ে তিনি বলেছেন, "বাইজানটাইন বর্বরতা টলেমিদের প্রশংসনীয় কীর্তি ধ্বংস করেছিল। সেন্ট সিরিল, যিনি হাইপেরিগার বিখ্যাত মেলায় বাগদেবিকে কলংকিত করেছিলেন, আলেকজানদ্রিয়ার গ্রন্থাগারের ধ্বংস সাধিত হয়েছিল তাঁরই হাতে। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই এই ঘটনা ঘটে। যখন ধর্মান্ধ খৃষ্টান ছাড়া আর কেউই প্রধান বিশপের আন্তরিক অথচ অবোধ্য ধর্মোপদেশ শুনতে যেত না, তখন একজন ম্লেচ্ছ অখৃষ্টান যুবতী নারী দার্শনিক বক্তৃতা ও গানিতিক আলোচনার অনুষ্ঠান করবে, সাধু সিরিলের তা সহ্য হল না। বুদ্ধিগত ক্ষমতা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরতরে বিনাশ করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁরই প্ররোচনায় ধর্মোন্মত্ত পাদরিদের নেতৃত্বে পরিচালিত এক দল ধর্মান্ধ বিদ্রোহী আলেকজান্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ আক্রমণ করল। আর ধর্মের নামে এমন অসহনীয় অত্যাচার করল, যা লিপিবদ্ধ করা যেমন অত্যন্ত বেদনাদায়ক, স্মরণ করাও তেমনি লজ্জাকর।" {৭৮-৭৯ পৃ.}।

যে ঘটনা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত মুসলমানদের উজ্জ্বল মুখে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে, এই হচ্ছে সেই ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সম্ভবত লক্ষ করে থাকবেন যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনও মুসলিম লেখক বা ঐতিহাসিকের রচনার সাহায্য

www.maktabatulabrar.com

গ্রহণ করিনি। অমুসলিম লেখক-ঐতিহাসিকগণই খৃষ্টীয় এবং বিদ্যাসাগরীয় ষড়যন্ত্রের জাল সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।" (কাজির দরবার, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ বাংলা)

এই ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারে রয়েছে বহু বিষয়ের উপর লিখিত গ্রন্থাদি। যার মধ্যে রয়েছে হাদীছ, তাফসীর, ফেকাহ, সাহিত্য, ইসলামী ইতিহাস, তাসাওউফ, মুসলিম মনীষীগণের জীবনী প্রভৃতি বহু বিষয় ও শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভংগীর চশমায় এ বিষয়টিকে দেখলেও বিভিন্ন চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে। বিভিন্ন চশমা চোখে এঁটে আমি যা দেখলাম তার সারকথা হল যে বিষয়টা যার দর্শন ও মতবাদ-বিরোধী তার কাছেই সেটা অযৌক্তিক ও অসহনীয়। যেমন ধরুন আমাদের দেশে ইতিহাস সমিতি নামে একটি সমিতি আছে, যারা ইসলামের ইতিহাসকে দু'চোখে দেখতে পায় না। তাদের কাছে জাতীয় অর্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারে এত বিপুল পরিমাণ ইসলামী ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ করা নিতান্তই অনর্থক ও ফালতু কাজ হিসাবে গণ্য। এই সমিতির চশমা চোখে আঁটলে মনে হয় ইসলামের ইতিহাস নামে আলাদা কোন ইতিহাস রাখার প্রয়োজন নেই। এই ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া যায়। ঠিক সেক্যুলারিজমের চশমার মতই এ চশমার দর্শন। এই ইতিহাস সমিতির নেতৃবৃন্দ বলতেও চান যে, ইতিহাস হল একটি সেক্যুলার বিষয়। তাই কোন ধর্মগোষ্টিকে কেন্দ্র করে ইতিহাস চর্চা করা উচিত নয়। পাঠকবৃন্দের মধ্যে যারা দৈনিক পত্রিকা পাঠ করে থাকেন, তাদের অনেকের হয়ত মনেও থাকবে ১৯৯৪ ইং সনের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এই ইতিহাস সমিতি এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সম্মেলন শেষে সেই সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের যেসব বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছুটা ছিল নিম্নরূপ–

১. ইতিহাস একটি সেক্যুলার বিষয়। কোন ধর্মগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ইতিহাস চর্চা করা উচিত নয়।
২. ইসলামের ইতিহাস নামে কোন ইতিহাস পৃথিবীর কোন দেশে নেই। এটি স্বতন্ত্র কোন বিষয় নয়।
৩. বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের সিলেবাস ত্রুটিপূর্ণ।
৪. ইতিহাস দুই ভাগ করা উচিত নয়। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। ইত্যাদি।

মনে হয় ইতিহাস সমিতির নেতৃবৃন্দ সেক্যুলারিজমের চশমা চোখে এঁটেছেন। এই সেক্যুলারিজমের চশমা চোখে আঁটলে শুধু ইসলামী ইতিহাস নয় ইসলামের যাবতীয় বিষয়কেই সাম্প্রদায়িকতা মনে হবে। একবার একটি দৈনিকে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনৈক সেক্যুলার নেতার মন্তব্য প্রকাশিতও হয়েছিল যে, এ হল সাম্প্রদায়িকতার আখড়া। এই চশমা চোখে এঁটে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার দেখলে মনে হবে গোটা গ্রন্থাগারের সমস্ত সেল্‌ফ সাম্প্রদায়িকতার বেসাতি দিয়ে বোঝাই করে রাখা হয়েছে। কারণ, হেন কোন সেল্‌ফ নেই যেখানে কোন না কোনভাবে কোন ইসলামী ব্যাক্তিত্ব বা ইসলামী কোন শাস্ত্র বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস নেই। জানি না হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্মের ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা না হলে ইসলাম ধর্মের ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা কেন হয়। এরূপ দেখা বোধ হয় সেক্যুলার চশমার জন্মদোষ। ইসলামী ইতিহাসকে বাদ দিয়ে যে অন্য কোন ইতিহাস হতে পারে না তা বোধ হয় একটুও তারা তলিয়ে দেখেন না। পৃথিবীর আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) থেকেই তো ইতিহাসের যাত্রা। তিনি ছিলেন ইসলামপন্থী। অতএব বলা যায় ইসলামী ইতিহাস দিয়েই শুরু হয়েছে ইতিহাসের যাত্রা। তাই ইসলামী ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন ইতিহাস হতে পারে না। তা হলে তা হবে বিল্ডিংয়ের ভিতকে উপেক্ষা করে উপর দিকে ইমারতকে আগে বাড়ানোর মত বোকামি।

এরপর যদি আপনি মওদূদী বাদের চশমা দিয়ে গ্রন্থাগারটিকে দেখতে চান, তাহলে দেখবেন এ গ্রন্থাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই পুরানো বস্তাপচা ও ভুল জ্ঞানের সমাহার। কারণ এ চশমার আবিষ্কারক মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিতে তার পূর্বে কেউ কুরআন হাদীছকে সঠিকভাবে অনুধাবনই করতে পারেনি। তার দৃষ্টিতে ইসলামের চার ভাগের তিন ভাগই অন্য কেউ বুঝতে সক্ষম হয়নি। এ সম্পর্কে পূর্বে এক স্থানে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়ে। তার এ চশমা চোখে আঁটলে মনে হয় ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। আর ইবাদত-বন্দেগী যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি হল ট্রেনিং কোর্স। এগুলো মৌলিক কোন ইবাদত নয়। অতএব তার পূর্বে সাড়ে তেরশত/চৌদ্দশত বৎসর যাবত উলামায়ে কেরাম এগুলোকেই ইসলামের মূল স্পিরিট মনে করে কুরআন-হাদীছের যে

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন এবং তার ভিত্তিতে যে তাফসীর, হাদীছের শরাহ, ফেকাহ ও ইসলামী আইনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে তা মৌলিকভাবেই অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তাই সেগুলো প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আর সুফিয়ায়ে কেরাম যে তাসাওউফ শাস্ত্র রচনা করেছেন, তার দ্বারা ইসলামী জেহাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জেহাদী স্পিরিট একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই তাসাওউফ দিয়ে জনগণকে যেন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তাই এই তাসাওউফ শাস্ত্র হল হলাহল, তীব্রবিষ। অথচ এই গ্রন্থাগারে তাসাওউফ সংক্রান্ত বহু গ্রন্থও বিদ্যমান। তাহলে কেন এরূপ গ্রন্থাগারকে সহ্য করা হবে? মনে হবে একমাত্র মওদূদী সাহেব ও তার চিন্তাধারার অনুসারী মনীষীদের রচিত গ্রন্থাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ হলেই এ গ্রন্থাগারটি কেবল জাতে উঠতে সক্ষম হত। এবং তখনই এটি হয়ে উঠত সত্যিকার অর্থে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার।

এভাবে এক এক মতবাদের চশমা চোখে আঁটলে গ্রন্থাগারটিকে এক এক রকম মনে হবে। যার চশমার রং যেমন তিনি এটিকে দেখবেনও তেমন।

সবশেষে যদি নির্ভেজাল নির্মল ইসলামী চশমায় এটিকে দেখেন, তাহলে মনে হবে এটি জ্ঞান চর্চার এক মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠান। জ্ঞান সাধকদের সুবিধার্থে এখানে থাকতে পারে নানান মতবাদের গ্রন্থ। তবে গ্রন্থাগারটি সাধারণ গণমানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকায় এখানে বাতিলপন্থীদের কোন গ্রন্থ বা সাধারণের ধারণ ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত এমন কোন গ্রন্থ রাখা সমীচীন নয় যা সাধারণ মানুষের গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। জ্ঞান চর্চার সুবিধের জন্য এমন গ্রন্থাদি রাখা হলেও তা পাঠের ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই, যাতে বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত তা অন্যের নাগালের বাইরে থাকে।

মন্দির দর্শন

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম ও তৎসংশ্লিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার দর্শনের পর এবার অন্য এক ধর্মের প্রতিষ্ঠান দেখতে ইচ্ছে হল। প্রথমে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মন্দির

দর্শনের ইচ্ছে মনে জাগ্রত হল। জাতীয় মসজিদের মত জাতীয় মন্দির বলে কোন মন্দির আছে তা শুনিনি। তবে ঢাকার মন্দিরসমূহের মধ্যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের একটা খ্যাতি আছে বলে সেই মন্দিরটাই দর্শনের মনস্থ করলাম।

বায়তুল মুকাররম মার্কেটের পশ্চিম পাশ থেকে ভাড়া ঠিকঠাক করে নিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে একটা রিক্সায় চড়ে বসলাম। পূর্বে লক্ষ করিনি, রিক্সায় চড়তেই সামনে তাকিয়ে দেখি দীর্ঘ জ্যাম। মনে মনে নিজের বেখেয়ালীপনার প্রতি তিরস্কার জাগল, কেন পূর্বে লক্ষ করে নিলাম না। এখন অহেতুকই রিক্সায় বসে কালক্ষেপন করতে হবে! এ ব্যাপারে একটু উস্কুখুস্কু প্রকাশ করতেই রিক্সাওয়ালা বুঝতে পেরে জানাল পল্টনের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের কারণেই এই জ্যামটা লেগেছে। সহসা ছেড়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ সে জ্যাম ছাড়ছিল না। তার মধ্য দিয়েই রিক্সা/গাড়িওয়ালারা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে একটা রিক্সা/গাড়ির সঙ্গে আর একটা রিক্সা/গাড়ির খাপাখাপি বাড়ছেই। সুই পরিমাণ জায়গা সামনে থাকলেও সেটা কেউ খালি রাখছে না। ভাবখানা এমন– যেন সামনে আঙ্গুল ঢোকানোর মত জায়গা খালি দেখলে সেখান দিয়ে বড়সড় পা ঢুকিয়ে দেয়ার কসরৎ চলছে। এমন খাপাখাপি হতে গিয়ে একটা রিক্সার সঙ্গে আর একটার লাগালাগি ও ধাক্কা-গুঁতানীও হয়ে যাচ্ছে। আর তা হলেই যে রিক্সা ধাক্কা গুঁতা খাচ্ছে সেই রিক্সাওয়ালার মুখ থেকে বের হচ্ছে নানান সাইজ করা বুলি বচন। এই অমুকের বাচ্চা, এই তমুকজাদা, এই অমুকীর পোলা! তোর ইয়েরে ইয়ে করি– ইত্যাদি কত রকমফের বুলিবচন ও গালি, তা ঢাকা শহরে রিক্সায় আরোহণ করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা খুব ভালভাবেই অবগত আছেন। ঢাকা শহরে কিছুদিন রিক্সা ও মিনিবাসে যাতায়াত করলে বচন-শাস্ত্রে অটোমেটিক ডক্টরেট হয়ে যায়।

যাহোক, একসময় জ্যাম ছাড়ল। রিক্সাটি পল্টনের মোড় পার হয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে হাইকোর্ট মাজারের মোড় হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ঢুকল। জাতীয় শহীদ মীনার ও সলীমুল্লাহ হলের সম্মুখ দিয়ে সামনে এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। ঢাকেশ্বরী রোডে এসে পড়েছি। বাঁ দিকে মোড় নিতেই বাঁ হাতে পলাশী ব্যারাক ফায়ার সার্ভিস। আর একটু সামনে এগিয়ে আবার বাঁ দিকে মোড় নিল। এটি অরফ্যানেজ রোড। একটু সামনে অগ্রসর হয়েই রিক্সাওয়ালা জানাল হুজুর! ঢাকেশ্বরী

www.maktabatulabrar.com

মন্দির আইসা গ্যাছি। অরফ্যানেজ মেইন রোড থেকে সরু গলি দিয়ে একটু ভিতরে গিয়ে মন্দিরের সদর গেট। গেটে সাইনবোর্ডে লেখা আছে ঢাকেশ্বরী মন্দির, ১০ অরফ্যানেজ রোড, লালবাগ, ঢাকা।

বিশাল এলাকা জুড়ে মন্দিরটা অবস্থিত। প্রকৃত মন্দির দুই ভাগে বিভক্ত। এগুলোর ছাদ বাঙালি চৌচালা। যেন একটার পর একটা চৌচাল ছোট হয়ে হয়ে চূড়ায় পরিণত হয়েছে। মধ্যভাগে তিনটা গম্বুজ ও একটা বারান্দা বিশিষ্ট প্রধান মন্দির। অনেকটা শেষ মোগল যুগের মসজিদের আদলে নির্মিত। নির্মাণ-পদ্ধতিতে এই মোগল স্থাপত্যের ছাপ প্রমাণ করছে যে, এটা খুব বেশি পুরাতন নয়। অতএব বল্লালসেনের সময়ে এটা নির্মিত বলে যে জনশ্রুতি আছে তা ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় মন্দিরটা আনুমানিক ১৭ শতকে নির্মিত। প্রধান মন্দিরের ফটকটা ১৯ শতকের। (তথ্যসূত্র: বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড)

মন্দিরে নানান রং বেরংয়ের মূর্তি দেখলাম। দেখলাম দুর্গা দেবী ও গণেশের মূর্তি। দেখলাম ছোটখাট আরও অনেকগুলো মূর্তি। সব মূর্তিই চকচকা রংয়ে সাজানো। দেখলে মনে হয় একেবারে সজীব, সচল ও হাস্যোন্মুখ। আগন্তুক দর্শকের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার জন্য যেন তারা আকুলি-বিকুলি করছে। অনেকটার সামনে মিষ্টি-মিঠাই সাজিয়ে রাখা আছে, যেন তারা ওগুলো তুলে খাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আমার চোখে যে মৌলবীয়ানা চশমা লাগানো ছিল, ভাবলাম প্রথমে এটা দিয়েই একটু দেখা যাক মূর্তিগুলোর প্রকৃত অবস্থা কি। মূর্তিগুলোর এই তাকিয়ে থাকার বিষয়টা দেখতে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সূরা আ'রাফ-এর ১৯৮ নং আয়াত–

وَ تَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ.

অর্থাৎ, "তুমি তাদেরকে দেখবে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পায় না।" ওদের দেখার ক্ষমতাটুকুও নেই। ওরা খুবই অক্ষম। শুধু কি দেখার ক্ষমতাই না থাকা? শুধু কি দেখতে পারারই অক্ষমতা? সামনের মিষ্টি-মিঠাই দেখে মনে হল ওগুলো তুলে খাওয়া তো দূরের কথা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম প্রাণী-মাছিও যদি তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবুও তা ঠেকানোর ক্ষমতা ওদের নেই। চোখের সামনে ভেসে উঠল সূরা হজ্জ-এর ৭৩ নং আয়াত–

وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ.

অর্থাৎ, "আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা সেটাও উদ্ধার করতে পারবে না। এই মূর্তিগুলোও অক্ষম, তাদের যারা পূজা করে তারাও অক্ষম।"

শুধু কি খাদ্য-খাবার ঠেকানোর ব্যাপারে অক্ষম? তাদের সত্তাকেও তো তারা রক্ষা করতে অক্ষম। সূরা আরাফ-এর ১৯৭ নং আয়াতটি চোখের সামনে ভেসে উঠল–

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ.

অর্থাৎ, "তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয় এমনকি নিজেদেরকেও না।"

চোখের সামনে ভেসে উঠল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনী। তিনি কুড়াল দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের পূজাঘরের সবগুলো মূর্তি ভেঙ্গে অবশেষে বড়টার কাধে সে কুড়ালটি ঝুলিয়ে রেখে হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, ওরা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে সক্ষম নয়। ওরা যদি এতই অক্ষম, তাহলে এক একটা মূর্তির এতগুলো হাত পা, এক দুর্গা দেবীরই আট খানা হাত। কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে সুদর্শন চক্র, কারও হাতে মুদগর, কারও হাতে গদা, কারও হাতে বল্লম, তীর ধনুক এগুলো সবই কি ফাঁকি? আসলেই তাই। ওরা দেখতে সব দিক থেকে ফিঠফাট, কিন্তু ভিতরে সদরঘাট। এর রহস্য তো ওদের নির্মাণের মধ্যেই লুকায়িত। বাইরে রং বেরংয়ে সাজিয়ে রাখা হলেও ভিতরে তো খড়কুটা আর বাশ কঞ্চি দিয়ে কাঠামো বানানো। তাই অক্ষম না হয়ে উপায় কী? এমন অক্ষমদেরকে অন্তরে লালন করে, তাদেরকে অর্ঘ নিবেদন করে, তাদেরকে পূজা দিয়ে কী হবে? কবি তাই বলেছেন,

মুগ্ধ ওকে সপ্নঘুরে!
যদি প্রাণের আসনকোণে,
ধুলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে,

www.maktabatulabrar.com

চিরদিনের প্রভূ তবে
তোদের মনে বিফল হবে,
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কতনা যুগ যুগান্তরে।

আমার হালের চশমায় ভুল দেখা হল না তো? তাহলে এবার একটু পৌরাণিক ইতিহাসের চশমায় ওদের অবস্থা দেখতে চাই, আসলেই কি ওরা সক্ষম না অক্ষম। পৌরাণিক ইতিহাস হিন্দুদের নিকট তাদের দেবদেবীদের প্রামাণ্য ইতিহাস। এ ইতিহাস যা বলবে তা হিন্দুগণও অস্বীকার করতে পারবেন না।

প্রথমেই শুরু করা যাক হিন্দুদের প্রধান তিনজন ভগবান– ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের ইতিহাস দিয়ে। এর মধ্যে ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মা চতুর্ভূজ (চার হাত বিশিষ্ট), চতুরানন (চার মুখ [ও চার মস্তক] বিশিষ্ট) এবং রক্তবর্ণ। পৌরাণিক ইতিহাসে বলা হয়েছে প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল; কিন্তু ব্রহ্মা একবার অপর ভগবান সংহারকর্তা-মহাদেবকে তাচ্ছিল্য করে অসম্মানসূচক কথা বলেছিলেন বলে মহাদেব ক্রোধান্বিত হয়ে ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তন করে ফেলেন। অপর এক বর্ণনায় মহাদেবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার মস্তক ভষ্মিভূত হয়ে যায়। সেই হতে ব্রহ্মা চতুরানন বা চার মুখ বিশিষ্ট। (পৌরাণিক অভিধান) এখন ভেবে দেখার বিষয় হল– ব্রহ্মা একজন প্রধান ভগবান হয়েও নিজের মস্তক পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি, তাহলে এমন অকম্মার ধাড়িকে অক্ষম না বলে আর কী বলা যায়? এর প্রতিশোধ না নিতে পারার ক্ষোভে তার আত্মহত্যা কিংবা সৃষ্টিকর্তার পদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত ছিল বৈ কি।

দ্বিতীয় প্রধান ভগবান হলেন বিষ্ণু। হিন্দুদের ধারণা মতে ইনি পালনকর্তা। এই বিষ্ণুর একটা কাহিনী শুনুন। কাহিনীর শুরুতে একটু ভূমিকা দিতে হয়। হিন্দুদের একজন দেবতা হলেন গণেশ। তিনি হলেন শিব (মহাদেব) ও পার্বতীর পুত্র। গণেশের খর্বাকৃতি দেহ, তিনটা চোখ, চারখানা হাত এবং হাতির মত শুড়বিশিষ্ট মাথা। এই হস্তি মাথা হওয়ার একটা কাহিনী রয়েছে। মহাদেবের স্ত্রী পার্বতীর বিবাহের বহু বছর পরও কোন সন্তান হচ্ছিল না। এজন্য পার্বতী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু প্রীত হয়ে পার্বতীকে পুত্রলাভের বর দেন। যথা সময়ে

পার্বতীর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। নাম তার গণেশ। দেবতারা স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান থেকে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনি দেবতাও উপস্থিত হন। শনি দেবতা হলেন এমন যে, তিনি যার দিকে দৃষ্টি দেন তারই বিনাশ হয়। এখানেও তাই হল। তিনি যখন এই সদ্যজাত পুত্র গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তৎক্ষণাৎ নবজাতকের মুণ্ডু দেহচ্যুত হয়ে গেল। এই সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তি দেখে তার মস্তক কেটে নিয়ে আসলেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। আর গণেশ যাতে এ জন্য সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেজন্য দেবতারা নিয়ম করে দিলেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না হলে তার কেউই কোন পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্যে ও পিতৃকার্যেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন। এই হল কাহিনী। এখন প্রশ্ন হল সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তাসহ তাবৎ দেব-দেবী মিলেও কি শনির শ্যেন দৃষ্টি থেকে গণেশকে রক্ষা করতে পারলেন না? আর যদি তাদের আগমনের পূর্বেই এই অকাণ্ডটা ঘটে গিয়ে থাকবে, তাহলে একটা হাতির মাথা কেটে না নিয়ে একটা মনুষ্য মাথা কি তারা সৃষ্টি করে দিতে পারলেন না? বিষ্ণু বর দিয়ে যে পুত্রকে জন্ম দিলেন, তার এই দুরবস্থা ঘটানোর জন্য তিনি কি শনি থেকে কোন প্রতিশোধও নিতে পারলেন না? এমন অক্ষম প্রমাণিত হওয়ার পরও তিনি কীভাবে শ্রেষ্ঠ তিন দেবতার একজন হিসাবে স্বীকৃতি নিয়ে বহাল থাকলেন?

আসলে তিনি অন্যকে কি রক্ষা করবেন, তিনি তো নিজেকেও রক্ষা করতে সক্ষম প্রমাণিত হননি। একটা ঘটনা শুনুন। ভগবান বিষ্ণু একবার শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলশীর সঙ্গে ব্যভিচার করেন। ফলে তুলশীর অভিশাপে ভগবান বিষ্ণু গোলাকার পাথরে পরিণত হয়ে যান। এবং শালগ্রাম নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়েছে 'শালগ্রাম শীলা।' হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ যে 'শালগ্রাম' শিলারূপী গোল পাথরের পূজা করে থাকেন, তার ইতিহাস এই। যাহোক বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ার পর দেবতাদের ভয়ে তুলশী দেবী গাছ হয়ে ঐ শীলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে দেবতাগণ সবই জানতে পারেন এবং ঘোষণা করেন যে, প্রত্যহ পূজার সময় এই শীলার বুকে এবং পৃষ্ঠে তুলশী পাতা

www.maktabatulabrar.com

সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পূজা সিদ্ধ হবে না। (স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ডম, ৪৪৪১ পৃ. ১-১৬ শ্লোক)। এখানে ভগবান হয়ে কিভাবে ব্যভিচার করলেন সে বিষয়টা আপাতত বাদ দিয়ে শুধু এতটুকু বিষয়ই দেখতে চাই যে, শঙ্খচুড় ছিল একজন দৈত্য, কোন দেবতা বা বড়সড় ভগবানদের কেউ নয়। তার স্ত্রী সামান্য একজন রমণী। তার অভিশাপে এতবড় একজন ভগবান বিষ্ণু পাথরে পরিণত হয়ে গেলেন? ভগবান হয়ে একজন মানবীর অভিশাপ প্রতিরোধ করতে পারলেন না, তাহলে কোন্ মুখে তিনি তারপরও ভগবান হয়ে টিকে থাকেন, তারপরও যেন তেন নয় একজন বড় মাপের ভগবান হয়ে?

এ ঘটনায় শুধু বিষ্ণুরই অক্ষমতা নয় বরং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণনামতে সব দেবতাই অক্ষম প্রমাণিত হন। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনামতে শঙ্খচুড় ছিল একজন দৈত্য। তপস্যা বলে ব্রহ্মার কাছ থেকে এক কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হয়। সে দেবতাদের রাজ্য দখল করে নেয়। দেবতারা অধিকার থেকে চ্যুত হয়ে প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মা ও শিবের সংগে বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু বললেন শঙ্খচুড় ঐ কবচ ধারণ করে অজেয়, সেই কবচ তার কণ্ঠে থাকতে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। আর ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছিলেন যে, তার স্ত্রীর সতিত্ব নষ্ট না হলে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। এরপর শিব (মহাদেব) তার কাছে গিয়ে স্তোকবাক্যে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। সে তাতে রাজী হল না। অবশেষে তার সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ বাঁধল। যুদ্ধের সময় বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলশীর কাছে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করলেন। (পৌরাণিক অভিধান) এখানে লক্ষ করার বিষয় হল– মহাদেব সংহারকর্তা হয়েও শঙ্খচুড়কে কিছুই করতে পারলেন না বরং তার কাছে গিয়ে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তৈলমর্দন করলেন। স্তোকবাক্যে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধকে তৈলমর্দন ছাড়া আর কী বলা যায়? আর শুধু সে কেন, সামান্য একজন দৈত্য শঙ্খচুড়কে পরাজিত করতে তাবৎ ভগবান দেবতাদের যুদ্ধে নামতে হল? তাতেও পারলেন না, আর অন্য কোনও উপায় দেবতাগণ খুজে পেলেন না, অবশেষে তার স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করা বৈ গত্যন্তর থাকল না? সব ভগবান দেবতা মিলে এমন চরম ব্যর্থতার লজ্জা কোথায় লুকালেন?

এরপর তৃতীয় ভবগান শিব-এর ইতিহাসে আসা যাক। শিব-এর আরও অনেক নাম রয়েছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ আর একটি নাম হল মহাদেব। মহাদেব হলেন সংহারকর্তা। হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ যে শিব লিঙ্গের পূজা করে থাকেন, তার ইতিহাস এরূপ- ঋষী পত্নীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঋষীগণ অভিশাপ দিয়েছেন বলেই মহাদেবের লিঙ্গপাত হয়েছিল (দেবী ভাগবত, নবম স্কন্দ, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)। এখান থেকেই লিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয়। তাছাড়া বাণলিঙ্গ (উভয় লিঙ্গের যুক্ত অবস্থা) পূজার কাহিনী নিম্নরূপ- এক সময় ভগবান মহাদেব যখন তার পত্নী পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন, তখন মহাদেবের প্রমত্ত যৌন উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে থাকেন। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করত পার্বতীর প্রাণ রক্ষা করেন এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা লিঙ্গের সেই অবস্থা ও স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রবর্তন হয় এই বাণলিঙ্গ পূজার। (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম) এ হল হিন্দুদের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভগবান সংহারকর্তা মহাদেবের কাহিনী। এখানে ভেবে দেখার বিষয় হল- ঋষীগণ হলেন দেবতাদের আরাধনাকারী সংসারত্যাগী গোছের কিছু মানুষ। তাদের অভিশাপে দোর্দণ্ড ক্ষমতার অধিকারী মহাদেবের যদি অস্ত্র খসে পড়ে, নিজের অস্ত্রটা পর্যন্ত যদি তিনি রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে তাকে কীভাবে এমন মহা ক্ষমতাধর বলে অবলিলায় মেনে নেয়া যায়? তিনি যদি এমনই ক্ষমতাধর হয়ে থাকবেন, তাহলে তার লিঙ্গ খসানো ঐ অভিশাপকারী ঋষীদেরকে তিনি কি আস্ত ছেড়ে দিতেন?

এ গেল হিন্দুদের প্রধান তিনজন ভগবান- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের অক্ষমতার চিত্র। তাহলে বাদবাকী ছোটখাট দেবতাদের ইতিহাস দেখে আর কী হবে? তাদের অবস্থাও তথৈবচ। রুই কাতলারাই যেখানে ধরাশায়ী, সেখানে চুনোপুটিদের খবর নিয়ে আর কী লাভ? আর দেবতাগণ যেসব মনীষীর মধ্যে অবতারিত হন সেই অবতারদের ব্যাপারও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। আর তা হবেই বা কীরূপে? দেবতাগণ যখন স্বয়ং আপন সত্তায় বিরাজমান থাকেন, তখনই যদি অক্ষম থাকেন, তাহলে অন্যের সত্তায় দ্রবীভূত হয়ে গেলে তাদের অবস্থার তো আরও খারাপ দশা হওয়াই স্বাভাবিক।

www.maktabatulabrar.com

হিন্দুদের ধারণায় ভগবান অবতারদের মধ্যে আবির্ভূত হন অর্থাৎ, অবতারিত হন। উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণুর একজন প্রখ্যাত অবতার রামচন্দ্রের কথা বলা যায়। এই অবতার রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে লংকার রাজা রাবন হরণ করে নিয়ে যায়। রাবন কর্তৃক স্ত্রী হরণ হওয়ার পর রামচন্দ্র দীর্ঘদিন তার প্রেমে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকেন। কিন্তু কোনভাবেই স্ত্রীর সন্ধান লাভ করতে পারছিলেন না। অবশেষে স্ত্রীর সন্ধান পেলেন। কিন্তু সন্ধান পাওয়ার পরও রাবনের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার কোন ক্ষমতা তার ছিল না। কাহিনী অনেক দীর্ঘ। অবশেষে হনুমান প্রমুখের সাহায্য নিয়ে তিনি স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

এতক্ষণ পৌরাণিক ইতিহাসের চশমায় হিন্দুদের দেবদেবী ও অবতারদের ইতিহাস দেখছিলাম। এ ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও বালখিল্যতায় ভরা ইতিহাস। পাঠকবর্গের কৌতূহল অবশিষ্ট থাকতেই সংক্ষেপে বর্ণনা শেষ করে দিলাম।

এরপর চরিত্র বিজ্ঞানের চশমায় এই সব দেবদেবীর ইতিহাসকে যৎ কিঞ্চিত দেখতে চাই। চরিত্র বিজ্ঞানের চশমায় হিন্দুদের ভগবান, দেবদেবী ও অবতারদের ইতিহাস দেখতে যেয়ে তাদের যেসব নির্লজ্জ কাহিনীর চিত্র দৃষ্টির সামনে হাজির হল তাতে সেসব কাহিনীর হোতা সেই ভগবান ও দেবতা অবতারদের চরিত্রকে কী বলে আখ্যা দেয়া যায় তা নিয়ে বেশ বিপাকেই পড়া গেল। বিপাকে পড়তে হল এ জন্য যে, একদিকে সেসব কাহিনীর স্বরূপ আর চরিত্রহীনতার মাঝে পার্থক্য করা দায়, আবার একটা ধর্মগোষ্ঠির দেবতা অবতারদের ব্যাপার স্যাপারকে অবলিলায় লাম্পট্য আখ্যা দেয়াওবা কতখানি শালীনতা আখ্যা পাবে তা নিজেকে বেশ ভাবিত করে তুলছে। তাই যা দেখলাম সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে শুধু চিত্রটাই কিছুটা তুলে ধরলাম, আর মন্তব্যের ভার ছেড়ে দিলাম পাঠকবর্গের উপর।

পূর্বেই বর্ণনা করেছি হিন্দুদের প্রধান তিন ভগবানের একজন পালনকর্তা বিষ্ণু শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলশীর সঙ্গে ব্যভিচার করেন। যার ফলে তুলশীর অভিশাপে বিষ্ণুকে পাথরে পরিণত হতে হয়। তাদের প্রধান তিন ভগবানের আর একজন ধ্বংসকর্তা মহাদেব বা শিব ঋষী পত্নীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। যার কারণে ঋষীগণ অভিশাপ দেয়ায় মহাদেবের

লিঙ্গপাত হয়ে যায়। আর তিন ভগবানের অপর আর একজন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার একটি কাহিনী নিম্নরূপ– প্রজাপতি দক্ষের একশত পাঁচটি কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা-সতীর বিবাহ হয়েছিল শুলপানি (শিব/মহাদেব) এর সঙ্গে। ব্রহ্মা, বিষ্ণুসহ প্রায় সকল দেবতাই এই বিবাহ উপলক্ষে হাটকেশ্বর তীর্থে সমবেত হয়েছিলেন এবং দক্ষের অনুরোধে ব্রহ্মা বিবাহের পৌরহিত্য করেছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে বেদীতে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী সতীর প্রতি ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হলে চতুরানন (চারটি মুখ বিশিষ্ট) ব্রহ্মা সকলের অজ্ঞাতে সতীর সর্বশরীর দর্শন করেন। কিন্তু অবগুণ্ঠনের কারণে মুখমণ্ডল দর্শনে ব্যর্থ হন। কৌশলে কার্যোদ্ধারের জন্য তিনি যজ্ঞ-কুণ্ডে কাঁচা কাষ্ঠ নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে প্রচণ্ড ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বেদীর উপরে উপবিষ্ট সকলে ধোঁয়া থেকে চোখকে নিরাপদ করার জন্য চোখ বন্ধ করেন। বলাবাহুল্য– ব্রহ্মা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুযোগ বুঝে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করত তিনি সতীর মুখমণ্ডল দর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, সর্বাঙ্গ দর্শন করা থেকেই তিনি কামাতুর হয়ে পড়েছিলেন। এখন মুখমণ্ডল দর্শনে অবস্থা চরমে উপনীত হওয়ায় বীর্য স্খলিত হয়ে বেদীর উপর পতিত হয়। ব্রহ্মাও সঙ্গে সঙ্গে বালি দ্বারা বীর্যগুলো ঢেকে ফেলেন। কিন্তু বররূপী মহাদেবের দিব্য দৃষ্টির কাছে তা গোপন থাকে না। নিজের স্ত্রীর উপর ব্রহ্মার এই কামাতুর দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই মহাদেবকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তিনি অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। অবশেষে ব্রহ্মার ক্ষমা প্রার্থনায় ক্রোধ প্রশমিত হয়। তবে বীর্যকে তিনি ব্যর্থ হতে না দিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট বালিসমূহকে তিনি 'মুনিতে' পরিণত করেন। আর এমনিভাবে সহস্র মুনির উদ্ভব ঘটে এবং বালি থেকে উদ্ভূত বিধায় তাদের নাম রাখা হয় 'বালখিল্য মুনি'। (আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম: আবুল হোসেন ভট্টাচার্য)।

উপরোক্ত কাহিনীসমূহের ব্যাপারে চরিত্র বিজ্ঞানের চশমায় কী দেখা যেতে পারে বলুন। এরূপ কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পরের ক্ষেতে পয়মালী করা আর অন্যের লোভনীয় দ্রব্য দর্শনে নিম্নচাপ ছুটে যাওয়াকে চরিত্র বিজ্ঞান কি বলে আখ্যায়িত করে থাকে তা পাঠকবর্গ নিশ্চয় অবগত থাকবেন।

এ তো গেল হিন্দুদের প্রধান তিন ভগবানের চরিত্র। এছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর কাহিনীতেও এরূপ নষ্টি-ফষ্টি দেদারছে পাওয়া যায়। যেমন নমুনা স্বরূপ কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরছি–

www.maktabatulabrar.com

হিন্দু শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী (পদ্ম পুরাণ, ষষ্ঠ খণ্ড- ৬৯০ পৃ.) যে ব্যক্তি প্রত্যহ অহল্যা, দ্রুপদী, কুন্তি, তারা এবং মন্দোদরী– এই পঞ্চ কন্যাকে স্মরণ করে, তার মহাপাপ নাশ হয়ে থাকে। মহাপাপনাশিনী এই পঞ্চ কন্যার মধ্যে অহল্যা ও দ্রুপদীর মোটামুটি পরিচয় নিম্নরূপ–

অহল্যা হল গৌতম মুনির স্ত্রী। সদ্যস্নাতা এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে গৌতমশিষ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। আর্দ্র বস্ত্রের আবরণকে ভেদ করে উদ্দাম যৌবনা অহল্যার রূপলাবণ্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠায় ইন্দ্রদেবের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; তিনি গুরুপত্নী-অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন। ত্রিকালজ্ঞ গৌতম মুনির কাছে একথা অজ্ঞাত থাকে না; তার অভিশাপে অহল্যা প্রস্তরে পরিণত হন, আর ইন্দ্রদেবের সারা দেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটে। এটা দ্বাপর যুগের ঘটনা। সুদীর্ঘকাল পরে ত্রেতাযুগে ঈশ্বরের অবতার রূপে শ্রী রামচন্দ্র আবির্ভূত হন। তার পদস্পর্শে অহল্যার পাষাণত্ব অপনোদিত হয়। এখন কথা হল পথে ঘাটে এরূপ কোন নারীর রূপ লাবন্যে নিজেকে সামলাতে না পেরে তার সতীত্ব হরণ করাকে কী চরিত্র আখ্যা দেয়া যায়?

আর দ্রুপদী হল কুরু বংশীয় রাজা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র বিখ্যাত পঞ্চ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব– এই পাঁচ ভ্রাতার পত্নী। পাঁচ ভাইই একত্রে দ্রুপদীকে ইয়ে করতেন। এটা কোন সুস্থ চরিত্রের পুরুষ না করতে পারে আর না তা মেনে নিতে পারে?

এমনিভাবে হিন্দুদিগের দেবদেবী সম্পর্কে যৌন সুড়সুড়ি ও যৌনদুরাচারমূলক অশ্লীল ও নাটুকে বহু ঘটনাই পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত রয়েছে। চরিত্র বিজ্ঞানের আলোকে এগুলোকে কি বলে আখ্যায়িত করা যায় এবং সেই আখ্যা অনুসারে ঐসব দেবদেবীদেরকেই বা কি বলা যায়, তার মন্তব্যের ভার পূর্বেই পাঠকবর্গের উপর ছেড়ে দিয়েছি।

তবে হিন্দুবাদের চশমায় এগুলোকে কোন দোষণীয় ব্যাপার বলে দেখা যায় না। এই চশমা চোখে আঁটা মাত্রই মনে হল এসব হল দেব-দেবীদের লীলাখেলা। এর রহস্য বোঝার সামর্থ ভক্তদের কোথায়? তাই স্বর্গে গিয়েও দেবতারা যখন উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি নামের বেশ্যাদের দ্বারা মনোরঞ্জন করেন, তখনও তা দেবতাদের

লীলাখেলা বলেই আখ্যায়িত হয়। যদিও সব লীলাখেলাই এক নয় বা সবটাই প্রশংসার দাবি রাখে না। কুদরতের লীলাখেলা আর যৌন লীলাখেলা এক নয়। একটার দ্বারা জগতের উৎকর্ষ সাধিত হয় আর অন্যটার দ্বারা জগত রসাতলে যায়। সম্ভবত হিন্দুবাদের চশমায় এই পার্থক্যের বিষয়টা দেখা না যাওয়ার ফলেই এমন সব অশ্লীল কাণ্ড-কারখানাকেও লীলাখেলা হিসাবেই দেখা যায় এবং যার ফলে এগুলোকে চোখ কান বুজে ভক্তি সহকারে মেনে নেয়া সম্ভব হয়। আর এগুলো যেহেতু লীলাখেলা তাই লীলাখেলায় যে যত পারঙ্গম সে তত বড় দেবতা।

এসব অশ্লীল কাণ্ড-কারখানাকেও লীলাখেলা হিসেবে দেখার কারণেই তারা এগুলো ভাল কি মন্দ, শালীন কি অশালীন, যৌক্তিক কি অযৌক্তিক, এগুলোকে মেনে নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে মুখ দেখানো যাবে কি যাবে না এ নিয়ে তাদের কোন ভাবান্তর হয় না। তাই ভগবান ও দেবতাদের চরিত্র এমন কেন হবে এরূপ "কেন"-এর উত্তর জানার কোন প্রয়োজনও তারা বোধ করেন না। বরং কেন?-এরূপ প্রশ্নবোধও তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না। যেমন প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারত সতীর প্রতি যদি ব্রহ্মার এতই লোভ লেগে থাকবে, তাহলে তিনি ঐরূপ আর একটা সতী তৈরি করে তার দ্বারা মনস্কামনা পূর্ণ করে নিতে পারতেন। তিনি তো সৃষ্টিকর্তা। অন্যের স্ত্রী (সতী)-র প্রতি এতটা কামপ্রবণ হয়ে তিনি ভরা মজলিসে অমন ধরাটা কেন খেতে গেলেন? কিংবা প্রশ্ন হতে পারত মহাদেবের লিঙ্গচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরও তার পক্ষে বেচেঁ থাকা সম্ভব হল কী করে? তিনি পরমেশ্বর তাই নিজস্ব শক্তি বলে তার পক্ষে বেচেঁ থাকা সম্ভব– এমন ব্যাখ্যা দেয়ার তো অবকাশ নেই। কারণ তার যে শক্তি নেই তা তো তার নিজের লিঙ্গ রক্ষা করতে অপারগ হওয়া থেকেই অনুমিত হয়েছে। কিংবা প্রশ্ন দেখা দিতে পারত পূজা করলে মূল ভগবান শিবের পূজা করব, তার লিঙ্গের পূজা কেন করতে যাব? তাও আবার একটা অপরাধের স্মৃতি বহনকারী দেহ থেকে ছিন্ন হওয়া লিঙ্গের পূজা? ভগবান বিষ্ণুর পাপের স্মৃতি বহনকারী শালগ্রাম শীলার পূজার ক্ষেত্রেও এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারত। আবার একান্তই লিঙ্গের পূজা করতে হলেও সেটা পূজা করার সময় এমন অশ্লীল ভাষা কেন ব্যবহার করতে হবে? উল্লেখ্য- শিব লিঙ্গের পূজার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয়–

www.maktabatulabrar.com

ঐং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং
কামবাণান্বিত দেবং সংসার দহণক্ষমং
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম।

অর্থাৎ, লিঙ্গটি প্রমত্ত, শক্তি সংযুক্ত এবং বাণ নামে আখ্যায়িত (বাণলিঙ্গ) ও মহাপ্রভা সমন্বিত। এ দেব কামপরায়ণ, সংসার দহনে সক্ষম, শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিত এবং বাণ নামে আখ্যায়িত পরমেশ্বর।

এরূপ অনেক প্রশ্নই এ ধর্মের পদে পদে উঠতে পারত। যেমন পূজা করার সময় যেহেতু দেবদেবীদের সামনে দুধ, কলা, মিষ্টি মিঠাই ইত্যাদি অনেক নৈবেদ্য পেশ করা হয়, তাই প্রশ্ন উঠতে পারত নির্জীব মূর্তির সামনে এগুলো পেশ করা অবান্তর। তাই পূজার সময় মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে যজ্ঞানুষ্ঠানে মূর্তিকে আবাহন তথা আমন্ত্রণ জানাতে হয়। তারপর পাদ্য অর্ঘ্য-ভোগ-নৈবেদ্য প্রভৃতি নিবেদন করতে হয়, যাতে প্রাণহীন মূর্তিকে ওসব নিবেদন করা অর্থহীন না হয়ে যায়। আবার পূজার শেষে মূর্তিকে কিছুটা নাড়া দিয়ে বলতে হয় "গচ্ছ দেবী (অথবা দেবঃ) যথেচ্ছয়া"। অর্থাৎ, হে দেবী! তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান তার আবাহন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কী করে সম্ভব? তাছাড়া এতকাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেও কি কোন দিন সত্যিকারভাবে তাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে? তারা কি কোন দিন ঐ সব নৈবেদ্য প্রাণসম্পন্নের ন্যায় গ্রহণ করেছে? এভাবে ভগবানদের সত্তা ও কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে পূজা অর্চনার নিয়মনীতি সর্বত্রই শত প্রশ্নের অবতারণা হতে পারত। কিন্তু হিন্দুবাদের চশমা আঁটা লোকদের কোন দিন এসব প্রশ্ন দেখা দেয় না।

ভাবছিলাম হিন্দুবাদের চশমার ন্যায় এমন বিবেচনাহীন, অন্ধ ও মূর্খ চশমাও কেউ চোখে আঁটে নাকি, যে চশমা যৌনখেলা আর লীলাখেলার পার্থক্য বোঝে না? যে চশমা ভাল-মন্দ, শালীন-অশালীন, যৌক্তিক-অযৌক্তিক কোন কিছুর বিচার বিবেচনা করতে বোঝে না? কিন্তু ভাবতে ভাবতে মনে হল শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের চশমার দোষ দেয়া কেন? মুসলমানদের মধ্যেও তো এরূপ চশমাধারী একটা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। হিন্দুরা যেমন তাদের ভগবান ও দেব-দেবীদের অশ্লীল ও সুড়সুড়িমূলক কাণ্ড-কারখানাকে তাদের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দিচ্ছে, এক শ্রেণীর অন্ধভক্ত মুসলমানরাও তার চেয়ে কম যাচ্ছে না। এক শ্রেণীর

ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতারক ও ভণ্ড পীর, ফকীর, খাজাবাবা-দয়ালবাবাদের দরবারে যে নাচ-গান, ঢলাঢলি ও মাতামাতির মত আদিরসের সর্বনাশা খেলা চলছে, এমনকি মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম প্রভৃতিও যেখানে হরদম চলছে, সেগুলোকে একদল অন্ধভক্ত বাবাদের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আর ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাদের কাছে দুআ চাইছে, সম্পদ চাইছে, পকেট উজাড় করে তাদের কাছে ধন-সম্পদ ঢালছে। এমনকি বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে বহু নারী দেহদান পর্যন্ত করছে। আর এই পীর বাবারা আধ্যাত্মিক সাধনার নামে এইসব অপকীর্তি অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছে বা যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। "আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীত আল্লাহকে পাওয়া যাবে না", "আত্মশুদ্ধির জন্য গুরুর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে", "গুরু-ভক্তি বিনে মুক্তি নেই" ইত্যাকার দর্শন প্রচার করে তারা ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলছে।

পূর্বেও বলেছি, আবারও বলছি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইসলামী জীবন বিধানে জাহেরী ও বাহ্যিক হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন, যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা, হালাল উপায়ে উপার্জন করা, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, শরাব পান, যিনা ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন; তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান যেমন– ঈমান, ইখ্‌লাস, তাক্বওয়া, সবর, শুক্‌র, তাওয়াক্কুল, কানায়াত, ইতায়াত প্রভৃতি অর্জন এবং দুনিয়ার লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার প্রভৃতি চারিত্রিক ও আখলাকী দোষসমূহ বর্জন তথা আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে যে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হয় তারও তেমনি প্রয়োজন রয়েছে। এরই সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও হাতেনাতে প্রশিক্ষণের জন্য এমন একজন অভিজ্ঞ লোকের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য গ্রহণ করতে হয়; যিনি নিজে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন, এ সাধনায় উৎকর্ষ অর্জন করেছেন এবং যিনি অন্য মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ চিহ্নিত করে খোদা ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত পন্থায় সেগুলো সংশোধনের পথ নির্দেশ করতে সক্ষম। বলাবাহুল্য, এ অর্থে পীর-মুরীদীর ধারা চালু রয়েছে। দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং শিরক-বিদ্‌আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামের নব জাগরণ সৃষ্টির পিছনে এহেন পীর বুযর্গ তথা শায়খে তরীকতদের অবদান সর্বজনবিদিত। আফ্রিকার গহীন জংগলে, সাহারা, গোবিতে, সাইবেরিয়ার

www.maktabatulabrar.com

তুষারাবৃত অঞ্চলে, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপরাজ্যে, এমনকি আমাদের এই উপমহাদেশেও এদের দ্বারাই দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ সুমহান সিলসিলা আজও তার গতিতে চালু রয়েছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার নামে চুটিয়ে মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, নারী, উলঙ্গ নাচ, ঢলাঢলি মাতামাতি, গান-বাদ্যের আসর এগুলো কী? আল্লাহ কে পাওয়াই যদি উদ্দেশ্য হবে, তাহলে যারা আল্লাহ ও রসূলের বাণী কুরআন-হাদীছ পড়েছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন, কোন খাঁটি পীরের দরবারে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন; তাদের কাছে না গিয়ে এসব মূর্খ দয়ালবাবা খাজাবাবাদের কাছে যাওয়া হয় কেন? এসব লোকদের দরবার আখড়ায় যারা যান, কুরআন-কিতাব পড়ার খোশ কিসমত তাদের না হলেও আল্লাহর দেয়া বিবেক তো রয়েছে। তা দিয়ে তো বুঝা যায় যে, যেনা ব্যাভিচার করে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের মূর্খ সলিমদ্দী, কলিমদ্দীও অনায়াসে বলতে পারবে যে, বেগানা মেয়েলোকদের দিকে তাকানো নিষেধ, পর পুরুষের সঙ্গে যৌনাচার মহাপাপের কাজ। কাজেই "দেহ-মন, জীবন, যৌবন, গুরুর চরণে সব কর দান"– এই দর্শন যে বাবাগুরুরা পেশ করেন তারা যে নিতান্তই ভণ্ড তা কারও বুঝতে বেগ পাওয়ার তো কথা নয়? সামান্য বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরাও কখনও এগুলোকে অলি-আউলিয়াদের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দিতে পারে না। অতএব দুই দুই চারের মতই স্পষ্ট যে, নিজের খাহেশ, প্রবৃত্তির তাড়না আর যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্যই খাজাবাবারা এসব আখড়ায় আসর জমান ও তার চেলা-চামুণ্ডরা সেখানে কিলবিল করেন। আর গুরু ভক্তি, আধ্যাত্মিক সাধনা, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি কথাগুলো কপচানো হয় শুধু মাত্র নিজেদের অপকর্মগুলোকে ঢাকা দেয়ার জন্য।

এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর-ফকীর তাদের এসব কর্মকে বৈধতার লেবাস পরানোর চেষ্টাও করে থাকেন। তারা বলে থাকেন, কুরআন ত্রিশ পারা নয়, চল্লিশ পারা। তারা বলেন যে, দশ পারা আছে আমাদের কাছে, আর ত্রিশ পারা আছে মৌলবীদের কাছে ...। হাকীকত, গোপন তত্ত্ব ঐ দশ পারার মধ্যেই রয়েছে। মৌলবী সাহেবরা কেবল ঐ ত্রিশ পারা নিয়েই কচুরিপানার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। আসল ভেদ আমরাই পেয়েছি। তাদের বক্তব্য হল– ঐ দশ পারা লেখাজোখা নেই, ওগুলো সিনায় সিনায় চলে আসছে। তাদের সেই কল্পিত দশ পারার গুপ্ত ভেদগুলো বড়ই ঘৃণিত ও ন্যাক্কারজনক। তার মধ্যে

একটা ভেদের কথা নাকি নিম্নরূপ– মেয়েদের যৌনাঙ্গ একটা বয়ে যাওয়া নদীর মত (তাই তো তাদের ঋতুস্রাব হয়)। অতএব মরা, পঁচা, দুর্গন্ধময় কোন জিনিসও যদি নদীতে ফেলা হয়, তাহলে যেমন নদীর পানি নাপাক হয় না; ঠিক তেমনি পীর বাবাজীরাও কোন মুরিদ বা অন্যের স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত করলে তা নাপাক হবে না। কারণ, ওটা বহতা নদীর মত। তাদের কল্পিত দশ পারায় আরও একটা গোপন ভেদ নাকি আছে যা নিম্নরূপ– শরীরের কোন জায়গার নখ, চুল কাটা যাবে না, মাথায় চুলে বা দাড়িতে জটা হয় হোক, জটার অধিকারী হওয়া বরং সৌভাগ্যের বিষয়। তারা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে গিয়েছিলেন তখন কি তিনি ক্ষুর, চিরুনি, নাপিত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? তাহলে নখ, চুল কাটার বা চিরুনি দিয়ে চুল দাড়ি আচড়াবার কী দরকার? তারা বলেন, "আল্লাহর নবী যখন মেরাজ থেকে ফিরে এসে সাহাবীদের কাছে তা ব্যক্ত করেছিলেন তখন ক্ষুর, কাঁচির অভাবে তাঁর নখ, চুল বড় হয়ে গিয়েছিল; চিরুনি ব্যবহার না করায় তাঁর চুলে, দাড়িতে জটা বেঁধে গিয়েছিল।" কিন্তু আমরা বুঝি না রসূলের কোন সাহাবী তো এমন তথ্য বর্ণনা করেননি। আল্লাহ্‌র নবীর কোন কিছুই তো তাঁর সাহাবীরা গোপন রাখেননি। আর এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, চুল দাড়িতে জটা ধরে গেল, অথচ তার সাহাবীরা তা কেউ দেখতে পেলেন না; আর এই ভণ্ড ফকীররা সব দেখে ফেলল! তা ছাড়া আল্লাহর রসূল তো অতি অল্প সময়ের মধ্যে মে'রাজ থেকে ফিরে এসেছিলেন, অতএব মে'রাজে তার ক্ষুর কাঁচির কি প্রয়োজন ছিল তাও তো বুঝলাম না। আমরা জানি, আল্লাহ্‌র রসূল ঐ সময় কোন মেয়েলোক বা খাবার-দাবারও সঙ্গে নিয়ে যাননি। তাহলে ঐ ফকীরদের এসবও তো একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত। কিন্তু এ সবের বেলায় ফকীরদের তাল ঠিকই আছে। আর নারীর ব্যাপারে তারা যে দর্শন পেশ করলেন, সে হিসাবে পীর বাবাজীর স্ত্রীও তো অন্যের জন্য হালাল হওয়া উচিৎ। কিন্তু এ বেলায় দেখা যায় তাদের দাঁড়ি সাতাশ।

যাহোক হিন্দুদের মন্দির ও তার মূর্তি দর্শন থেকে কথা অনেক দূর এগিয়ে গেল। এ প্রসংগটা এখানেই শেষ করে এবার খ্রীষ্টধর্মের গির্জা দর্শনে যেতে চাই।

www.maktabatulabrar.com

শহীদ মীনার দর্শন

ঢাকেশ্বরী মন্দির দর্শন শেষে মনস্থ করলাম এবার একটা গির্জা দর্শনে যাওয়া যাক। হিন্দুধর্মের উপাশনালয় মন্দির দর্শনের পর খ্রীষ্টধর্মের উপাশনালয় গির্জা দর্শনে গেলে একটা নেতিবাচক সাদৃশ্য রক্ষা হবে বলে মনে হল। ঢাকায় যে সমস্ত বৃহৎ গির্জা রয়েছে তার মধ্যে ফার্মগেট এলাকার গির্জা একটা প্রধানতম গির্জা। এটা দর্শনে যাওয়াই স্থির করলাম।

এখান থেকে ফার্মগেট বেশ দূরে। এ পথে কোন বাস-রুটও নেই। তাই পথের দূরত্বের কথা ভেবে রিক্সা নয় বরং ট্যাক্সিক্যাব যোগেই যাওয়া মনস্থ করলাম। ভাড়ার হার কমের কথা চিন্তা করে হলুদ নয় বরং একটা কাল ট্যাক্সিক্যাব ঠিক করে উঠে পড়লাম। এখনকার সি, এন, জি ও টেক্সিক্যাবে ভাড়া নিয়ে দরকষাকষি করার ঝামেলা নেই, গন্তব্য শেষে যা মিটারে উঠবে তা দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আগে এই সুবিধেটা ছিল না। তবে তখন একটা সুবিধে ছিল। তা হল ঘর থেকে হিসাব করে টাকা নিয়ে বের হলে তা দিয়ে নিশ্চিতভাবে পরিকল্পিত স্থানসমূহ ঘুরে আসা যেত। হয়ত কোন কোন সময় বেবিট্যাক্সি ওয়ালাদের সঙ্গে কিছু দরকষাকষি করতে হত। এখন আর সেই দরকষাকষির ঝামেলা করতে হয় না। আগে অনেককে এই নিয়ে যে দেমাগ খারাবী, মুখ খারাবী করতে হত, এমনকি অনেককে শার্ট পাঞ্জাবীর হাতা গুটানীর পর্যায়েও উপনীত হতে দেখা যেত, এখন তা আর দেখা যায় না। মিটার সিস্টেম হওয়ায় এই সব অবাঞ্ছিত ঝামেলা দূর হয়ে বেশ সুবিধেই হয়েছে। তবে একটু অসুবিধেও আছে বৈকি। তা হল পকেটে সাধারণ হিসাবের চেয়ে টাকা বেশি না থাকলে মিটার সিস্টেম গাড়ীতে চড়া যায় না। কি জানি নিত্য যানজটের ঢাকা শহরে কোথায় কোন্ যানজটে আঁটকে পড়ে কতটুকু পথের ভাড়া কততে গিয়ে দাঁড়াবে! তাই পকেটে সাধারণ হিসাবের চেয়ে টাকার পরিমাণ বেশি না থাকলে মিটার সিস্টেম গাড়ীতে আরোহণ করার সাহস হয় না। এ হিসাবে মিটার সিস্টেম নির্ঝঞ্ঝাট হলেও একটু বড়লোকী সিস্টেমও বটে।

ট্যাক্সিক্যাবটি একটু পশ্চিম দিকে এগিয়ে ঢাকেশ্বরী রোড পার হয়ে ডানে মোড় নিল। ডান হাতে পলাশী ব্যারাক ফায়ার সার্ভিস। আর একটু সামনে এগিয়ে ডানে মোড় নিয়ে সলীমুল্লাহ হলের সম্মুখ দিয়ে সামনে এগিয়ে আবার বাঁ দিকে মোড় নিল। এখানে ডান দিকে শহীদ মীনার

দৃষ্টিগোচরে এল। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী একটি জাতীয় মর্যাদা প্রাপ্ত স্মৃতিস্তম্ভ। চলতি পথে হলেও এমন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে একটু চশমার বুলানি না দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা সফরের অপূর্ণতা রচনা করবে ভেবে একটু বিরতি নিলাম। অগত্যা বিভিন্ন চশমায় শহীদ মীনারকে একটু দেখেই নেয়া যাক।

প্রথমে কোন্ চশমা দিয়ে এটিকে দেখব ভাবছিলাম। ঐতিহাসিক বিষয় বিধায় ইতিহাসের চশমা দিয়ে শুরু করলেই তো সুন্দর হয়। সেমতে ঝুলি থেকে ঐতিহাসিক চশমাটি বের করে চোখে আঁটলাম। এই চশমা চোখে আঁটতেই শহীদ মীনারের মধ্য থেকে যেন তার ইতিকথা কবিতা হয়ে বেরিয়ে এল। আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ভাষায়–

আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলিতে পারি !

এ কবিতায় একটা ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে সে ইতিহাস হল– পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা কি হবে তা নিয়ে সৃষ্টি হল সংকট। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের রাজধানী। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। সেই সুবাদে রাজধানীর শাসকরা মনে করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। অপরদিকে সংগত কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের লোকরা দাবি করল বাংলাকেও যেন দেশটির অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হয়। কিন্তু সে দাবি রক্ষার চিন্তা করা হল না। এ অবস্থার মধ্যে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন সাহেব এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ঘোষণা করলেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সমাবেশে উপস্থিত ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানাল। তার পর ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে তারা একের পর এক কর্মসূচী দিয়ে যেতে লাগল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাশেম সাহেব ও অধ্যাপক নুরুল হক সাহেবের নেতৃত্বে এই কর্মসূচী এগিয়ে যেতে থাকল। প্রচারপত্র, সেমিনার, বুকলেট ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত তৈরি করা হতে থাকল। প্রচার ও জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে তমদ্দুন মজলিস "সৈনিক" নামে একটি পত্রিকাও বের করল। এই আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এক প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিল।

www.maktabatulabrar.com

সরকার সমাবেশ স্থলে ১৪৪ ধারা জারি করল। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে প্রতিবাদকে এগিয়ে নিতে থাকল। পুলিশ তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। এক পর্যায়ে পুলিশ প্রতিবাদী ছাত্রজনতার উপর গুলি চালাল। তাতে ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল রফিক, সফিক, সালাম, জব্বার ও বরকতসহ কয়েকজন। সেই ঘটনাস্থলেই নির্মিত হয়েছে এই শহীদ মিনার। শহীদ মিনার হল সেই ভাষাশহীদদের স্মৃতিবাহী এক ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ।

এরপর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর জাতীয় পত্র-পত্রিকা এবং একটা বিশেষ আদর্শের ধ্বজাধারী ও সরকার যন্ত্রের একটা বিশেষ অংশ খাস করে যে চশমার কদর মাত্রায় একটু বেশি পরিমাণ করে থাকে এবং যাদের চশমার দেখা অনুযায়ী সরকারী অনেক রীতি-নীতিও নির্ধারিত হয়ে থাকে, সেই বুদ্ধিজীবীদের চশমায় শহীদ মীনারের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু এ চশমায় যা দেখলাম তাতে বুদ্ধির তেমন কিছু খুঁজে পেলাম না, বরং ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে সেটাকে নির্বুদ্ধিতা বলেই মনে হল। তবু কেন এটা বুদ্ধিজীবী চশমা বলে আখ্যা পায় তার হেতু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এই যেমন ধরুন এ চশমায় ২১ শে ফেব্রুয়ারী যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল তাদেরকে মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে জাতীয় ভাষাদিবস হিসাবে ঘোষণা দেয়ার গুরুত্ব দেখতে পেলাম। কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেয়ায় এ দিবসকে মূল্যায়ন করতে হলে ইংরেজী তারিখকে মূল্যায়ন না করে ঘটনার দিন বাংলা তারিখ যেটা ছিল সেটাকেই তো মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত। তাহলেই তো বাংলা-র প্রতি জাতীয় গুরুত্ব প্রদানের চেতনা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত।

তারপর রয়েছে ভাষার জন্য প্রাণদানকারীদের উদ্দেশ্যে এই মীনারে ফুল অর্পন করার গুরুত্বের বিষয়টা। আমাদের তো এমন কিছু করা উচিত, যাতে জাতীয় ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারীদের বিদেহী আত্মার উপকার সাধিত হয়। কিন্তু এই স্মৃতিস্তম্ভে ফুল ছড়ালে তাদের আত্মার কি উপকার সাধিত হবে বলে বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন তা জানি না। এর কোনো সুব্যাখ্যা তারা দিতে পারবেন না তা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলা যায়। যদি তা-ই হয়, এতে তাদের কোনো উপকার সাধিত না হয়, তাহলে তাদের আত্মত্যাগকে কি অবমূল্যায়ন করা হবে না? মৃত্যুর পর কোন আত্মার

উপকার সাধনের একটি মাত্র পথ আছে। আর তা হল তাদের উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে ঈছালে ছওয়াব করা। এভাবে তাদের উপকার করলেই হবে তাদের মূল্যায়ন এবং সত্যিকার অর্থে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এ ছাড়া আর যা কিছুই করে মনে করা হবে যে, তাদের আত্মার উপকার করা হল, সেটা হবে অলিক ও অবাস্তবসম্মত কল্পনা। সেটা হবে নিতান্তই অবান্তর কর্ম। বরং বলা যায় খোদা না করুন তাদের যদি কোন আযাব হতে থাকে, আর তাদের উপকারের নামে বা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে আমরা এই ফুল ছড়াতে থাকি, তাহলে তা হবে তাদের আত্মার সঙ্গে এক ধরনের উৎকট রসিকতা। ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে ফুল অর্পনকে তাই একটা অবান্তর ও উৎকট রসিকতা কর্ম বলে আখ্যা দিলে কি তা খণ্ডন করার কোন পথ আছে? দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলা যায় নেই। তবুও বুদ্ধিজীবীদের চশমায় এটাই যুক্তিযুক্ত বলে দেখা যায়। তাই বলছিলাম বুদ্ধিজীবীদের চশমায় দেখা অনেক কিছুতেই বুদ্ধির প্রকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু উপরোক্ত বিষয়টিই নয়। মৃতের আত্মার জন্য কিছু করার আরও বেশ কিছু পদ্ধতি এই বুদ্ধিজীবীদের চশমায় যুক্তিযুক্ত বলে দেখা যায়। সেগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। যেমন– মৃতের আত্মার উদ্দেশে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকা, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, কাল পতাকা উত্তোলন করা ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবীগণ এগুলোর করণীয়তা গুরুত্বের সঙ্গেই বয়ান করে থাকেন। কিন্তু এগুলোর কোনটার দ্বারাই যে মৃতের আদৌ কোনো উপকার হয় না, তা বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। একটা গল্প মনে পড়ে গেল– এক ঠাকুরজী তার সাঙ্গাতকে জিজ্ঞাসা করল কি হে, এবার মৃত বাবার আত্মার জন্য কী কী করলে? সাঙ্গাত উত্তর দিল, "এবার বাবার জন্য তেমন কিছু করতে পারিনি, মাত্র দশ হাজার বেলপাতা ঘিতে ভেজে জলে ছেড়ে দিয়েছি।" বা ! বা !! বা !!! কতই না কাজের কাজ (?) করেছে!

এসব ফুল অর্পন, নীরবতা পালন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণ, কাল পতাকা প্রদর্শন ইত্যাদির পশ্চাতে যুক্তি হিসাবে হয়ত কেউ বলতে পারেন যে, এগুলো তাদের আত্মার পরকালীন উপকারের উদ্দেশ্যে নয় বরং এগুলো করা হয়ে থাকে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। ফুল

www.maktabatulabrar.com

দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয় তো ব্যাখ্যা অনপেক্ষ। আর আমরা তাদের মৃত্যুতে শোকাহত, এমনকি শোকে বেদনায় আমাদের বাক পর্যন্ত লোপ পেয়েছে– তা প্রকাশের জন্য নিরবতা প্রদর্শন করা হয়। আর তাদের মৃত্যুতে জাতি ভেঙ্গে পড়েছে তা প্রকাশের জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রতীক জাতীয় পতাকাকে নত দেখানো হয়ে থাকে। আর কাল রং হল শোকের প্রতীক, তাই কালো রংয়ের পতাকা প্রদর্শন হয়ে থাকে তাদের প্রতি শোক প্রকাশার্থে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো স্থূল দৃষ্টিতে একেবারে অযুৎসই মনে হয় না। কিন্তু শহীদ মিনার বা এরূপ কোন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল প্রদানের ক্ষেত্রে কথা হল শ্রদ্ধা পাওয়ার ব্যক্তি রইল কোথায় আর ফুল দেয়া হল কোথায়? ব্যক্তি রইল একখানে, আর অন্যত্র ফুলের তোড়া অর্পন করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মহড়া দেয়া হল– এটা অসংগতিমূলক হাস্যকর হয়ে যায় কি না তা কি একবারও ভেবে দেখা হয়েছে? ভাষাশহীদদের কবরের কাছে গিয়ে ফুল অর্পন করলেও অন্তত এই অসংগতির দায় কিছুটা হলেও হয়তো এড়ানো যেত। যদি কেউ বলতে চান, এখানে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে নিয়ে ফুল অর্পন করা হয়ে থাকে, তাহলে বলা যেতে পারে প্রত্যেকে যার যার ঘরে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে নিজ নিজ ঘরেই ফুলের মাল্য ঝুলিয়ে রাখতে পারে, তাতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হল, নিজের ঘরের শোভা বর্দ্ধনও ঘটল, আবার এত মূল্যবান ফুলের তোড়াগুলো অরণ্যে নিবেদন হওয়া থেকেও রক্ষা পেল।

আর কারও মৃত্যু-শোকে প্রকৃতই কেউ মুহ্যমান হয়ে গেলে সে বাকরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, শোকে সে নীরব নিথর হয়ে যেতে পারে-এমনটি তো মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ ঐ রকম শোকাহত না হওয়া সত্ত্বেও যদি সে বাকরুদ্ধতা প্রকাশ করে, তাহলে সেটাকে শোক প্রকাশ বলা হবে, না কি শোকের অভিনয় বলা হবে, না কি সেটা বালখিল্যতা আখ্যা পাবে, তা একটু বিবেচনার অপেক্ষা রাখে বৈকি। শোকের অভিনয় বা বালখিল্যতা দ্বারা কারও প্রতি শ্রদ্ধা নয় বরং তার সঙ্গে উপহাস প্রদর্শনই হয়ে থাকে।

আর জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণের মাধ্যমে শোক প্রকাশ– এ ক্ষেত্রে বিষয়টা এভাবে বিবেচনা করাই কি সংগত নয় যে, কারও মৃত্যুতে

জাতির সদস্যগণ শোকাহত হতে পারে, কিন্তু জাতির সত্তা তাতে নত হতে পারে না, জাতির স্বাধীনতা তাতে খর্ব হতে পারে না। জাতীয় পতাকাকে যদি জাতিসত্তার স্বতন্ত পরিচয়ের প্রতীক মনে করা হয়, এটিকে যদি জাতির স্বাধীনতার প্রতীক মনে করা হয়, তাহলে কোন ব্যাক্তির মৃত্যুতে জাতীয় পতাকাকে নমিত করে জাতির সত্তাকে খর্ব করে দেখানো যুক্তিসংগত হতে পারে না। এভাবে জাতির স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেখানো যুক্তিসংগত হতে পারে না। তদুপরি কোন জাতীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুকে জাতীয় শোকে নয় বরং জাতীয় শক্তিতে পরিণত করার দৃষ্টিভংগিতে এক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাকে নমিত না করে বরং আরও উঁচু করে শক্তি প্রদর্শন করলেই তো যুক্তিসংগত হতে পারত।

রইল কারও মুত্যুতে কাল রংয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শোক প্রকাশের নীতি। এ সম্পর্কে কেউ যদি বলে, কাল রংকে যেমন শোকের প্রতীক মনে করা হয়, তেমনি অশুভ সংকেতও মনে করা হয়ে থাকে। যাত্রাকালে কাল হাড়ি বা কাল কলসী দেখলে অনেকেই সেটাকে অশুভ সংকেত হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। ঘনঘটা করে আচ্ছন্ন হয়ে আসা কাল মেঘকে অশনি সংকেত মনে করা হয়। আবার প্রেয়সীর মেঘকাল চুল প্রেমকে উদ্বেলিত করে থাকে। রাতের জমকালো আঁধার গা ছমছম করা ভীতির সঞ্চার করে থাকে। এভাবে কাল রং বিপরীতমুখী বিভিন্ন চেতনার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কারও মুত্যুতে কাল রংয়ের যে পতাকা উত্তোলন করা হবে, সেটাকে কিসের সংকেত বা কোন্ ধরনের চেতনা উদ্রেককারী হিসাবে গ্রহণ করা হবে তা তো অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে।

যদিও ইসলামের চশমায় কোন রং বা কোন কিছুকে কুলক্ষণ হিসাবে দেখা হয় না। কোন কিছুকে কুলক্ষণ হিসাবে মূল্যায়ন করার নীতি ইসলামে স্বীকৃত নয়। কিন্তু এ জাতীয় ক্ষেত্রকে সাধারণত কেউ ইসলামী চশমায় দেখে না। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভংগিকে কয়জনই বা কেয়ার করে থাকে। তাহলে তো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা, দিবস পালন করা– কোনটারই অবকাশ থাকবে না। কেননা, এরূপ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন বিশেষত তার সামনে শির নতকরণ প্রায় শির্ক পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। আর কোন কিছু উপলক্ষে দিবস উদযাপন করার নীতি ইসলামের

www.maktabatulabrar.com

কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন– মৃত্যুদিবস, জন্মদিবস, বিবাহ-দিবস ইত্যাদি কোন দিবস পালনের নীতি ইসলামে নেই। ভাষা দিবস পালনও একই হুকুমভুক্ত। কুরআন-হাদীছের কোথাও কোন দিবস পালনের দলীল-প্রমাণ নেই। সাহাবা, তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ীদের আদর্শযুগেও কোন দিবস পালনের নমুনা পাওয়া যায় না।

সবশেষে গবেষকের চশমায় যে কোন দিবস পালনের বিষয়টা এক নজর দেখতে ইচ্ছে হল। একই সঙ্গে ভাষা দিবস পালনের বিষয়টাও তাতে দেখা হয়ে যাবে। এ চশমাটি চোখে আঁটতেই সব কিছু হ-য-ব-র-ল হয়ে গেল। দিবস পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। যেমন–

প্রথমত : যে বিষয়টা গোচরিভূত হল, তা হল– আমরা দিবস পালন করি, না কি তারিখ পালন করি? দিবস পালন করলে যে দিবসে অর্থাৎ, যে বারে ঘটনা ঘটে সে বারেই তা পালিত হওয়ার কথা, কিন্তু আমরা তো বার দেখি না বরং তারিখ দেখি। শুধু তারিখটা স্মরণ রেখে সেই তারিখেই তা পালন করি, যদিও ঘটনার বার আর সেই ঘটনার দিবস পালনের বারে পার্থক্য ঘটে যায়। ভাষা দিবসের বিষয়টাও এমন। তাহলে 'ভাষাদিবস' নাম না দিয়ে 'ভাষা-তারিখ' নাম দেয়াই তো যুক্তিযুক্ত ছিল। এমনিভাবে মৃত্যুদিবস, জন্মদিবস ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রেই 'দিবস' শব্দের স্থলে 'তারিখ' শব্দটির প্রয়োগ যুক্তিসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা তা করছি কৈ? দেখা গেল আমাদের বলা আর করার মধ্যে সংগতি রক্ষিত হচ্ছে না। এখানে দেখা যায় বিষয়টাতে রয়ে গেছে হ-য-ব-র-ল।

দ্বিতীয়ত : যদি দিবসই পালন করতে হয়, তাহলে একটা দিবস যেহেতু প্রতি সপ্তাহেই একবার ঘুরে আসে; সেমতে প্রত্যেকটা ঘটনার দিবস প্রতি সপ্তাহেই পালন করতে হয়। কিন্তু সেটা করা হয় বৎসরে মাত্র একবার। এখানেও দেখা যায় বিষয়টাতে রয়ে গেছে হ-য-ব-র-ল।

তৃতীয়ত : যদি আমরা বলতে চাই ঘটনার দিবসটা মুখ্য নয়, বরং তারিখটাই মুখ্য, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় ঘটনার ছোয়া যেমন তারিখের সঙ্গে লেগেছে, দিবসের সঙ্গেও লেগেছে; এমতাবস্থায় তারিখের দিকটাকে প্রাধান্য দেয়ার তো কোন যুক্তিসংগত কারণ অনুপস্থিত। তবুও বিনা কারণেই তাকে প্রাধান্য দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখানেও দেখা যায় বিষয়টাতে রয়ে গেছে হ-য-ব-র-ল।

চতুর্থত : একটা ঘটনা যখন ঘটে, সেটার তারিখ বাংলা, ইংরেজি ও আরবী সনের হিসাবে সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে কোন এক সময় সব রকম সনের তারিখ এক হয়ে গেলেও পরবর্তী বৎসর অবশ্যই ঐ দিনে তারিখের পার্থক্য ঘটবেই। উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তী বৎসর দিবস পালন করতে গিয়ে কোন্ সনটার অনুসরণ করে দিবস পালন করতে হবে- বাংলার, না ইংরেজির, না আরবীর? দেখা যায় কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা আরবী সন-তারিখের অনুসরণ করি, কোন কোনটার ক্ষেত্রে বাংলা সন-তারিখের অনুসরণ করি, আবার কোন কোনটার ক্ষেত্রে অনুসরণ করি ইংরেজি সন-তারিখের। কোন্ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের সনের অনুসরণ করতে হবে, তার কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই বা তার যুক্তিসংগত ও সর্বজনস্বীকৃত নীতি নির্ধারণ সম্ভবও নয়। এমন নীতিহীনতার মধ্য দিয়ে আমরা এক এক ধরনের ঘটনায় এক এক ধরনের সন-তারিখের অনুসরণ করে দিবস পালন করে যাচ্ছি। এখানেও দেখা যায় বিষয়টাতে রয়ে গেছে হ-য-ব-র-ল।

পঞ্চমত : যে সময় কোন একটা ঘটনা ঘটে থাকে–পরবর্তীতে যার স্মরণে আমরা দিবস পালন করি– এখানে প্রশ্ন হল পরবর্তী বৎসর ঐ তারিখে যে সময়টাতে আমরা দিবস পালন করি, সেটা কি পূর্বের বৎসরের সেই সময়টাই, না কি এটা একটা নতুন সময়? বস্তুত যে সময় চলে যায় সে সময় আর কোন দিন ফিরে আসে না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, আমাদের দিবস পালন করাটা একটা নতুন সময়েই ঘটে থাকে। যদি তা-ই হয়, তাহলে দিবস পালনের নামে আমরা পূর্বের ঘটনার স্মৃতিচারণ, নানা রকম ঘটা করণ ইত্যাদি যা কিছুই করে থাকি তা পরবর্তী বৎসরের নির্দিষ্ট তারিখে কেন, বৎসরের যে কোন তারিখে ও যে কোন সময়ে করতে পারি। কিন্তু কেন তা করা হয় না বা কেন সে রকম ভাবা হয় না কিংবা সেরকম করলে কেউ সেটাকে দিবস পালন কেন মনে করেও না। কিছুই তো স্পষ্ট হচ্ছে না। এখানেও দেখা যায় বিষয়টাতে রয়ে গেছে হ-য-ব-র-ল।

ষষ্টত : দিবস পালনে কি কি করতে হয়, তার কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে কি? কোন কোন দিবস পালন করা হয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে ফুল দিয়ে, কোন কোন দিবস পালন করা হয় আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে,

www.maktabatulabrar.com

কোন কোন দিবস পালন করা হয় মৃতের বক্তৃতার ক্যাসেট বাজিয়ে। মৃতের মৃত্যুদিবস পালনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও মীলাদ ও কাঙ্গালী ভোজের আয়োজনও অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোন কোন দিবস পালন করা হয় রাস্তায় রাস্তায় নানান রং বেরংয়ের পতাকা টাঙ্গিয়ে, সাইনবোর্ড, প্লাকার্ড ও ফেষ্টুন লাগিয়ে। আবার কোন কোন দিবস পালিত হয় শুধু পত্র-পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে, যে ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা পাঠ না করলে বোঝাই যায় না আজ কী দিবস পালিত হচ্ছে। ইত্যাদি যার যেমন কর্মসূচী নির্ধারণ করতে মনে চায় বা যে ক্ষেত্রে অবলিলায় যেটা করা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে দিবস পালনের পদ্ধতি। এর কোন সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতির বালাই নেই। এখানেও দেখা যায় বিষয়টাতে রয়ে গেছে হ-য-ব-র-ল।

এত রকম হ-য-ব-র-ল দেখতে আর কতক্ষণ ভাল লাগবে? তাই চোখ থেকে চশমা জোড়া খুলে ড্রাইভারকে সামনে এগিয়ে যেতে বললাম। টেক্সিক্যাবটি সামনে এগিয়ে চলল।

❁ ❁ ❁

জাদুঘর দর্শন

ফার্মগেটের উদ্দেশ্যে টেক্সিক্যাবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে চলল। শাহবাগ চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখে টেক্সিক্যাবটি এসে দাঁড়াল। ট্রাফিক সিগন্যাল পড়েছে। কিছুক্ষণ বিরতি ঘটবেই। ইত্যবসরে জাতীয় জাদুঘরটিকে এক নজর দেখে নেয়া যায় কি না? এমন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান দর্শন ব্যতিরেকে এগিয়ে গেলে সফরটি অপূর্ণ থেকে যাবে কি না তাই ভাবছিলাম। গ্রাম বাংলার মানুষ ঢাকা এলে তাদের দর্শনীয় বিষয়ের তালিকায় চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বায়তুল মুকাররম, শিশুপার্ক, রমনা পার্ক, লালবাগ কেল্লা, ইত্যাদির সঙ্গে জাদুঘর দর্শনও তালিকাভুক্ত থাকে। শুধু গ্রাম বাংলা থেকে আগত মানুষ কেন, এই রাজধানী ঢাকায় নিত্য বসবাসকারী জাদুঘর দর্শনার্থীদেরও প্রতিদিন ভিড় হয় এখানে প্রচুর। কিন্তু এটি দেখতে গেলে আমাকে গাড়ি থেকে অবতরণ করতে হয়, শহীদ মিনার-এর ন্যায় গাড়িতে বসেই এটা দর্শন সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ, জাদুঘর বাইরে থেকে দেখার বিষয় নয়, বরং তার মধ্যে কি আছে তাই

দেখার। আর তা দেখতে গেলেই আমাকে গাড়ি থেকে অবতরণ করতে হয়, তাতে যে গির্জা দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম সেটা আরও বিলম্বিত হয়ে যায়। হোক তবুও জাদুঘরটি দেখেই নেয়া যাক। হয়ত আবার ভিন্ন কোন দিন প্রোগাম করে আসার এরকম সুযোগ করা কঠিন হবে। ভেবে-চিন্তে ট্রাক্সিক্যাবটি ছেড়ে দিলাম।

রাস্তা সংলগ্ন টিকেট কাউন্টার থেকে পাঁচ টাকা মূল্যের প্রবেশ টিকেট নিয়ে প্রধান ফটক দিয়ে ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলাম। সামনে বিশাল ইমারত। তার সম্মুখে বড় অক্ষরে লেখা আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (Bangladesh National Museum)।

প্রথমেই এই "মিউজিয়াম" বা "জাদুঘর" কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য কি তা বুঝার জন্য অভিধানের চশমা চোখে আঁটলাম। এ চশমায় দেখলাম "জাদুঘর"কে ইংরেজিতে বলা হয় মিউজিয়াম্ (Museum)। এই "মিউজিয়াম্"-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : a collection of curious objects in nature or of art. অর্থাৎ, যেখানে প্রাকৃতিক বা শিল্প-বিজ্ঞানজাত কৌতুহলী বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করে রাখা হয়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে বাংলায় এক শব্দে "মিউজিয়াম্"-এর প্রতিশব্দ কি হওয়া উচিত তা ঠিক এই মুহূর্তে আমার জানা নেই। তবে অভিধানে তার প্রতিশব্দ লেখা হয় জাদুঘর। কিন্দু অভিধান লিখিত "জাদুঘর" শব্দটি কীভাবে "মিউজিয়াম্"-এর প্রতিশব্দ হল তা-ও ঠিক বোধগম্য নয়। কারণ, অভিধানেরই বর্ণনামতে "জাদু" (ভিন্ন বানান যাদু) শব্দের অর্থ ভেলকি, ইন্দ্রজাল, কুহক, প্রতারণা, তুক। এ সব অর্থের কোনটিই "মিউজিয়াম"-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, প্রাকৃতিক বা শিল্পবিজ্ঞানজাত বস্তুসামগ্রী দেখে দর্শকদের কৌতূহল জাগে বটে, কিন্তু তাতে তাদের চোখে বা মনে ভেলকি লাগে না বা তাতে তারা প্রতারিত হয় না। আর ইংরেজিতে "মিউজিয়াম্"-এর ব্যাখ্যায় যে বলা হয়েছে– যেখানে প্রাকৃতিক বা শিল্প-বিজ্ঞানজাত কৌতূহলী বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করে রাখা হয়, এ ব্যাখ্যাটিও পুনঃপর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে বলে মনে হল। এটা এ কারণে মনে হল যে, জাদুঘরের মধ্যে বাঘের জন্য কৃত্রিম বন-জঙ্গল বানিয়ে তার মধ্যে একটা বাঘকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক কৃত্রিম গাছ-পালা, তরুলতা বানিয়ে রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী, গাছ-পালা ও

www.maktabatulabrar.com

তরুলতার ক্যামেরাবদ্ধ ছবি। আরও রয়েছে গ্রামীন হাট-বাজার ও গ্রামীণ পরিবারের কত কৃত্রিম বানানো পরিবেশ। কৃত্রিম এই পরিবেশ বা কৃত্রিম এসব গাছ-পালা, তরুলতা ও বন-জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা শিল্প-বিজ্ঞানজাত কোনটাই নয়, তবুও তা কেন "মিউজিয়াম্" নামক প্রদর্শনশালায় স্থান পেল, যদি "মিউজিয়াম্"-এর সংজ্ঞা হয়ে থাকবে– যেখানে প্রাকৃতিক বা শিল্প বিজ্ঞানজাত বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করে রাখা হয়? তদুপরি এই জাদুঘরে রয়েছে ঐতিহাসিক অনেক দলীল-দস্তাবেজ, যেমন– স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক দলীল-দস্তাবেজ ইত্যাদি। এগুলো প্রাকৃতিক বা শিল্প-বিজ্ঞানজাত কোনটার আওতায় পড়ে না। এগুলোকে জাদুঘরের বস্তুসামগ্রীর আওতায় আনতে হলে সংজ্ঞায় উল্লেখিত "প্রাকৃতিক বা শিল্প-বিজ্ঞানজাত" কথাটির সঙ্গে "ঐতিহাসিক" বা "প্রাচীন" একটি শব্দও যোগ করার প্রয়োজন ছিল।

এ ছাড়াও সংজ্ঞায় উল্লেখিত "বিজ্ঞানজাত বস্তুসামগ্রী" কথাটির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত কি না তা-ও স্পষ্ট নয়। যদি অন্তর্ভুক্ত না হয়– এবং গোটা জাদুঘরের কোথাও আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোন কিছুর উপস্থিতি না দেখে অনুমিত হয় যে তা অন্তর্ভুক্ত নয়– তাহলে "বিজ্ঞানজাত বস্তুসামগ্রী" কথাটির পূর্বে "প্রাচীন" শব্দটিও যুক্ত করে দেয়া সংগত। কিন্দু "প্রাচীন" শব্দটি যোগ করলেও গোল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কেননা, জাদুঘরের তৃতীয় তলায় এক গ্যালারীতে আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যও স্থান পেয়েছে। এতে করে বুঝা যায় শুধু প্রাচীন নয় আধুনিক বস্তুসামগ্রীও জাদুঘরের বিষয়সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। যাহোক আভিধানিক ও পারিভাষিক তাবৎ অর্থেই মিউজিয়াম বা জাদুঘর কথাটির যথাযথ মর্ম অনেকটা অবোধগম্যই থেকে গেল। কি জানি এই অবোধগম্যতার কৌতূহল জাদুঘরের তাত্ত্বিক কৌতূহল কি না। এভাবে বাহ্যিক কৌতূহলী বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক কৌতূহলী বিষয়কেও হয়তোবা অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। এমনটি হলে জাদুঘরের বাহ্যিক বস্তুসামগ্রীকে বাহ্যিক বা স্থূল চশমায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে তাত্ত্বিক চশমায় দেখার বিষয়টাও নীতিগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে বৈ কি? যাহোক এই অবোধগম্যতা সঙ্গে নিয়েই জাদুঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম।

জাদুঘর একটা শানদার ইমারত। বিশাল আয়তনের চারতলা বিশিষ্ট একটা ইমারত। এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় রয়েছে দর্শনীয় বস্তুসামগ্রী। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে দেশের প্রাকৃতিক বস্তুসামগ্রী, আর তৃতীয় তলায় রয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুসামগ্রী। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে প্রায় ২৩/২৪টি গ্যালারী। তৃতীয় তলায়ও প্রায় সমসংখ্যক গ্যালারী রয়েছে। এক একটি গ্যালারী অর্থ এক একটি কক্ষ, যাতে প্রায় সমজাতীয় বস্তুসামগ্রী স্থান পেয়েছে। খুব তড়িঘড়ি করেও দ্বিতীয় তলার শুরু থেকে তৃতীয় তলার শেষ পর্যন্ত ঘুরে আসতে সময় লাগল প্রায় তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে সাদা চোখে যা যা দেখলাম সংক্ষেপে তার বিবরণ হল–

১ম গ্যালারীতে রয়েছে বিশালকায় বাংলাদেশের মানচিত্র। ২য় গ্যালারীতে রয়েছে গ্রামীণ বাংলাদেশের চিত্র। তৃতীয় গ্যালারীতে রয়েছে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ৪র্থ গ্যালারীতে রয়েছে খনিজ সম্পদ। যার মধ্যে বিশেষভাবে দেখলাম সমুদ্র সৈকতে প্রাপ্ত স্রোতের আঘাতে আঘাতে তৈরি হওয়া আগ্নেয় পাললিক ও রূপান্তরিত শীলা। এই গ্যালারীর এক দেয়ালে লটকানো দেখলাম একটি কাল্পনিক ছবি। যাতে দেখানো হয়েছে ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্বের একটি এপ্স (এক জাতীয় বানর) পরিবার। এখানে আরও দেখলাম প্রস্তরিভূত কাঠ, যা দেখতে কাঠের মত কিন্তু আসলে সেটি পাথর, পচিশ লক্ষ বছরে পানিতে বালুর সঙ্গে জমা হয়ে যা তৈরি হয়েছে। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে বাংলাদেশের গাছপালা। আরও দেখলাম দানাদার খাদ্যশস্য যেমন– চা, কপি, তুলা, পাট, ইত্যাদি। আরও দেখলাম বিভিন্ন বনৌষধী, যার অধিকাংশই ক্যামেরায় তোলা। এগুলো হল বিভিন্ন ঔষধী গাছের ছবি। এক গ্যালারীতে রয়েছে ফুল, ফল, লতাপাতা ইত্যাদি। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে জীবজন্তু। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক শামুক ঝিনুক স্থান পেয়েছে। এই গ্যালারীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হল মমি করা একটি করাত মাছ। এটি ৫.৮×১.৮ মিটার দীর্ঘ, ১৯৮০ সালে আরিচা ঘাটের কাছে যমুনা নদী থেকে ধরা। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। যার মধ্যে রয়েছে দেখতে আকর্ষণ না হওয়ার মত চিল শকুন ইত্যাদি। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী। এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হল একটি তিমির

www.maktabatulabrar.com

কঙ্কাল। এটি ১৩.৫ মিটার (৪৪ ফুট) লম্বা। এ তিমিটি ১৯৮৫ সালে কক্সবাজার সমুদ্র-সৈকত থেকে ৩০ মাইল দূরে শোয়ালখালি চরে আঁটকা পড়ে ধরা খেয়েছিল। এ তিমিটি একটি শিশু তিমি। উপরে বর্ণিত আকারটিও তিমির আকারের সামনে খুবই নগন্য। সর্ববৃহৎ নীল তিমির দৈর্ঘ হয়ে থাকে ৩৩ মিটার (১১৫ ফুট) যার ওজন হয়ে থাকে ১৫০ টন। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে হাতি, নিত্য যা দেখে থাকি। অনাকর্ষণ হওয়াতে সময়ে বরকত হল। দ্রুত সামনে অগ্রসর হলাম। তারপরের গ্যালারীর নাম বাংলাদেশের জনজীবন। এখানে রয়েছে বাঁশ ও বেতের তৈরী গৃহস্থালীসামগ্রী, পোড়ামাটি, কাঠ ও পাথরের তৈরী নানান গৃহস্থালীসামগ্রী থালা, বাটি, লোটা, ঘটি ছাইদান ইত্যাদি। এখানে আরও রয়েছে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা কামার, কুমার ও জেলেদের জীবন-চিত্র। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে বাংলাদেশের নৌকা। বাইচ নৌকা, সাপুড়ে নৌকা, যাত্রীবাহী নৌকা, মালবাহী নৌকা, মাছধরা/জেলে নৌকা, ভাসমান হোটেল নৌকা, ইত্যাদি নানান ধরনের নৌকা শোভা পেয়েছে। এর মধ্যে বাইচ নৌকাটি হল অরিজিন্যাল আর সবগুলো হল আর্টিফিশিয়াল। তারপর উপজাতি-১ ও উপজাতি-২ নামে পরপর দুটো গ্যালারী রয়েছে। এই গ্যালারী দুটোতে উপজাতিদের জীবনসামগ্রীর প্রায় সবকিছুই দেখানো হয়েছে। কোদাল, ঝুড়ি, ঢাল, তরবারী, তীর, ধনুক ও বাদ্যযন্ত্র থেকে শুরু করে তাদের গৃহস্থালীসামগ্রী তৈজসপত্র কৃষি ও মাছধরা সরঞ্জাম সব কিছুরই স্যাম্পল রাখা হয়েছে। এমনকি তাদের কানের দুল, বালা, কুচিবেড়াইয়া, খাড়ু, ধুমপানের পাইপ পর্যন্ত রাখা হয়েছে। তাদের ওয়াংলাই (নিম্নাঙ্গ আচ্ছাদনকারী পোশাক) পর্যন্ত রাখতে বাদ দেয়া হয়নি। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে বিভিন্ন রকমের মাটির পাত্র। তারপরের গ্যালারীতে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এতে প্রধানত স্থান পেয়েছে পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি ও পুতুল। যার অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন– কুম্ভকর্ণের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ, বিষ্ণু মূর্তি, কীর্তিমুখ, কিন্নর, পোড়ামাটির ফলকে পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য, ধ্যানী বুদ্ধ ইত্যাদি। তারপরে পরপর দুটো গ্যালারীতে রয়েছে বিভিন্ন রকম ভাস্কর্য। ভাস্কর্য ১-য়ে রয়েছে ব্রোঞ্জ ও পিতলের বিভিন্ন মূর্তি। এ মূর্তিগুলোরও অধিকাংশ হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের। যেমন– হিন্দুদের মূর্তির মধ্যে রয়েছে

বিষ্ণু, বলরাম, বৈষ্ণবী, লক্ষী, গৌরী, মনসা, সদাশির, উমা, মহেশ্বর, গণেশ, কার্তিক প্রমুখের মূর্তি। আর বৌদ্ধদের মূর্তির মধ্যে রয়েছে হারিতী, মরিচি, বোধিসত্ত্ব, জম্ভল, হেরুক, সিতাত, মহাপ্রতিসরা প্রভৃতি মূর্তি। ভাস্কর্য-২য়ে রয়েছে উপরোক্ত দুই ধর্মেরই কাল ও বেলে পাথরের বিভিন্ন মূর্তি, তবে এগুলো আকারে বিশাল বিশাল। এখানে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী হল শিবলিঙ্গ। বিশাল আকারের শিবলিঙ্গটা দেখে অনেক দর্শকই কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়চ্ছে। কেউ কেউ মুচকি হাসছে। সম্ভবত তারা এর ইতিহাস জানেন। একজন দর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাই! এর ইতিহাস জানেন কি? ভদ্রলোক হেসে দিলেন। বুঝলাম তিনি এর ইতিহাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। এর ইতিহাস জানলে হাসি পায় বৈকি। পূর্বে এক স্থানে সে ইতিহাসের কিছুটা উল্লেখ করেছি। পুনরাবৃত্তি করে স্মরণ রাখা পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক করতে চাই না। যাহোক তারপরের গ্যাল্যারীর নাম হল স্থাপত্য। এখানে কিছু ঐতিহাসিক মসজিদের ছবি এবং কাল ও বেলে পাথরের বিভিন্ন স্তম্ভ ও স্তম্ভসদৃশ মন্দির স্থান পেয়েছে। মসজিদের ছবির মধ্যে রয়েছে আতিয়া জামে মসজিদ টাংগাইল, সাদির মসজিদ ময়মনসিংহ, ষাটগম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট ইত্যাদির ছবি। তারপরের গ্যালারীটি লেখমালার। তারপরের গ্যালারীটি শিলালিপির। এখানের শিলালিপির সিংহভাগই বিভিন্ন মুসলিম স্থাপত্য ও মসজিদের শিলালিপি। এর অধিকাংশ আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এক পাশে রয়েছে ১৯৯১ সালে সৌদি আরব সফরকালে সৌদি সরকার কর্তৃক খালেদা জিয়াকে প্রদত্ত কা'বা শরীফের গিলাফের একটি খণ্ড। তারপরের গ্যালারীটি হল বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রাপ্ত পদক ও অলংকারের। অলংকারগুলো রূপার। এর মধ্যে রয়েছে দাঁড়ি বিছা, তারা বিছা, ঝুমুর বিছা, ফুল বিছা, বাজুবন্দ, সুতলি হার, ঝাপটা, টায়রা, খোপার কাটা, কানপাশা, কোমরের অলংকার, বেণীর অলংকার ইত্যাদি রকমারী অলংকার। আর মুদ্রার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রা, পাকিস্তানী মুদ্রা, বৃটিশ ভারতীয় মুদ্রা, ত্রিপুরা মুদ্রা, আরাকানী মুদ্রা, অহম মুদ্রা, কোচ মুদ্রা, সুলতানী আমল ও মোগল সম্রাটদের আমলের রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা প্রভৃতি। তারপরের গ্যালারী হাতির দাত দিয়ে তৈরী বিভিন্ন শিল্পকর্ম। এখানেই শেষ হল দ্বিতীয় তলার গ্যালারীসমূহ।

www.maktabatulabrar.com

তৃতীয় তলার গ্যালারীসমূহে রয়েছে ধাতু ও কাচের শিল্পকর্ম, চীনা মাটির শিল্পকর্ম, কাঠের শিল্পকর্ম, বাংলাাদেশের বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র, প্রাচীন যুগের শেরোয়ানী, চোগা ইত্যাদি পোশাক, আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। এক গ্যালারীতে আছে প্রাচীন যুগের কাঠের তৈরী খাট, পালঙ্ক ও বেড়া। এক গ্যালারীতে দেখলাম আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। আর এক গ্যালারীতে রয়েছে প্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমরবিদ প্রমুখ স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিদের তৈলচিত্র। এক গ্যালারীতে দেখলাম বিভিন্ন চিঠি-পত্র ও পাণ্ডুলিপি। এর মধ্যে ফতোয়ায়ে আলমগীরী, কিফায়াতুল মুসল্লিন, আব্দুর রহমান জামী-র শরহে রুবাইয়াত, ফেরদাউসী-র শাহনামা প্রভৃতির হাতে লেখা কপি। রামায়ন, মহাভারত, মভাগবত, পুরাণের বিভিন্ন অংশ, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির হস্তলিখিত কপিও দেখতে পেলাম। এক গ্যালারীতে দেখলাম বিভিন্ন প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র যেমন শিরস্ত্রাণ, বাজুস্ত্রাণ, তরবারী, কামান, কাড়া নাকাড়া, বর্শা, গুরুজ, গদা ইত্যাদি। এগুলো দেখে প্রাচীন যুগের যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লেখিত এসব অস্ত্রের আকার-আকৃতি সম্বন্ধে অস্পষ্টতা কেটে গেল। এই যুদ্ধাস্ত্রসমৃদ্ধ গ্যালারীতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব শিরাজ উদ্দৌলা-র তরবারী দেখে মনটা সুদূর অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতি স্মরণ করে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এতক্ষণের কৌতূহলী মনের আনন্দ বেশ খানিকটা ফিকে হয়ে আসল। মনের অবস্থা আরও বেশি কাতরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যখন তৃতীয় তলার শেষ ভাগে মুক্তিযুদ্ধ নামক গ্যালারীতে একটা কাচের বাক্সে সংরক্ষিত অনেকগুলো মাথার খুলি দেখতে পেলাম। সেগুলো মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের খুলি বলে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মনে হল সেই খুলিগুলোর চোখের শূন্য কোঠর থেকে ম্রিয়মান বেদনার আঁধার বেরিয়ে আসছে। নাকের শূন্য ফোকড় থেকে যেন জীবন হতাশার নিঃশব্দ নিঃশ্বাস বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখের শূন্য গহ্বর থেকে যেন আশাহত মানুষের অস্ফুট আহাজারী কুণ্ডুলিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, জীবন স্পন্দন যেন খানিকটা নিস্তেজ হয়ে এল। জাদুঘরের শেষ পর্যায়ের গ্যালারীতে এ সব বিষন্নতার উপকরণ রেখে শেষ মুহূর্তে দর্শকদের চিত্তানন্দকে মাটি করে দেয়ার উদ্যোগ কেন উদ্যোক্তাগণই হয়ত তার সুব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

এতক্ষণে সাদা চোখে জাদুঘর দর্শন সমাপ্ত করলাম। যাতে শুধু দেখতে পেলাম বস্তু আর বস্তু। রকম বেরকমের বস্তুসামগ্রী। বিভিন্ন যুগ ও সময়ের বস্তুসামগ্রী। কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তুকে জাদুঘরে স্থান দেয়া হল এবং কোন্টাকে স্থান দেয়া হল না– এর পেছনে কী মূলনীতি বা কোন্ দৃষ্টিভংগী কাজ করেছে তা উদঘাটনের জন্য একটি বিশ্লেষণী চশমা প্রয়োজন। সেমতে চোখে আঁটলাম এক জোড়া বিশ্লেষণী চশমা। একে একে উদঘাটন করতে চেষ্টা করলাম সেই মূলনীতি বা দৃষ্টিভংগী কী হতে পারে। এই চশমা দিয়ে বিশ্লেষণপূর্বক উদঘাটন করতে চেষ্টা করলাম কোন্ নীতির ভিত্তিতে জাদুঘরের বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করা হয়ে থাকবে। কিন্তু একক কোন্ নীতি এর পশ্চাতে কাজ করেছে তা কোনভাবেই উদঘাটন করা সম্ভব হল না। এই উদঘাটন প্রচেষ্টায় যে কয়টি দিক চশমার আয়নায় বিশ্লেষিত হয়েছে, তা হল–

* হয়ত দেশজ ঐতিহ্যের স্মৃতিকে ধরে রাখার ভাবনা এর পশ্চাতে কাজ করে থাকবে। প্রাচীন যুগের ব্যবহৃত মাটি পাথর ও কাঠের আসবাব-পত্র, তৈজসপত্র, থালা বাটি লোটা ঘটি ইত্যাদি হয়ত এ দৃষ্টিভংগিতেই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এ জন্যেই হয়ত গ্রামীণ হাট-বাজারের কৃত্রিম দৃশ্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। জেলেদের মাছ ধরার কৃত্রিম দৃশ্য, কৃষকদের হাল চালানোর কৃত্রিম দৃশ্য, মা-বোনদের ধান ভানার কৃত্রিম দৃশ্য ইত্যাদি এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই হয়ত তৈরী করে রাখা হয়েছে। তবে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আরও অনেক কিছুর দৃশ্য তৈরী করে রাখা যেত। যেমন গ্রামীণ মোড়ল-মাতবরদের লাঠি হাতে ও গামছা কাধে বিচার শালিসী করতে যাওয়ার দৃশ্য, ভাঙ্গা ছাতা বোগল দাবা করে পান চিবুতে চিবুতে ঘটকদের ঘটকালী করতে যাওয়ার দৃশ্য, পানসি নৌকায় পর্দা ঘেরা ছইয়ের তলে বসে অধির আগ্রহে পথ পাড়ি দেয়া নব বধুদের বাপের বাড়ি যাওয়ার দৃশ্য, বোরকা পরিহিতা মা-বোনদের লাজরাঙা গমনাগমনের দৃশ্য ইত্যাদি অনেক কিছু। এভাবে অনেক কিছুরই দৃশ্য তৈরি করে রাখার কথা ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। অতএব সংগ্রহ- নীতির পশ্চাতে এককভাবে এ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হল না।

* একবার ভাবলাম সংগ্রহ-নীতির পশ্চাতে যা কিছু বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম তার স্মৃতি ধরে রাখার প্রয়াস হয়ত কাজ করে থাকবে। এ জন্যই

www.maktabatulabrar.com

হয়ত বিরাট এক গ্যালারী জুড়ে বিশাল এক বাইচের নৌকা রেখে দেয়া হয়েছে। যাতে এটা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও ভবিষ্যত প্রজন্ম এটা দেখে এ সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়। মনে হল এ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে থাকলে এখনই সময় থাকতে আরও অনেক কিছু জিনিস জাদু ঘরে ধরে রাখা উচিত। যেমন ধরুন ঢাকার বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী টমটম গাড়ির এক দুটো জাদু ঘরে ঢুকিয়ে রাখা প্রয়োজন। কয়েকটি তাজা ইলিস মাছও মমি করে জাদু ঘরে রেখে দেয়া উচিত। নতুবা ইলিশ মাছ যেভাবে দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষে জাতীয় ইলিস মাছ দেখতে কেমন তা বুঝতে হয়ত বেগ পেতে হবে। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকা থেকে বেবী টেক্সি বা অটোরিক্সা- গুলোকে যেভাবে ঝেটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হল, তাতে সময় থাকতে এরও দু একটা কপি সযত্নে রক্ষা করা উচিত। আরও সংরক্ষিত করে রাখা উচিত দেশের কোন একটি অফিস আদালত যেটা এখনও দুর্নীতিমুক্ত এবং নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে চলছে। কেননা ভবিষ্যতে এতটুকুও হয়ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে আরও অনেক কিছু সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি বা করার লক্ষণও পরিদৃষ্ট নয়। অতএব সংগ্রহ-নীতির পশ্চাতে এ দৃষ্টিভঙ্গিও এককভাবে কার্যকরী ছিল বলে মনে হল না।

বিলুপ্তপ্রায় বস্তুকে জাদুঘরে ধরে রাখা প্রসঙ্গে জনৈক লেখকের একটি রম্য কথা মনে পড়ে গেল। কথাটি উল্লেখের পূর্বে একটি তথ্য বিবরণী শুনুন। ৯০-এর দশকে মার্কিন মুল্লুক ও বৃটেনের গণচরিত্রের একটা জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে যা বলা হয়েছিল তার সারকথা হল– একমাত্র ১৯৭৯ সালেই মার্কিন মুল্লুকে ৬ লাখ অবৈধ শিশু জন্ম নিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীদের শতকরা ৮৩ জনের অবৈধ সন্তান রয়েছে। পাঁচজন নবজাতকের মধ্যে তিনজনই সেখানে কিশোরী মাতার সন্তান। আর প্রতি বছরই নাকি শতকরা ৫ ভাগ অবৈধ সন্তান বেড়ে চলেছে। অবৈধ সন্তান জন্ম না নেয়ার ওষুধ ব্যবহার করে যারা অবৈধ সন্তানের আগমনকে ঠেকিয়ে রেখে এবং গর্ভপাত ঘটিয়ে মাতা হওয়ার প্রকাশ্য আলামতকে জনমের জন্য অপসারণ করেছে, তারা যদি এসব পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে মার্কিন মুল্লুকে অবৈধ সন্তান ঢাকার রাতের মশার মত বেশুমার হত। দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক

তৃতীয়াংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীদের শতকরা ৮৩ জনের অবৈধ সন্তান রয়েছে। আগে স্কুলের ছাত্রীরা গর্ভবতী হলে বের করে দেয়া হত; কিন্তু আজকাল তা আর করা হয় না। তাদের অবৈধ সন্তান প্রতিপালনের জন্য সরকার বছরে ৭০০ কোটি ডলারের চেয়ে বেশি ব্যয় করে থাকে। ২১ থেকে ২৯ বছর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েদের শতকরা ৩৫ ভাগ পর-পুরুষের সংগে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এটা ১৯৮২ সনের ডিসেম্বরে মার্কিন মুল্লুকের জরিপেরই একটা হিসাব। এই ভয়াবহ রিপোর্টের ভিত্তিতে সেখানে আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছিল যে, ৫/৭ বছর পর গোটা মার্কিন মুল্লুকে কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেও ১৩ থেক ১৬ বছর বয়সের একজন কুমারীও পাওয়া যাবে না।

আর বৃটেন সম্পর্কিত তথ্যে বলা হয়েছিল, ১৯৮০ থেকে অনূর্ধ ১৬ বছরের ৪ হাজারের অধিক বালিকা ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে গর্ভপাত করিয়েছে এবং অবিবাহিতা মায়েরা ৮১ হাজার শিশু জন্ম দিয়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের খাতায় রেকর্ড করা আছে যে, ১৯৮১ সালে ১৯ হাজার যৌন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য তারা একথাও একই সাথে স্বীকার করেন যে, এ সংখ্যা হচ্ছে প্রকৃত ঘটনার এক ভগ্নাংশ মাত্র। কোন ঘটনায় দু'জনের মধ্যে যখন গোলমাল লাগে, তখন তা থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। নতুবা রেকর্ড করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা হচ্ছে বৃটেনের জনসংখ্যা জরিপ বিভাগের দেয়া তথ্য। এ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ১৯৮০ সাল অপেক্ষা ১৯৮১ সালে বৃটেনে শতকরা ৫ ভাগ অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বেড়েছে। আর একই হারে ১৯৮২ সালেও বেড়েছে। বিলাতের ১০ হাজার কুমারীর উপর জরিপ চালিয়ে মাত্র একজন পাওয়া গেছে, যে নিজেকে কুমারী বলে দাবী করেছে। বৃটেনে ২০ বছর বয়সে যে সব মহিলা সন্তান দেন তাদের অর্ধেকই অবিবাহিতা।

এসব রিপোর্টের প্রেক্ষিতে উক্ত লেখক লিখেছিলেন– অবাধ যৌন স্বাধীনতার ফলে আমেরিকা ও বৃটেনে যেভাবে কুমারী মাতার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে এখন দু'একজন কুমারী পাওয়া গেলেও অদূর ভবিষ্যতে জাদুঘরে রাখার জন্যও এ দুই দেশে একজন কুমারী মেয়ে খুঁজে পাওয়া দুস্কর হবে। কাজেই সময় থাকতে দু' একজন সতী কুমারী মেয়ে ধরে এনে জাদু ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। এর সঙ্গে আমার আরও একটা বিষয়

www.maktabatulabrar.com

যোগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু যোগ করলে আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ি কি জানি! বিষয়টা হল ইংল্যান্ডে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবুও নামমাত্র রাজতন্ত্রকে ধরে রাখা হয়েছে। সেখানে রাজা-রাণীর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে হতে রাজা বা রাজপদে আসীনা রাণী সেখানে এখন শুধু জাতীয় একতার প্রতীক মাত্র; তিনি মন্ত্রিসভার বা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সব দলীল-পত্রই সই করতে বাধ্য। নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়া রাজা বা রাণী হিসাবে তার কোনই বাস্তব শাসন ক্ষমতা নেই। বৃটেনের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই শেষ চিহ্নটুকুও এক সময় অবশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা ফল না দেয়া কলাগাছকে আর কতদিনই বা কে যত্ন করে ধরে রাখে। অতএব বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বেই এই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সময় থাকতে কোন একজন রাণী ও যুবরাজকে কি তাহলে জাদু ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া যায়? এ প্রস্তাব দিতে সমস্যার ভাবনা হচ্ছে এ কারণে যে, তাহলে কোনো দুর্মুখ যদি বলে ফেলে আমাদের দেশে টার্মের পর টার্ম দুই নেত্রীর চুলাচুলি দেখতে দেখতে নারী নেতৃত্বের প্রতি জনগণ যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, তাতে এটিকেও বিলুপ্তির পথে গণ্য করা যায়। তাহলে কি সময় থাকতে ... । এমন বলে ফেললে পুলিশের ঠেঙানী খাওয়ার উপক্রম হতে পারে। আর উৎস খুঁজে সেই ঠেঙানীর কিয়দংশ আমার উপরও আপতিত হয় কি না ভাবনা জাগছে। অযথা পুলিশের ঠেঙানী খাওয়ার মত প্রয়োজনীয় সৎসাহসের বড্ড অভাব রয়েছে আমার।

* অবশেষে মনে হল জাদুঘরের সংগ্রহের পশ্চাতে কোন সুসংবদ্ধ চিন্তা কিংবা কোন স্থিত নীতি হয়ত কাজ করেনি, বরং উপরোক্ত সবগুলো ভাবনাই এর পশ্চাতে আংশিক আংশিকভাবে কাজ করেছে। শুধু উপরোক্ত ভাবনাই নয় বরং তা ছাড়াও এলোমেলো যখন যার যা মনে চেয়েছে, তাই এ সংগ্রহশালায় সংগ্রহের তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার অনুকূল এমন সব বস্তু বা উপাত্তও এ তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা উপরোক্ত ভাবনাগুলোর কোনটিরই আওতায় পড়ে না।

নিজস্ব চিন্তা-চেতনার অনুকূল উপাত্ত সংযুক্ত করার পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় জাদুঘরের ৪র্থ গ্যালারীর এক দেয়ালে লটকানো একটা কাল্পনিক ছবির কথা, যাতে দেখানো হয়েছে ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্বের একটি এপ্স

(এক জাতীয় বানর) পরিবার। অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এরূপ একটা কাল্পনিক ছবি দেখানোর দ্বারা ডারউইনের বিবর্তনবাদ-এর প্রতি আনুকূল্য প্রদানই হয়ত উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। নতুবা বৈজ্ঞানিকদের বাচনিক এপ্‌স (জাতীয় বানর) থেকে মানব গোষ্টি বিস্তারের বিবর্তনবাদীয় তথ্য ভুল আখ্যায়িত হওয়ার পরও এমন একটা কাল্পনিক ছবি প্রদর্শনের পশ্চাতে আর কী সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়।

এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা সংগত যে, ডারউইনের প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত মতবাদকে বলা হয় বিবর্তনবাদ বা জৈবিক বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)। এই মতবাদ অনুসারে আমরা বর্তমানে যে সকল বৈচিত্রময় প্রাণীকূল লক্ষ করছি, তাদের উৎপত্তি কোন এক বিশেষ সময়ে হয়নি, বরং একটা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে জীবকূল এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এমনকি মানুষও এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। ডারউইন মনে করেন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর জীব থেকে ধীরে ধীরে এক দীর্ঘ ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে। এই বিবর্তনের ধারায় নিম্ন শ্রেণীর জীব উন্নতি লাভ করে এক পর্যায়ে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয়। অতঃপর তা তাদের আকার পরিবর্তন করে মানুষে পরিণত হয়। সাধারণ জ্ঞানী মানুষেরা সংক্ষেপে ধারণা করেন ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলতে চায় যে, মানুষ এপ্‌ অর্থাৎ, বানর জাতীয় জন্তু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে, মানুষকে সরাসরি পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্ট নয়, বিবর্তনের ফল। তাই স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। (নাউযু বিল্লাহ!)

ডারউইনের মতে জগৎ সংসারে প্রাথমিকভাবে এক ধরনের জীবনের উৎপত্তি ঘটে। এ ছিল এক ধরনের এককোষী জীব। এই আদিম এক বা একাধিক কোষ নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই কোষ সৃষ্টি হয় এবং দুই কোষ আবার বিভক্ত হয়ে আরও দুটি করে জীবকোষ সৃষ্টি হয়। এভাবে ক্রমশ জগৎ সংসারে বহু কোষের আবির্ভাব ঘটে। এ জীবকোষগুলো থেকে বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই জীবকোষগুলো দেখতে সরল হলেও মূলত বেশ জটিল প্রকৃতির। কখনও কখনও এই জটিল প্রকৃতির জীবকোষের মধ্যে দেখা দেয় আকস্মিক পরিবর্তন (Fortuinous of charce variation)। এই পরিবর্তন জীবদেহেও পরিবর্তনের সূচনা করে। এভাবে

www.maktabatulabrar.com

জীবকোষগুলো ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবদেহে বিবর্তিত হতে থাকে। জীবকোষের মধ্যে তখন বিভিন্ন রকমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠতে থাকে। তবে এই যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা কিন্তু কোন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গড়ে উঠে না। বলা হয়েছে এই প্রক্রিয়াটি একটি আকস্মিক পরিবর্তন। তাই হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আকস্মিকভাবেই গড়ে ওঠে এবং এগুলো উদ্ভবের পরে আপনা আপনি এগুলোর এক একটির কার্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

কিন্তু ডারউইনের এই মতবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ–

১. ডারউইন তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথমেই এক কোষী জীবের কথা স্বীকার করেন। তার মতে সেই এক কোষ ভেঙ্গে বহুকোষের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই কোষ কিভাবে সৃষ্টি হল এর যথার্থ কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ডারউইনের মতবাদে পাওয়া যায় না।

২. তদুপরি ডারউইন জীবকোষের যে আকস্মিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তা কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কেননা কোন কিছুকে আকস্মিক বলা মানেই হল সে বিষয়টিকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণের প্রচেষ্টা না করে তাকে সরাসরি এড়িয়ে যাওয়া। বিজ্ঞান কখনও আকস্মিকতায় বিশ্বাস করে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ আবশ্যক।

৩. তাছাড়া ডারউইন তাঁর জৈবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তত্ত্ব বর্তমান জীববিজ্ঞানে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে জীব বিজ্ঞানী ভাইসম্যান প্রমাণ করেছেন যে, সর্ব প্রকার অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয় না, কেবলমাত্র জননকোষের বৈশিষ্ট্যগুলোই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে পারে।

৪. সমকালীন বিজ্ঞানের ‘প্রজনন তত্ত্ব’ থেকে আমরা জানি যে, প্রাণীর ডি, এন, এ এবং আর, এন, এ মিলে নতুন সন্তানের জন্ম হয় এবং সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার ক্ষেত্রেও সর্বদা একই রকম হয় না। এছাড়া মানুষের জীব কোষের গঠন ডি, এন, এ এবং আর, এন, এ-এর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের পর প্রমাণ হয় যে, অন্য কোন প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ প্রজাতির সৃষ্টি হয়নি।

৫. বিবর্তনবাদকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করণের পর্যায়ে আরও উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান প্রাণী বিজ্ঞানে ক্লোনিং একটি অবিস্মরণীয় উৎকর্ষ। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা সর্ব প্রথম ভেড়ার উপর এই ক্লোনিং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে 'ডলি' নামের একটি নতুন ভেড়া তৈরী করেছেন। যাহোক, আমরা জানি, ক্লোনিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে করে কোন প্রাণী দেহের কোন কোষ সংগ্রহ করে তা থেকে অন্য একটি প্রাণী তৈরী করা হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ক্লোনিং-এর দ্বারা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী তৈরী হয় না, একই প্রাণী তৈরী হয়। ঠিক যে প্রজাতির কোষ সংগ্রহ করা হয়, সেই প্রজাতিই হুবহু জন্মলাভ করে। কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও এ ক্ষেত্রে সংঘঠিত হয় না। তাই এর থেকে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী যেমন বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি।

সবশেষে চূড়ান্ত কথা হল– ডারউইনের মতবাদে ধর্মীয় বিশ্বাসকে চরম ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করায় এ মতবাদটি একটি সন্দেহাতীত কুফ্‌রী মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া বিবর্তনবাদের কথা বলে স্রষ্টাকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। মানুষ যদি সৃষ্ট না হয়, বিবর্তনের ফলাফল হয়, তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে, স্রষ্টা নেই? সরাসরি সৃষ্ট ও বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট, সর্বপ্রকারের সৃষ্টিই তো সার্বভৌম স্রষ্টার পক্ষে সম্ভব।

জাদুঘরের সংগ্রহকর্মে কি নীতি বর্তমান ছিল তা বিশ্লেষণের শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা হচ্ছে– এর পশ্চাতে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বর্তমান ছিল না বলে মনে হয়। বরং সংগ্রহকর্মে বিভিন্ন মুখী নীতি ও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। এ নীতির ফলে একটা ইতিবাচ্যতা এই দেখা দিয়েছে যে, এখানে বহুমুখী দ্রব্য-সামগ্রী ও নানা রকম সংগ্রহের সমাহার ঘটেছে। যার ফলে এখন যে কেউ যে কোন রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাদুঘর দর্শন করতে পারে এবং আপন আপন মন-মানসিকতা অনুসারে সেখান থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে নিতে পারে। যে যেমন চশমা চোখে আঁটবে, সে তেমন উপাত্তের সমাহার দেখতে পাবে। আস্তিকের চশমায় দেখা যাবে খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ। জাদুঘরের অসংখ্য প্রকার অদ্ভূত সব সৃষ্টির নমুনা দেখে তার মনে হবে সামান্য একটা

www.maktabatulabrar.com

ক্ষুদ্র কিছুও যখন কোন একজন নির্মাতা ব্যতীত হতে পারে না, তখন পৃথিবীর এই বিচিত্র সৃষ্টির জন্য অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তার আবশ্যক। ৫.৮×১.৮ মিটার দীর্ঘ করাত মাছ আর ১৩.৫ মিটার (৪৪ ফুট) লম্বা তিমির কঙ্কাল দেখে তার মনে হবে এক একটা বড় তিমি মাছের খাবার কয়েক টন করে। এদের খাদ্য সরবরাহের কেউ নেই। খোদা এরূপ অসংখ্য তিমির খাদ্য সরবরাহ করছেন। সত্যিই খোদা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন, খোদা রাজ্জাক বা জীবিকাদাতা। এর বিপরীত কোন নাস্তিক যদি চায় তার নাস্তিকতার প্রমাণ খুঁজে বের করতে, তাহলে সে তা করতে না পারলেও অন্তত এপ্ পরিবাবের কাল্পনিক ছবি দেখে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারবে।

লেখকরাও এখান থেকে আপন আপন মানসিকতা অনুসারে উপাত্ত খুঁজে নিতে পারবেন। পৌত্তলিকতার চশমাধারী লেখক অতীত কালের অসংখ্য মূর্তি দেখে সহজেই তাদের পূর্ব পুরুষদের বিস্তারমানতার তথ্যে উপনীত হতে পারবে এবং মনে করবে যবনরা জোর দখল পূর্বক এ দেশের কর্তৃত্ব হাতিয়ে নিয়েছে। তার মনে পূর্বসূরী মুসলিম মনীষীদের প্রতি প্রতিহিংসা রি রি করে উঠবে। আবার নিরপেক্ষ কোন মুসলিম লেখক এগুলো দেখে অবলিলায় এ তথ্য বের করে আনতে পারবেন যে, বিস্তারমান পৌত্তলিকতার স্থলে তাওহীদের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করতে মুসলিম পূর্বসূরী মনীষীদের কতই না ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। পূর্বসূরী মুসলিম মনীষীদের অবদানের প্রতি নজর দিয়ে তাদের প্রতি তার ভক্তি-চিন্তা আরও উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। কোন ঐতিহাসিক যদি যান, তাহলে তার জন্যও উপাত্তের প্রাচুর্য্য রয়েছে। গোটা তৃতীয় তলার সমুদয় গ্যালারীই তো ঐতিহাসিক বস্তুসামগ্রীতে ভরা। কোন মনস্তাত্বিক যদি জাদুঘরে যান, তাহলে তিনিও মনোবিজ্ঞানের অনেক উপাত্ত-প্রমাণ পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র, তৈজসপত্র, অলংকার, যুদ্ধাস্ত্র, মুদ্রা ইত্যাদি দেখে তিনি সংশ্লিষ্ট যুগের মন-মানসিকতা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। কেউ যদি রং তামাশার চশমা চোখে এঁটে জাদুঘর দেখতে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্যও যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। আবার কেউ যদি উপদেশ গ্রহণ করার উপাদান খোঁজেন, তার উপাদান উপাত্তও রয়েছে সেখানে যথেষ্ট। বড় বড়

ডাকসেঁটে নেতা, রাজ-রাজড়া ও বীর-বাহাদুরদের ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জিনিস-পত্র এবং তাদের তৈলচিত্র দেখে তার মনে হবে আজ তারা কোথায়? কোথায় গেল তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি? কোথায় গেল তাদের হুংকার? কোথায় গেল তাদের অহংকার? তাকওয়া উজ্জীবিত ব্যক্তি এসব ভেবে পরকালের চিন্তা-চেতনায় তন্ময় হয়ে পড়বে।

এ পর্যায়ে মনে পড়ল মিশরের জাদুঘরের রয়েল মমিজ কক্ষে রক্ষিত সেই ফেরআউনের মমি করা দেহটার কথা, যে খোদায়ী-র দাবী করেছিল। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার সময় সে তার লোক লশকরসহ পশ্চাদ্ধাবন করেছিল এবং সমুদ্রে ডুবে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। তৎকালীন প্রথা অনুসারে রাজকীয় দেহ মমি করে থিবিসের রাজকীয় উপত্যকায় দাফন করে রাখা হত। এই উপত্যকা থেকেই ১৮৯৮ সালে উক্ত ফেরআউন (যে ছিল মিসর-রাজ দ্বিতীয় রেমেসিস-এর পুত্র মারনেপতাহ)-এর মমি উদ্ধার করা হয়। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে মমিটির আবরণ উন্মোচনপূর্বক মিশরের জাদুঘরে দর্শনার্থীদের জন্য সেটা রেখে দেয়া হয়। পরবর্তিতে বিশেষ টীম দ্বারা তার উপর রেডিওগ্রাফিক স্টাডি পরিচালনা করে প্রমাণিত করা হয় যে, এটা সেই ফেরআউনের লাশ, যে পানিতে ডুবে মারা যায়। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ফেরআ্উনের এই করুণ দশা দেখলে তাকওয়া উজ্জীবিত ব্যক্তিবর্গ পরকালের চিন্তা-চেতনায় কতটা তন্ময় হয়ে উঠতে পারেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্মরণ হবে খোদার সেই বাণী–

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً.

অর্থাৎ, (হে ফেরআউন !) আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করে রাখব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। (সূরা ইউনুস : ৯২)

❁ ❁ ❁

গির্জা দর্শন

জাদুঘর দর্শন শেষে গির্জা দর্শনের উদ্দেশ্যে আবার ফার্মগেটের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলাম। তখন বেলা প্রায় একটা। গির্জা দর্শনের জন্য সকাল বেলাটাই উপযুক্ত সময়। বিশেষত বরিবার সকাল হলে তাদের

www.maktabatulabrar.com

ইবাদত তথা প্রার্থনাও দেখে আসা যায়। তাই বেলা একটার এই অনুপযুক্ত সময়ে গির্জা দর্শনে যাওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করে সেদিনের মত বায়তুল আতীক জামে মসজিদে বাসায় ফিরে গেলাম। তার পর একদিন রবিবার সকালে যাওয়ার চিন্তা চূড়ান্ত করলাম। নাখালপাড়া বায়তুল আতীক জামে মসজিদ (ছাপড়া সমজিদ) থেকে ফার্মগেট খুব দূরে নয়। ফজরের নামাজান্তে ধীরে সুস্থে পায়চারী করতে করতে ফার্মগেটের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সংগে ছিলেন ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ আলেম।

ফার্মগেট ওভার ব্রিজের পূর্ব দিকে সোজা পূর্বে বয়ে যাওয়া হলিক্রস রোডে একটু এগিয়ে ডান দিকে ক্যাথলিক খৃষ্টসমাজের একটা বিশাল গীর্জা অবস্থিত। এটা বাংলাদেশে ক্যাথলিক খৃষ্টসমাজের সর্ববৃহৎ গীর্জা। গীর্জার মাথায় বিশাল এক ক্রুশচিহ্ন (✝)। গির্জায় কেন এই ক্রুশচিহ্ন, এমনিভাবে খৃষ্টান পাদ্রী ও নানদের গায়েও কেন ক্রুশচিহ্ন থাকে, তা দেখার জন্য ইতিহাসের চশমা চোখে আঁটলাম। ক্রুশচিহ্নের ইতিহাস কি তা দেখতে চাইলাম। দেখলাম এই ক্রুশচিহ্ন খৃষ্টসমাজের ধর্মীয় প্রতীক। যদিও তাদের মূল ধর্মীয় কিতাবের কুত্রাপি এই চিহ্নের কথা নেই। ক্রুশারোহণের আকীদা থেকেই খৃষ্টান জগতের নিকট ক্রুশচিহ্ন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। তবে তাদের ধর্মের প্রাথমিক যুগেও এই ক্রুশকে সম্মানের রীতি ছিল না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দি পর্যন্ত এই ক্রুশচিহ্নের কোন সামাজিক গুরুত্ব ছিল না। সম্রাট কন্‌স্ট্যান্‌টিন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, ৩১২ খৃষ্টাব্দে তিনি তার এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন (সম্ভবত স্বপ্নে) আকাশে একটা ক্রুশের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর ৩২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তার মাতা সেন্ট হেলেনা এক স্থানে একটা ক্রুশ পান, যার সম্পর্কে লোকদের ধারণা– এটিই সেই ক্রুশ (খৃষ্টানদের ধারণামতে) যার উপর ঈসা মাসীহকে শূলী দেয়া হয়েছিল। এরপর থেকে ক্রুশ খৃষ্টান জগতের কাছে খৃষ্টধর্মের প্রতীক (Symbol) হিসাবে মর্যাদা লাভ করে এবং তারা উঠতে বসতে সর্বত্র এটি ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ঘটনার স্মরণে প্রতি বৎসর ৩রা মে খৃষ্টানগণ অনুষ্ঠান করে থাকেন। (বাইবেল ছে কুরআন তাক, তাকী উছমানী)

গীর্জায় প্রবেশের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। নিয়মকানুনও জানা নেই। প্রবেশ করতে যেয়ে কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্ন বা কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির

সম্মুখীন হই কি না ভেবে গীর্জার প্রবেশদ্বারে গিয়ে একটু জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিতরে অদূরে দারোয়ানটি দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদেরকে দেখে সে গেটের দিকে এগিয়ে এল। লম্বা পাঞ্জাবী ও দাড়ি টুপী ওয়ালা এরূপ দুজন লোককে গেটে দেখে সে যেন খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে বলেই মনে হল। জানতে চাইল আমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছি। বললাম, আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে চাই। সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে সোজা ভিতরে গিয়ে এক সাদা ইংরেজ মেমকে ডেকে আনল। মেম সাহেবা কিছু বলার আগেই আমি বললাম May we come in? অর্থাৎ, আমরা প্রবেশ করতে পারি কি? মেম সাহেবা জিজ্ঞাসা করলেন, for what purpose? অর্থাৎ, কী উদ্দেশ্যে? বললাম, for observe how to pray অর্থাৎ, আপনাদের ইবাদাত তথা প্রার্থনা দেখার জন্য। তিনি সানন্দে বললেন, ok come in অর্থাৎ, বেশ তো আসুন। আমরা স্বস্তি বোধ করলাম। ভিতরে প্রবেশ করলাম।

প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করেই বাম পাশে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বী গীর্জা ঘরটি। ভিতরে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বী একটা বিশাল হল ঘর। এটাই প্রার্থনা কক্ষ। কক্ষের পশ্চিম দিকে সামান্য উঁচু একটি মঞ্চ। প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন ধর্মগুরু প্রার্থনা পরিচালনা করছেন। তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে আছেন, অন্যরা গুরুর দিকে তথা পশ্চিম দিকে মুখ করে আছেন। উল্লেখ্য, খৃষ্টানদের কেবলা হল পূর্ব দিক। কারণ তৎকালীন যুগে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় বসবাসকারী খৃষ্টানদের এলাকা থেকে পূর্ব দিকে বেতেলহামে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল। এ থেকেই তাদের কেবলা স্থির হয় পূর্ব দিকে। কিন্তু কেবলার দিক নির্ধারিত হওয়ার এ বিষয়টা আমার কাছে দুটো কারণে বেখাপ্পা ঠেকল। যথা–

এক : বেতেলহামে ঈসা মসীহের জন্ম হওয়ার কারণে কেবলা নির্ধারিত করতে হলে বেতেলহাম নামক স্থানকে কিংবা যে স্থানে ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল ঠিক সে স্থানকে কেবলা নির্ধারিত করা উচিত, পূর্ব দিককে নয়। সেমতে বিশ্বের যেকোনো স্থানের খৃষ্টানদের কেবলা হবে বেতেলহামের দিক, পূর্ব দিক নয়। কারণ বেতেলহাম সকলের পূর্ব দিকে নয়। অন্যথায় বেতেলহামের পশ্চিম দিক ব্যতীত অন্য দিকে বসবাসকারী খৃষ্টানগণ পূর্ব দিকে মুখ করে ইবাদত করলে বেতেলহামকে সম্মান করা

www.maktabatulabrar.com

প্রকাশ পাবে না, অথচ এই স্থানকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই তারা এর দিককে কেবলার দিক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। মুসলমান, ইয়াহুদী প্রমুখ কেবলাপন্থী সকল ধর্মাবলম্বীর কেবলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে নীতিটি কার্যকরী রয়েছে, তাহল কেবলা কোন নির্দিষ্ট দিক নয় বরং নির্দিষ্ট একটা স্থানের দিক। এ নীতিতে কোনো অযৌক্তিকতা দেখা দেয় না।

দুই : পূর্ব দিক যদি কেবলা হয়ে থাকবে, তাহলে ইবাদতকারী সকলকেই সে দিকে ফিরে ইবাদত করতে হবে। অথচ খৃষ্টানদের ইবাদত তথা প্রার্থনার ক্ষেত্রে পরিচালনাকারীকে দেখা যায় পূর্ব দিকে ফিরে প্রার্থনা পরিচালনা করছেন কিন্তু অন্যরা পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রার্থনা করছেন। এই অযৌক্তিকতা ও বেখাপ্পা বোধ প্রতিহত করার কোন সুরাহা তাদের কাছে আছে কি না তা আমার জানা নেই।

যাহোক প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার পদ্ধতি যা দেখলাম তা হল– মঞ্চে দণ্ডায়মান ধর্মগুরু যীশু খৃষ্টের মানব সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বাণী পাঠ করে শোনাচ্ছেন আর মঞ্চের পাশে তৈরী করে রাখা যীশুখৃষ্টের ও মরিয়মের (মেরির) মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলছে, হে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা ! আমাদের মানব সেবার ক্ষমতা দাও, অমুকের ক্ষমতা দাও, তমুকের ক্ষমতা দাও ইত্যাদি।

এই পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা তথা তিন সত্তার কাছে প্রার্থনা করার কারণ বুঝতে হলে খৃষ্টধর্মের একটা মূল দর্শন বুঝতে হবে। খৃষ্টবাদের প্রধান আকীদা তথা সবচেয়ে বহুল আলোচিত ও সর্বাধিক বিতর্কিত দর্শন হল ত্রিত্ববাদ দর্শন। ত্রিত্ববাদকে ইংরেজিতে বলা হয় "ট্রিনিটেরিয়ান ডকট্রিন" (Trinitarian Doctrine)। "ত্রিত্ববাদ" অর্থ হল তিন খোদার সমষ্টিকে খোদা বলার মতবাদ। খৃষ্টধর্মের মতবাদ অনুযায়ী পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা (রূহুল কুদ্স) এই তিনটি সত্তা (Person)-এর সমষ্টি হল খোদা (god)। মতান্তরে এই তিনটি সত্তা হল পিতা, পুত্র এবং কুমারী মরিয়ম। তারা 'পিতা' বলতে আল্লাহ, 'পুত্র' বলতে যীশুখৃষ্ট তথা আল্লাহ্র কালামগুণ যা হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতিতে আগমন করেছিল এবং 'পবিত্রাত্মা' বলতে পিতা এবং পুত্রের রূহ বা আত্মাকে বুঝিয়ে থাকেন। এই ত্রিত্ববাদের কারণেই প্রার্থনা করার সময় তাদেরকে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা– তিন সত্তার সকলের নামই উচ্চারণ করার ঝামেলা পোহাতে

হয়। তিনজনের কার কাছে কতটুকু ক্ষমতা তা নির্ধারিত থাকলে বা ক্ষমতার ডিপার্টমেন্টাল ক্লাসিফিকেশন থাকলে সব প্রার্থনার ক্ষেত্রেই তিন জনের নাম উচ্চারণ করার বদারেশন থেকে তারা রক্ষা পেতেন।

আরও উল্লেখ্য যে, খৃষ্টসমাজ দর্শনগতভাবে তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদিতার প্রবক্তা। আলফ্রেড এ গার্ভের দেয়া খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞায় স্পষ্টতঃই একেশ্বরবাদিতার প্রতি ঈমান রাখার কথা বলা হয়েছে। ত্রিত্ববাদ তথা তিন খোদার আকীদা সেই একেশ্বরবাদিতার পরিপন্থী হয়ে যায়। তাই খৃষ্টানজগত বলে থাকে, তিনে মিলে এক এবং একে তিন। এভাবে তারা ত্রিত্ববাদের মধ্যে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ রক্ষা হয় বলে দেখানোর চেষ্টা করেন। এটাকে তারা নাম দিয়েছেন "ত্রিত্বের একত্ব"। ইন্সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, "পিতা গড্, পুত্র গড্, রুহুল কুদ্সও গড্ কিন্তু তারা মিলিতভাবে তিন খোদা বা তিন গড্ নন, বরং একই গড্।

এই তিন সত্তার স্বতন্ত্রভাবে মর্যাদা কী? এবং সমষ্টির সাথে তাদের সম্পর্ক কী? এ বিষয়টি নিয়ে খৃষ্টানজগতে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন, এই তিনের সমষ্টি খোদার যে মর্যাদা, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেরও সেই মর্যাদা। সমষ্টি যেমন খোদা, তেমনি তিন জনের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে এক এক জন খোদা। কেউ কেউ বলেন, এই তিন জনের প্রত্যেকেই খোদা হলেও স্বতন্ত্রভাবে তাদের মর্যাদা সমষ্টির তুলনায় কম। কিছুটা ব্যাপক অর্থেই এদেরকে খোদা বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, স্বতন্ত্রভাবে এই তিন জন খোদাই নন বরং তাদের সমষ্টি হল খোদা।

ত্রিত্ববাদের মধ্যে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ রক্ষার প্রচেষ্টায় প্রদত্ত এ সব ব্যাখ্যা হয়ত খৃষ্টবাদের অন্ধ ভক্তির চশমায় ভাল দেখাতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষ যুক্তির চশমায় তা আদৌ যুক্তিযুক্ত দেখাবে না। এমনকি স্বয়ং খৃষ্টানদের অনেক দলও এটাকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন। খৃষ্টানদের এবিউনী সম্প্রদায় শুরুতেই আত্মসমর্পন করে বলেছেন, "যাই বলুন না কেন হযরত মাসীহ (আ.)কে খোদা মেনে নিয়ে কিছুতেই আমরা তাওহীদ রক্ষা করতে পারব না।" পল ও লুসিয়ান প্রমুখ অনেকেই স্পষ্টত বলে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহকে খোদা মানাই ভুল। তিনি শুধুমাত্র একজন মানুষ বৈ কিছু নন। পল ও লুসিয়ানের অনুকরণে চতুর্থ শতাব্দির

www.maktabatulabrar.com

বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ আরিউস সমসাময়িক চার্চের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং সমগ্র খৃষ্টানজগতকে কাঁপিয়ে তোলেন।

"তিনের এক এবং একের তিন" হওয়ার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা না দিতে পেরে এবং কোন উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে কোন কোন খৃষ্টান ব্যাখ্যাকার মুখ বাঁচানোর একটি ফন্দী বের করে বলেছেন, "ত্রিত্ববাদ" মানব জ্ঞানের অগম্য পর্যায়ের একটি বিষয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন, "তিনের এক এবং একের তিন" হওয়া এমন একটি গোপনীয় সত্য যা বুঝবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু এমন বললে যে কেউ ধর্মের নামে যে কোন অযৌক্তিক বিষয় উদ্ভাবন করে সেটাকে চালিয়ে দেয়ার একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবে, তা বোধ হয় তারা ঠাহর করতে পারেননি। কিংবা পারলেও কোন উপায়ান্তর না থাকায় বুঝে শুনেই তারা এমন বেখাপ্পা বস্তু গলাধকরণ করেছেন। আর প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় যেকোন ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে নিরবতাকেই নিজেদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নিরব থাকলেই কি সেটার সমাধান হয়ে গেল? নিজে চোখ কান বন্ধ করে থাকলে আর কেউ তাকে দেখবে না- এমন লুকোচুরি কাকের স্বভাব বলে জানতাম। কাক নাকি চোখ বন্ধ করে চুরি করে আনা সাবান কোথাও গুঁজে রাখে আর ভাবে কেউ তাকে দেখল না। পরে নিজেও তা খুঁজে পায় না। শুনেছিলাম কাক ছাড়া আর কিছুতে নাকি এমন করে না। কিন্তু এখন দেখছি মানুষেও এমন করে থাকে। যাহোক অনেক কসরৎ সত্ত্বেও ত্রিত্ববাদ আজও দুর্বোধ্যই রয়ে গেছে।

শুধু ত্রিত্ববাদই নয় হযরত ঈসা (আ.)কে খোদার পুত্র বলার বিষয়টাও যুক্তির চশমায় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তার কারণ নিম্নরূপ–

১. পুত্র পিতার মতই হয়ে থাকে। অতএব ঈসা (আ.) আল্লাহ্র পুত্র হয়ে থাকলে তিনিও খোদার মতই হবেন। তাহলে তিনি কেন পানাহার করতেন? তিনি কেন মানুষের মত জৈবিক চাহিদার অনুসারী ছিলেন? খোদা তো এমন নন।
২. তিনি যদি খোদার পুত্র হয়ে থাকবেন, তাহলে খৃষ্টানদের বক্তব্য অনুযায়ী যখন শত্রুগণ তাকে শূলিতে চড়ালো, তখন কেন তার পিতা তাকে

রক্ষায় এগিয়ে এলেন না? নাকি তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না? আর তার পিতাকেই বা এগিয়ে আসতে হবে কেন, তিনি তো নিজেই খোদা, তিনি নিজেকে কেন রক্ষা করতে পারলেন না? ঈসা মাসীহ (আ.) সম্পর্কে খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস হল তিনি খোদার পুত্র ছিলেন। এই "পুত্র" কথার ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, পুত্র হল আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী-গুণ (অর্থাৎ, পুত্রের সত্তা) যা মানব কল্যাণের জন্য হযরত ঈসা মাসীহের মানবীয় সত্তায় অবতারিত হয়েছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এই খোদায়ী সত্তা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। ইয়াহুদী কর্তৃক তাঁকে শূলীবিদ্ধ করার পর তার দেহ থেকে এই খোদায়ী সত্তা পৃথক হয়ে যায়।

সারকথা, খোদার কালাম গুণ শরীরী রূপ ধারণ করে ঈসা মাসীহের রূপ নিয়ে আগমন করেছিল। "স্টাডিজ ইন খ্রিস্টিয়ান ডকট্রিন্স" গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে সত্তা খোদা ছিল, তিনিই খোদায়ীর গুণ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে মানুষ হয়ে যান। অর্থাৎ, তিনি আমাদের মত অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে নেন, যা স্থান ও কালের গণ্ডিতে গণ্ডিবদ্ধ। তারপর একটা কাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন। অতএব খৃষ্টানদের এই অবতার হওয়ার আকীদা (incarnation) অনুসারে তিনি খোদা ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না কেন?

যদি বলা হয় যীশু খৃষ্ট স্বেচ্ছায় ক্রুশারোহণ করেছিলেন। সকলের পাপ মোচনের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি এটা করেছিলেন। খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (Atonement/ অ্যাটোন্‌মেন্ট)। ও ক্রুশারোহণের আকীদা (Crucifixion/ক্রুস্‌ফিক্‌সন) এ কথাই বলে। খৃষ্টানদের ধারণা মতে যিশু খৃষ্ট শূলীতে বিদ্ধ হয়ে খৃষ্টজগতের সকলের ঐ পাপ মোচনের ব্যবস্থা করে গেছেন, যা আদম (আ.)-এর ভুলের কারণে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এভাবে জগতকে রেহাই দেয়াই পৃথিবীতে যীশু খৃষ্টের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটাই হল তাদের ভাষায় প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারা (পাপমোচন)। এই প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা)-এর আকীদা-বিশ্বাস খৃষ্টধর্মের একটি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস। এমনকি খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে এই বিশ্বাসের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। আলফ্রেড এ গার্ভের দেয়া খৃষ্টধর্মের সংজ্ঞায় কাফ্‌ফারা তথা প্রায়শ্চিত্তের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

যাহোক যীশু খৃষ্ট সকলের পাপ মোচনের জন্য স্বেচ্ছায় ক্রুশারোহণ করেছিলেন– এ কথা বলা হলে তার কাউন্টার হবে তাদেরই এক বর্ণনা থেকে। তাদেরই বর্ণনা মতে ঈসা মসীহকে যখন ফাঁসীতে চড়ানো হয়, তখন তিনি বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় তার শূলীতে আরোহণ স্বেচ্ছায় হয়নি। আরও দেখা গেল ঈসা খোদা বা খোদার অংশ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না বরং ইয়াহুদীদের হাতে নিহত হলেন। এমন অক্ষমকে খোদা বলে মেনে যায় না।

একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার কোন এক স্থানে খৃষ্টানদের সঙ্গে মুসলমান আলেমদের এক বাহাছ চলছিল। বাহাছের এক পর্যায়ে জনৈক কৃষক এসে বলল, আমাকে একটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হোক। তাকে সুযোগ দেয়া হলে সে জিজ্ঞাসা করল ঈসা মসীহ ব্যতীত খোদার আর কোন সন্তান আছে কি না? খৃষ্টানগণ জওয়াব দিল– না আর কোন সন্তান নেই। তখন কৃষক বলল, আমি একজন খেটে খাওয়া মানুষ, তারপরও আমার ১২টি সন্তান। আর তোমাদের খোদা এক সন্তান জন্ম দিয়েই তার পাওয়ার শেষ ! এমন অক্ষমকে খোদা বলে মেনে নেয়া যায় কি? এই এক প্রশ্নেই বাহাছে মুসলমাগণ জিতে গেলেন।

খৃষ্টসমাজ ঈসা মসীহকে খোদা আখ্যায়িত করে যে নাজেহাল দশায় পড়েছে, সে দশা থেকে তারা কোনোদিন উদ্ধার পাবে না। কারণ অবাস্তব ও অযৌক্তিক বিষয়ের পশ্চাতে পড়ে কেউ কোন দিন পার পায় না।

শুধু উপরোক্ত বিষয় কেন ক্যাথলিক খৃষ্টসমাজের আরও বহু আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে যা যুক্তির চশমায় নিতান্তই বালখিল্যতা বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। যেমন– ক্যাথলিক খৃষ্টসমাজের একটা অনুষ্ঠান রয়েছে যার নাম "আশায়ে রব্বানী" বা ঈশ্বরভোজ। ইংরেজিতে বলা হয় "Lords supper", "Euchirist", "Saered Meal", "Holy cormunion" প্রভৃতি। এই ঈশ্বরভোজ খৃষ্টানদের একটি প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আজও ক্যাথলিকগণ অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

মি. জাষ্টিন মার্টিয়ারের বর্ণনামতে এই ঈশ্বরভোজ অনুষ্ঠান নিম্নরূপ– প্রতি রবিবারে গীর্জায় একটি সমাবেশ হয়। প্রারম্ভে কিছু দুআ, কিছু গান,

অতঃপর উপস্থিতবৃন্দের একে অন্যকে চুম্বনপর্ব ও মুবারকবাদের পর রুটি ও শরাব আনিত হয়। সভাপতি তা গ্রহণ করত পিতা, পুত্র এবং রূহুল কুদ্স (পবিত্রাত্মা)-এর নামে দুআ প্রার্থনা করেন। উপস্থিতদের সকলেই তার সঙ্গে আমীন আমীন বলেন। অতঃপর গীর্জার সেবায়েতগণ ঐ রুটি এবং শরাব উপস্থিতদের মধ্যে বিতরণ করেন। রুটি এবং শরাব বিতরণের সংগে সংগেই রুটি হযরত ঈসা (আ.)-এর দেহে এবং শরাব ঈসা (আ.)-এর রক্তে পরিণত হয়ে যায়। উপস্থিতগণ ঐ রুটি এবং শরাব পানাহার করেন। এভাবে পানাহার করে তারা প্রায়শ্চিত্ত আকীদার পূণ্য-স্মৃতি রোমন্থন করেন।

এবার পাঠকবর্গই ভেবে দেখুন এভাবে প্রকারান্তরে তারা যেন যীশু খৃষ্টের রক্ত মাংস পানাহার করেন। বান্দারা তাদের খোদার রক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে পারে এমন কথা কোনো যুক্তিই কি মেনে নিবে? এটাকে বালখিল্যতা ছাড়া আর কী বলে আখ্যা দেয়া যায় বলুন তো।

ক্যাথলিক খৃস্টসমাজের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনে পড়ে গেল পোপ সম্পর্কিত তাদের একটা আকীদা-বিশ্বাসের কথা। পোপ নজরানা বা ভেট গ্রহণ করে বিনিময়ে ক্ষমাপত্র দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, টাকার বিনিময়ে পোপ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, "পোপ" হলেন খৃষ্টসমাজের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। জন টিট্জেল নামক পাদ্রী ১৫১৭ সালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, "কেউ যদি তার মায়ের সঙ্গেও ব্যভিচার করে এবং পোপের মার্জনা বাক্সে কিছু অর্থ রেখে দেয়, তাহলে তার দুনিয়া আখেরাত ইহকাল পরকালের পাপ মার্জনা করে দেয়ার অধিকার পোপের রয়েছে। আর বলা বাহুল্য যে, পোপ যদি মার্জনা করে দেন, তবে আল্লাহ্কেও তা মেনে নিতে হবে।" এর বিপরীত গ্রান্ড পোপ যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত 'সিদ্দীকীন' সাধু-সন্তদের আত্মা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। (অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারবেন না।) এ আকীদায় বোঝানো হয়েছে যে, মৃতদের মার্জনা পোপদের হাতে। এ মর্মে দশম পোপ লিও ডকুমেন্টারী টিকেট চালু করেন। যা তিনি বা তার প্রতিনিধিরা পূর্বাপর সমস্ত পাপের মার্জনা প্রার্থীদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। ইন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এই টিকেটের ভাষা ও বর্ণনার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

এবার যুক্তি ও বাস্তবতার চশমায় পোপবাদ সম্পর্কিত বিশ্বাসকে একটু দেখতে ইচ্ছে হল। এ চশমা চোখে আঁটতেই মনে হল সব পাপ ক্ষমা করা যদি পোপের হাতে হয়ে থাকবে এবং তিনি পাপ ক্ষমা না করলে আল্লাহও যদি ক্ষমা করতে না পেরে থাকবেন, তাহলে খৃষ্টসমাজের এই প্রার্থনা ইত্যাদির কী প্রয়োজন? সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু পোপের দান বাক্সে টাকা ছাড়লেই তো হয়ে যায়। আর ক্ষমা করার এমন একচ্ছত্র ক্ষমতা পোপের হাতে থাকার বিষয়টা বাস্তব হয়ে থাকলে উম্মতের পাপ মোচনের জন্য যীশু খৃষ্টের ক্রুশারোহণের কী প্রয়োজন ছিল? পোপই তো তা ক্ষমা করে দিলে চলত। এই সঙ্গে পাঠকবর্গ আরও একটা বিষয় চিন্তা করে দেখতে পারেন। তা হল– পোপ ক্ষমা করলে আল্লাহ ক্ষমা করতে বাধ্য আর পোপ ক্ষমা না করলে তিনি কাউকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন না– এই আকীদা-বিশ্বাসের সারকথা কি এই দাঁড়ায় না যে, খোদা পোপের হাতে জিম্মী। খোদা (নাউযু বিল্লাহ!) এমনই অথর্ব যে, পোপের সামনে একটা কলাগাছেরও মর্যাদা রাখেন না। মানুষ কর্তৃক এভাবে খোদার জিম্মী হতে পারার আকীদা-বিশ্বাসকে বালখিল্যতা ছাড়া আর কী বলে আখ্যা দেয়া যায় বলুন তো?

যুক্তি ও বাস্তবতার চশমায় পোপবাদ সম্পর্কিত উপরোক্ত বিশ্বাসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করায় আরও দেখা গেল ক্যাথলিকদের পোপবাদ তাদেরকে পাপবাদের দিকে অগ্রসর করেছে। পোপ যেকোন বৈধকে অবৈধ এবং যে কোন অবৈধকে বৈধ করার ক্ষমতা রাখেন এবং যেকোন পাপ ক্ষমা করার অধিকার রাখেন এই আকীদা-বিশ্বাস তাদেরকে পাপের পথে অগ্রসর করেছে। কেননা এতে করে খৃষ্টসমাজ অবলিলায় যে কোন পাপ করে যেতে পারে এই ভেবে যে, নজরানার বিনিময়েই তো পোপ থেকে এটার মার্জনা নিশ্চিত করা যাবে। পোপদের সম্পর্কে তাদের আরও যে বিশ্বাস যে, পোপ, বিশপ এবং ডিকনদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদেরকে চিরকুমার থাকতে হবে। (পোপ, বিশপ পাদ্রী, ডিকন প্রভৃতি খৃষ্টানদের বিভিন্ন স্তরের ধর্মপুরুষ বা ধর্মযাজকের নাম।) এ নীতি বা বিশ্বাসও তাদেরকে পাপবাদের দিকে অগ্রসর করেছে। এ প্রসঙ্গে সেন্ট বার্ণার্ড লিখেছেন–

"তারা চার্চ বিবাহের পবিত্র প্রথাকে নির্বাসন দিয়েছেন। যে সহবাস সর্বপ্রকার নোংরামী এবং অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র ছিল, এরা তাকেও

বিসর্জন দিয়েছে; তৎপরিবর্তে ছেলেদের, মা বোনদের সঙ্গে ব্যভিচার দ্বারা নিজেদের শয়ন-শয্যাকে নাপাক করেছে, অপবিত্র করেছে, সর্বপ্রকার নোংরামিতে ভরে দিয়েছে।" ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বিশপ জন সাট্স বার্গ বলেন,

"আমি অল্প সংখ্যক পাদ্রীই দেখেছি যারা স্ত্রীলোকদের সংগে অত্যধিক পরিমাণে ব্যভিচারে অভ্যস্ত নন। পাদ্রী স্ত্রীলোকদের ধর্মালয় বেশ্যালয় এবং ব্যভিচারের আড্ডাখানায় পরিণত হয়ে রয়েছে।"

এসব কথা স্মরণ আসার পর আর বেশিক্ষণ গীর্জার কাণ্ডকারখানা দেখার মনোবৃত্তি রইল না। মনে হল সবই বালখিল্যতা ও ভিত্তিহীনতা। যেন একটা প্রচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে আমি প্রবেশ করেছি। এই চশমা দিয়ে খৃষ্টধর্মের অন্যান্য নীতি-দর্শনগুলোকেও একটু পর্যবেক্ষণ করে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বয়ং খৃষ্টানদের বর্ণনায় যখন তাদের নীতি-দর্শনগুলোর অপকীর্তি ও অযৌক্তিতা স্বীকৃত হতে দেখলাম, তখন যুক্তি ও বাস্তবতার চশমায় আর সেগুলোকে দেখার কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট আছে বলে মনে হল না।

উল্লেখ্য, খৃষ্টধর্মের অনুসারীদেরই একটা বিরাট অংশ তাদের ধর্মের বহু মিথ্যা সংযোজন ও মিথ্যা উদ্ভাবন দেখে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। যারা "সংস্কারকৃত" খৃষ্টীয় সমাজ "প্রটেসট্যান্ট" (Protestant) নামে খ্যাত। তারা দাবি করে যে, তারা খৃষ্টীয় ধর্মের যাবতীয় মিথ্যা সংযোজন ও উদ্ভাবন বাদ দিয়ে আদি খৃষ্টীয় মতবাদ ও ধ্যান-ধারণাসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। তারা ধর্মের মধ্যে সংস্কারের দাবী করে বলে তাদেরকে "সংস্কারকৃত (reformed) খৃষ্টীয় সমাজ" বলা হয়। আর যারা আদিকালের খৃষ্টীয় রীতিনীতির উপর রয়েছেন বলে দাবী করেন, তাদেরকে বলা হয় "ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ। "ঐতিহ্যবাহী" খৃষ্টীয় সমাজ বলতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মসমাজ ও নিষ্ঠাবান প্রাচ্য চার্চ (অর্থোডক্স্ ইস্টার্ন চার্চ) প্রভৃতিকে বোঝানো হয়, যারা আদি কালের ধর্মমত, আচার ও অনুষ্ঠানসমূহকে রীতিমতভাবে সম্প্রসারিত ও উন্নত করে অনুসরণ করেন বলে দাবি করেন।

www.maktabatulabrar.com

ফকীর দর্শন

গীর্জা দর্শন শেষে মনস্থ করলাম চিড়িয়াখানা দর্শনে যাওয়া যাক। মনে হল জাতীয় চিড়িয়াখানা দর্শন ব্যতিরেকে সফরটি অপূর্ণ থেকে যাবে। মফস্বল বা গ্রাম বাংলার মানুষ ঢাকা এলে তাদের দর্শনীয় বিষয়ের তালিকায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তার মধ্যে চিড়িয়াখানা দর্শন হল অন্যতম। কেউ ঢাকা শহরে প্রথম এলে এখান থেকে গ্রাম বা মফস্বলে ফিরে যাওয়ার পর প্রথমেই তাকে যা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহল চিড়িয়াখানা দেখেছ তো?

শুধু মফস্বল বা গ্রাম বাংলা থেকে আগত মানুষ কেন, এই রাজধানী ঢাকায় নিত্য বসবাসকারী চিড়িয়াখানা দর্শনার্থীদেরও প্রতিদিন ভিড় হয় সেখানে প্রচুর। একবার দুবার নয়, তারা বহুবার চিড়িয়াখানায় যায়, মনে চাইলেই যায়। তাই এখানে প্রচণ্ড ভিড় লেগে থাকে। কেন তারা এত বারবার যায়? আসলে তারা চিড়িয়াখানা দর্শনে যায় বন্য পশু-পাখি বা বিচিত্র প্রাণী দেখে জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। এমনটি হলে তো দু একবার যাওয়ার পর আর যাওয়ার প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার কথা নয়। বরং তারা যায় নিছক বিনোদনের জন্য, ফুর্তি-ফার্তির জন্য, আড্ডা দেয়ার জন্য। তাই বিনোদন, ফুর্তি-ফার্তি ও আড্ডা দেয়ার চেতনা জাগ্রত হলেই তার একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করে তারা সেখানে যায়। বিষয়টা আমার কাছে আরও খোলাসা হল চিড়িয়াখানা সফরে আমার সঙ্গী ব্যক্তিটির নিকট একটা গল্প শুনে। গল্পটা তার একান্ত আপনজনের। একবার তারা কয়েকজনে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মনস্থ করলেন। ঘর থেকে রওয়ানা দিলেন। ইতিমধ্যে ঘনঘটা করে আচ্ছন্ন হয়ে আসা মেঘে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চিড়িয়াখানার খোলা অংগনে বিচরণ সম্ভব নয়। অগত্যা অন্য সকলে সিদ্ধান্ত নিল সিনেমা দেখতে যাওয়ার। স্পষ্টতঃই বুঝা গেল চিড়িয়াখানা দর্শন ও সিনেমা দর্শনকে তারা সমপর্যায়ভুক্ত মনে করে। অবশ্য সফরসঙ্গী ব্যক্তিটি তখন তাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে পৃথক হয়ে যান বলে তার বিবরণীতে প্রকাশ।

যাহোক চিড়িয়াখানায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে গীর্জা থেকে উল্টো দিকে ফার্মগেটের দিকে অগ্রসর হলাম। ওভারব্রিজ পার হয়ে পশ্চিম পারে সফর সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করার কথা। তিনি আসবেন যাত্রাবাড়ী থেকে। ওখানে একত্র হয়ে এক সংগে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পরিকল্পনা।

ব্রিজের উপর দিয়ে পার হচ্ছিলাম। এই ব্রিজ দিয়ে পার হতে গেলেই মনে পড়ে যায় একজন বিচিত্র ভিক্ষুকের কথা। আজও মনে পড়ল তার কথা। ব্রিজে তার সাক্ষাতও পেলাম। ভিক্ষুকটির একটি পা কাটা। এ ছাড়া সর্বাঙ্গ সুস্থ। সুঠাম দেহের অধিকারী। বেশ নাদুসনুদুস, হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু তা বুঝার উপায় নেই। সে তার মাথা, হাত, পা সর্বাঙ্গ ছেড়া-ফাটা চট ও নোংরা ছেড়া-ফাটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে সটাং চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। দেখলে মনে হবে কোন কুৎসিত রোগে আক্রান্ত মরণাপন্ন ব্যক্তি হয়ত। একদিন ফজরের পর ভোর হতেই ওখান দিয়ে যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় দেখেছিলাম তার আসল চেহারা। ক্রাস দিয়ে দিব্যি সুন্দর মত হেঁটে এসে সবেমাত্র বসে শরীরে ঐ সব চট, ন্যাকড়া ইত্যাদি পেঁচানো শুরু করেছে। আমি বললাম, এমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আপনি, কেন এমন ভ্যাং ধরে পড়ে থেকে ভিক্ষা করেন? লোকটা তখন মাস্তানী স্টাইলে চোখ গরম করে উল্টো আমাকে প্রশ্ন করল তাতে আপনার কী? বুঝলাম এখানে তার খুঁটির জোর আছে। নইলে একজন ভিক্ষুকের সুর এমন ঝাঁঝাল হতে পারে না।

আসলেও ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদেরও নাকি খুঁটির জোর আছে। তাদেরও নাকি গডফাদার আছে যারা তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, যেমন মাস্তানদেরকে তাদের গডফাদাররা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। বিনিময়ে ফকীরদের উপার্জনের একটা অংশ তাদেরকে বখরা দিতে হয়। এই বখরার বিনিময়ে তারা বিশিষ্ট ফকীরদেরকে জনসমাগমের বিশেষ বিশেষ স্থানে বসার সুযোগ করে দেয় এবং সব রকম ঝক্কি ঝামেলা থেকে তাদেরকে শেলটার দিয়ে থাকে। এমনও শোনা যায় একটা গং নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে এনে পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে দর্শনীয় লেংড়া, পঙ্গু বানিয়ে তাদের দ্বারা ভিক্ষা করিয়ে অধিক উপার্জনের মত নৃশংস পন্থাও গ্রহণ করে থাকে। খোদার এই বিচিত্র দেশে বিচিত্র আরও কত কিছু ঘটে কি জানি!

বেলা তখন সকাল নয়টা বেজে পনের মিনিট। চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সঙ্গীর আসতে আরও বিলম্ব হবে। মোবাইলে কথা বলে জানলাম তিনি ট্যাক্সিক্যাবে আরোহণ করে সায়েদাবাদে এসে ঢাকা শহরের নিত্য পরিচিত সেই জ্যামে আঁটকে শম্বুক গতির শিকার হয়ে পড়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

ইত্যবসরে ফকীরদের বিষয়টাকে বিভিন্ন চশমায় দেখে নেয়া যায় কি না ভাবছিলাম। ওভার ব্রিজের পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে সুস্থে বিষয়টাকে দেখতে শুরু করলাম।

প্রথমে চশমার ঝুলি থেকে বের করলাম কোমল হৃদয় সহজ সরল ধর্মপ্রাণ গণমানুষের চশমা জোড়া। চশমা জোড়া চোখে আঁটতেই ফকীরটির অসহায়ত্বের জন্য হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। চিন্তা জাগল আমিও এমন অসহায় হতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তেমন করেননি। বরং আমাকে করেছেন সহায়। মনের ধর্মীয় চেতনা উদ্বেলিত হয়ে বলল, এরূপ অসহায় লোককে দান করে বিপুল ছওয়ার অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌র বিপন্ন মাখলূককে সাহায্য করলে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। বিপদের সময় অসহায়ের পাশে দাঁড়ালে আমার বিপদের সময় আল্লাহ আমার পাশে দাঁড়াবেন। দান করলে ধন কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। পকেট থেকে যা কিছু সম্ভব ফকীরটির জন্য উজাড় করে দিতে মনে চাইল।

এরপর চোখে আঁটলাম সমাজতন্ত্রের চশমা। পাঠকদের হয়ত মনে আছে এ চশমা চোখে আঁটলে দেখা যায় সবকিছুর সমাধান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক নিয়মনীতির মধ্যে নিহিত। ঠিক তাই-ই হল। চশমা জোড়া চোখে আঁটতেই মনে হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে ফকীর ভিক্ষুক সমস্যা দূরীভূত হত। রাষ্ট্রই তখন সকলের অন্ন-বস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করত। এই সব ফকীর ভিক্ষুকদের এভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে হত না। একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান। ভিতর থেকে এই তন্ত্র-প্রেম উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠল। মনে হল সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার কোন বিকল্প নেই। সমাজতন্ত্রই হল সর্বহারাদের একমাত্র সহায়ক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাতে হবে। দেশে দেশে সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের চশমায় বাস্তবতার দিকটি দেখার ক্ষেত্রে অন্ধত্ব থাকায় এ দিকটি গোচরীভূত হল না যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে কাজ না করতে না পারলে তার বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। ফলে শ্রম দিতে অক্ষম নর নারীকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেমতে পঙ্গু, আতুর, লেংড়া, অন্ধ প্রভৃতিদেরকে ফায়ারিং স্কোয়াডে

পাঠিয়ে দেয়াই হল সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য সমাজতান্ত্রিক দেশের নিয়ম। সমাজতন্ত্রের চশমায় আরও একটি বিশেষ ত্রুটি হল তাতে রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের আকাল। ফলে এ বিষয়টিও ভেবে দেখা হয় না যে, তাহলে তাদের কি বেঁচে থাকারও অধিকার নেই?

এরপর চোখে আঁটলাম বুদ্ধিজীবীদের সেই বিচিত্র চশমা জোড়া। পাঠকবৃন্দ সম্ভবত ভুলে যাননি যে, এটি হল "এন্টি রিলিজন্ কোম্পানী লিমিটেড"-এর বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী আলেম উলামা বিদ্বেষী চশমা। যে চশমা চোখে আঁটলে কারণে অকারণে সব কিছুর জন্য আলেম, উলামা ও মোল্লা মৌলভীদেরকে দায়ী মনে হয়। এ চশমাআঁটা লোকগুলো তাই সকাল-সন্ধ্যায়, হাঁটতে বসতে, চলতে ফিরতে পদে পদে আলেম মৌলভীদেরকে কিছু গালী-গালাজ খয়রাত করতে না পারলে অন্তকরণে স্বস্তি বোধ করেন না। ফকীর মিসকীনদেরকে খয়রাত করতে তারা উদারহস্ত না হলেও আলেম মৌলভীদেরকে খয়রাত (গালী-গালাজ) করতে তারা বেশ উদারহস্ত। যাহোক এ চশমা চোখে আঁটতেই মনে হল এমনিভাবে সারাটা দেশ অসংখ্য ফকীর-মিসকীনে ভরে গেছে। এর পিছনে মৌলবাদীরাই দায়ী। নানান রকম হালাল হারামের ফতোয়া দিয়ে মৌলবাদীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। নইলে আজ দেশের এই চেহারা থাকত না। কোন ফকীর মিসকীন থাকত না। গোটা পৃথিবী যখন সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণে এগিয়ে চলছে, তখন এই মৌলবাদীরাই সুদকে হারাম ঘোষণা দিয়ে দেশকে পিছিয়ে রাখছে। গোটা পৃথিবীতে নারী পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর মৌলবাদীরা পর্দা ফরয ফতোয়া দিয়ে আমাদের সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরাই সমাজের উন্নতির পথে অন্তরায়। এরাই অগ্রগতির পথে বাঁধা। মৌলবাদ (ইসলাম) উৎখাত করতে না পারলে দেশের উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধিতে কেন যে একটা মোটা কথা ধরা পড়ে না তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। সে কথাটি হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয় সততা, দায়িত্ব নিষ্ঠা, দেশ প্রেম, ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর মাধ্যমে। আমাদের দেশে এই মহৎ গুণাবলীর অভাবই মূলত অর্থনৈতিক অভাবের কারণ, যা আমরা

www.maktabatulabrar.com

প্রতিনিয়ত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এবং দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যা উপলব্ধি করছে। আর আলেম সমাজ নীতি নৈতিকতার শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর মাধ্যমে মূলত সেই অভাব দূরীকরণের প্রচেষ্টাতেই রত আছেন। এ হিসাবে বিচার করলে আলেম সমাজই প্রকৃতপক্ষে উন্নতি-অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করে চলেছেন। আলেম সমাজ করছেন যেটা, তারা বুঝছেন তার উল্টোটা। উল্টো সমঝিলিরে রাম! আর পর্দা ব্যবস্থা তুলে দেয়া যদি উন্নতির সূচনা করত, তাহলে আমাদের দেশে অফিস-আদালতে আলেম সমাজের ফতোয়াকে নির্বাসন দিয়ে পর্দা ব্যবস্থা তুলে দেয়া সত্ত্বেও আজও কেন উন্নতি সাধিত হচ্ছে না? অফিস-আদালতে নারীদেরকে উলঙ্গ করে রাখলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে কীভাবে? তাতে বরং নিম্ন চাপেরই প্রবৃদ্ধি ঘটবে, যা কাজকে করবে আরও নষ্ট।

এরপর চোখে আঁটলাম মওদূদীবাদের চশমা। এ চশমার আবিষ্কারক মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। এ চশমা চোখে আঁটলে তাই দেখা যায় সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত। এ চশমা চোখে আঁটতেই মনে হল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রই এসব গরীব-মিসকীনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এদের দায়িত্ব গ্রহণ না করায় এরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। ইসলামী হুকুমতই করতে পারে এ সমস্যার সমাধান। ইসলামী হুকুমতের কোনো বিকল্প নেই। আর ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটাতে হবে। মনের ভিতরে শ্লোগান মোচড় দিয়ে উঠল– বিপ্লব বিপ্লব! ইসলামী বিপ্লব!!

কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক এদেরকে অর্থ-কড়ি দিলেই কি এরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হবে, যদি না এদের মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হয়? দুঃখজনক হলেও আমাদের দেশজ মানসিকতা বিষয়ক অভিজ্ঞতায় বলে তখন সহজ পন্থায় রাষ্ট্র থেকে অর্থ-কড়ি আদায় করার জন্য প্রকৃত ভিক্ষুক নয় এমন অনেকেও ভিক্ষুকদের খাতায় নাম লিপিবদ্ধ করাবে। আমরা এমন অনেক ভিখারী ভিখারিনীর কথা জানি, যারা গ্রাম থেকে শহরে এসে বা পরিচিত এলাকা ছেড়ে অপরিচিত স্থানে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে, অথচ গ্রামে নিজ এলাকায় তাদের প্রচুর জমাজমি আছে, পাকা বা সেমিপাকা

ঘরদোর আছে, একটা নয় একাধিক সমিতির সঙ্গে তারা জড়িত, যে সব সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে শত শত বা তার চেয়েও বেশি টাকা জমা দিতে হয়। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করছে না। তার কারণ হল ভিক্ষাবৃত্তি যে একটা জঘন্ন বিষয় এরূপ মানসিকতা তাদের গড়ে ওঠেনি, সম্মানজনক জীবন-যাপনের মানসিকতা তাদের গড়ে ওঠেনি।

এরপর চোখে আঁটলাম কাকরাইলের ছয় নম্বরের চশমা। এ চশমা চোখে আঁটলে জীবন জগতের তাবৎ সমস্যার সমাধান ছয় নম্বরের মধ্যেই নিহিত দেখা যায়। সবকিছুকেই এই ছয় নম্বরের ছকে ফেলানো যায়, হোক না তা টেনে হিচড়ে বা দুমড়ে মুচড়ে। এ চশমা চোখে আঁটা মাত্রই দেখলাম একরামুল মুসলিমীনের অভাবেই সমাজে গরীব-মিসকীন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। একরামুল মুসলিমীনের সূত্রে একজন মানুষের বিপদ-আপদে অন্যরা এগিয়ে এলে গরীব-মিসকীন সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হয়ে যেত।

কিন্তু পূর্বের বলা কথার আবারও পুনরাবৃত্তি করে বলছি, আমাদের দেশজ মানসিকতা বিষয়ক অভিজ্ঞতায় বলে একরামুল মুসলিমীনের প্রসার ঘটলেও সহজ পন্থায় অর্থ-কড়ি আদায় করার জন্য প্রকৃত বিপদগ্রস্ত নয় এমন অনেকেও বিপদের ভান করে অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটা কোন কাল্পনিক কথা নয়। আমাদের সমাজে একটা শ্রেণী মিথ্যামিথ্যি বিপদ- আপদের কথা বলে অর্থ আদায়ের পেশায় রীতিমত রত রয়েছে। তারা মানুষের সামনে এমন সব মানবিক কারণ তুলে ধরে, যা শুনলে মানুষ তাদেরকে সাহায্য করার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারে না। যদিও তা শতকরা একশতভাগই ভুয়া। এদের কেউ কেউ চিকিৎসার জন্য অর্থ-কড়ি চেয়ে থাকে। সঙ্গে রাখে বিভিন্ন রকম প্রেসক্রিপশন। কেউ কেউ নওমুসলিম হওয়ার কারণে পরিবারের কাছে নিগৃহীত হওয়ার কথা বলে সাহায্যের আবেদন জানায়। সঙ্গে রাখে কোর্টের এফিডেবিট। কেউ কেউ গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে এসে আত্মীয়ের বাসা খুঁজে না পাওয়ার কথা এবং বাড়িতে ফেরত যাওয়ার মত ভাড়া না থাকার কথা বলে কোন রকম ভাড়ার ব্যবস্থা হলেই চলে– এরকম আবেদন জানায়। কেউ কেউ কন্যার জন্য পাত্র ঠিক হওয়ার কথা বলে শুধু সামান্য কটা টাকার অভাবে বিবাহ হচ্ছে না বলে সাহায্যের জন্য হাত

www.maktabatulabrar.com

বাড়ায়। কেউ কেউ ব্যাগ ব্রিফকেস চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বলে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মত ভাড়া যোগাড়ের জন্য সাহায্য চায়। কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। লোকেরা হুশের ব্যবস্থা করলে বলে সব চুরি হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে যাওয়ার মত ব্যবস্থাও নেই, লজ্জায় কাউকে সাহায্যের কথা বলতেও পারিনি। এভাবে ভদ্রতা ও আভিজাত্যের ভাওতায় আরও বেশি এবং সহজে সম্মানের সঙ্গে কালেকশনের ব্যবস্থা করার কৌশল অবলম্বন করে। ইত্যাদি বহু রেডিমেট অজুহাত ও কলাকৌশল তারা মুখস্থ ও রপ্ত করে নিয়েছে। এ ধরনের পেশাজীবিদের অনেকেই বিভিন্ন মসজিদে নামাজের পর দাঁড়িয়ে তাদের সাজানো গোছানো বিপদ-মুসীবতের কথা এলান করে ঝটপট বাইরে গিয়ে গামছা রুমাল বিছিয়ে কালেকশনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অনেকেই হয়ত এ শ্রেণীর লোকদের ভুয়া হওয়ার অল্প-বিস্তর ঘটনা অবহিত আছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এক মসজিদে সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবত ইমামত করে আসছি। মসজিদটি হল পশ্চিম নাখালপাড়া বাইতুল আতীক জামে মসজিদ। ছাপড়া মসজিদ নামে এটি প্রসিদ্ধ। ইমাম হওয়ায় আমার সামনে এমন বহু ঘটনাই এসে থাকে। আমার সামনে মিথ্যা প্রতীয়মান হওয়া অসংখ্য ঘটনার মধ্যে ছোট ছোট দু একটা ঘটনা উল্লেখ করছি।

একদিন আসরের পর মসজিদের বারান্দায় বসে আছি। ইতিমধ্যে একজন অন্ধ এল। বলল, হুজুর! আমি একজন অন্ধ হাফেজ। আগারগাও এক হেফজখানায় শিক্ষকতা করি। বিশ্বাস করুন লজ্জায় বলতে পারছি না। সামান্য কয়টা টাকার অভাবে আমার মেয়েটাকে বিবাহ দিতে পারছি না। যদি আপনি মুসল্লীদের বলে আমার জন্য একটু ব্যবস্থা করে দিতেন! আমার মনে পড়ল কয়েক বৎসর পূর্বে এই একই অজুহাতে সে এই মসজিদে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মেয়ে কজন? বলল, একজন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কয়েক বৎসর পূর্বে এই কথা বলেই এই মসজিদ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন না? সে বলল, হুজুর, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর কখনও এ মসজিদে আসিনি। আমি আল্লাহ্‌র কালামের হাফেজ, আমি মিথ্যা বলি না। ইত্যবসরে আমার মসজিদের মুয়াজ্জিন বাইরে থেকে এল। সে দূরের থেকেই জোর গলায় ডাক দিয়ে বলল, কি হাফেজ সাহেব! মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন? আমি জিজ্ঞাসা

করলাম কি হাফেজ সাহেব! আমার মুয়াজ্জিন কী বলে? লোকটা তখন মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তাকে মৃদুমন্দ কিছু বকুনি দিয়ে বিদায় করে দিলাম।

আর একটি ছোট্ট ঘটনা। মাত্র মাস খানেক পূর্বের ঘটনা। লম্বা পাঞ্জাবী পরিহিত দাড়ি টুপি বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক এসে বলল, হুজুর! আমি একজন হাফেজে কুরআন। একটা এক্সিডেন্টে মাথায় আঘাত পেয়ে এখন পরিষ্কার করে কথা বলতে পারি না। তাই পূর্বে এক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতাম এখন তা আর করতে পারছি না। আমার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিলে সারা জীবন আপনার কৃতজ্ঞ থাকব। আমি বললাম, আপনি হাফেজ কি না তা একটু পরীক্ষা নিয়ে দেখি? কুরআন শরীফের কোন স্থান থেকে পড়তে বলি? সে বলল, হুজুর আপনি কি বলছেন তা আমি কানে শুনতে পাই না। এক্সিডেন্টে আমার কানও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম, যাহোক এ ধরনের এক শ্রেণীর পেশাদার লোক বের হওয়ায় মসজিদে সাহায্যের জন্য কারও পক্ষে আবেদন জানানো আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার পক্ষে আপনার জন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। লোকটি তখন বলল, তাহলে আমিই নামাজের পর দাঁড়িয়ে বলি? তখন আমি বললাম, তাহলে তো আপনি কানে শুনতে পান। নইলে আমি বলতে পারব না– এ কথাটি আপনি শুনলেন কীভাবে? না শুনলে কেন বললেন, তাহলে আমিই নামাজের পর দাঁড়িয়ে বলি? এভাবে হাতেনাতে তার প্রতারক হওয়ার বিষয়টা ধরা পড়ে যাওয়ায় কিছু মুসল্লী তাকে উত্তম মাধ্যম দিতে চাইলেও কেউ কেউ তাদেরকে নিবৃত্ত করে বকুনি ঝকুনি দিয়েই তাকে বিদায় দেয়া হল।

এ সমস্ত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তাই মনে হয় শুধু রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় গরীব-মিসকীনদের পুনর্বাসিত করতে যাওয়া বা ব্যক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা ও একরামুল মুসলিমীনের মাধ্যমে গরীব-মিসকীন সমস্যার সমাধান বের করা কোনটিই এককভাবে এ সমস্যার সমাধান রচনা করতে পারবে না। বিশেষত উক্ত শ্রেণীর বর্তমান মানসিকতা অপরিবর্তিত থাকা পর্যন্ত।

এ সমস্যার সমাধান কি তা উদঘাটন করার জন্য সবশেষে একজোড়া ইসলামী গবেষণার চশমা চোখে আঁটলাম। এ চশমায় দেখা গেল এ সমস্যার সমাধানের জন্য যা যা করতে হবে তা হল–

www.maktabatulabrar.com

১. এর জন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, ব্যক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা ও একরামুল মুসলিমীনের প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েও প্রধানত যেটা প্রয়োজন তা হল মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো। ভিক্ষাবৃত্তি যে একটা জঘন্ন বিষয়– এরূপ মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। সম্মানজনক জীবন-যাপনের মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। শ্রম ও মেহনতের মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। মনে পড়ে গেল নবীজীর কাছে আগমনকারী সেই দরিদ্র লোকটির ঘটনা, যার একমাত্র সম্বল কম্বল বিক্রি করে নবীজী তাকে কুড়াল ক্রয় করে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহপূর্বক তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহের পথ বলে দিয়েছিলেন। পরের কাছে হাত পাতা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণের জন্য এই মানসিকতা সৃষ্টি করাই হল প্রধান বিষয়।

নবীর শিক্ষা কর না ভিক্ষা
মেহনত কর সবে।

২. যারা শারীরিকভাবে উপার্জন করতে সক্ষম, তাদেরকে ভিক্ষা প্রদান থেকে বিরত থাকা। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে একটা হাত বা একটা পা না থাকা মানুষও উপার্জন করতে সক্ষম। এ পর্যায়ে আমার শুধু মনে পড়ে খুলনা সোনাডাংগা বাসস্ট্যান্ডে এক হাত কাটা একজন লোকের পান দোকান চালানোর কথা। আরও মনে পড়ে ঝিনেইদহ এলাকায় বাসের মধ্যে এক হাত ও এক পা কাটা একটা ছেলের গলায় চকলেটের ব্যাগ ঝুলিয়ে বিক্রি করার দৃশ্য। এ জাতীয় লোকদের ভিক্ষা প্রদান বন্ধ করলে একটা বিরাট ভিক্ষুক গোষ্ঠি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে মাসআলার আলোকেও এরূপ উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে ভিক্ষা প্রদান বৈধ নয়।

৩. মসজিদে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে সাহায্য চাইতে না দেয়া। ফেকাহ্‌র কিতাবে এরূপ লোকদেরকে দান করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়াই যুক্তিসংগত। আল্লাহ্‌র দরবারে এসে বান্দার কাছে চাওয়া বেমানান ও তা এক হিসাবে আল্লাহ্‌কে অবমাননার শামিল বিধায় নিঃসন্দেহে গর্হিত।

ইতিমধ্যে আমার চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সঙ্গীটি এসে পৌঁছলেন। বেলা তখন প্রায় ১০টা। বেশ দেরী হয়ে গেছে। আর বিলম্ব না করে একটা কাল ট্যাক্সিক্যাব ঠিক করে চিড়িয়াখানার উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

চিড়িয়াখানা দর্শন

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। দিনটি ছিল ১৫ই জুন ২০০৪ ইং। মিরপুর বক্সনগরের চিড়িয়াখানার কাছে আমরা উপনীত হলাম। গেট থেকে একটু দূরেই ট্যাক্সিক্যাবটি আমাদের নামিয়ে দিয়ে ইউটার্ন নিয়ে পিছনের দিকে ফিরে গেল। কথা ছিল গেটের সন্নিকটে গেলে ১০ টাকা ভাড়া বেশি দিতে হবে। কারণ গেটের সন্নিকটে গেলে গাড়িওয়ালাকে ১০ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। সেই দশ টাকা সে আমাদের যাত্রীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চাইল। আমরা সে অনাকাঙ্খিত ভার বহনের সৎসাহস না দেখিয়ে অগত্যা একটু দূরেই নেমে পায়ে হেঁটে গেটের দিকে অগ্রসর হলাম। উল্লেখ্য, চিড়িয়াখানার গেট পর্যন্ত গিয়েই রোডটি শেষ হয়েছে। তারপর ইউটার্ন নিয়ে আবার পিছনের দিকে ফিরে আসতে হয়। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ কেন এই অতিরিক্ত ১০ টাকা আদায় করছেন, তার সদুত্তর হয়ত তারাই ভাল দিতে পারবেন। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা সুযোগ সন্ধানী অসাধু ব্যবসায়ীদের মত ঠেকায় ফেলে বেশি মাশুল আদায় করার মতই মনে হল। প্রবেশ করতেও দর্শকদেরকে মাথা পিছু ১০ টাকা করে দিতে হয়। চিড়িয়াখানাকে একটি জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মূল্যায়ন করলে এখানে প্রবেশ মূল্য না থাকাই সংগত ছিল। এখানেও ব্যবসায়ী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। শুধু এখানেই নয় চিড়িয়াখানার ভিতরে গিয়েও দেখলাম ব্যবসায়ী মনোভাবের উলংগ চর্চা। চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করতে দর্শক প্রতি যে ১০ টাকা প্রবেশ মূল্য ধার্য রয়েছে, তার বাইরেও দর্শকদের থেকে আরও টাকা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ভিতরে রয়েছে একটি মিনি যাদুঘর। এই যাদুঘরে প্রবেশ করতেও দর্শক প্রতি ৩ টাকা করে দিতে হয়। হয়ত এখানে গরীব দেশে চিড়িয়াখানার পরিচালনা ও পরিচর্যা ব্যয় উসূলের অজুহাত দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সেটা প্রকৃত কারণ বলে মনে হবে না। বরং এর পিছনে যে নিছক ব্যবসায়ী মনোভাব

www.maktabatulabrar.com

কাজ করছে তা-ই বুঝা যাবে এ যাদুঘরের টিকিট ক্রয়ের জন্য যেভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে দর্শকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে তা থেকে। তাদের সেসব ভাষা ও আহবানকে রীতিমত ভাঁড়ামি বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাদের সেসব ভাষা ও আহবানকে অনেকটা তুলনা দেয়া যায় নাট্যমঞ্চ বা যাত্রাশালার জন্য প্রচারিত আহবানের সঙ্গে। কর্তৃপক্ষই যদি নীতি ব্যবহার দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূল্যায়ন করতে না শেখান, তাহলে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে সে মনোভাব জাগ্রত হবে কীভাবে? তাই বলেছিলাম, অনেক দর্শকই চিড়িয়াখানা দর্শনে যায় বন্য পশু-পাখি বা বিচিত্র প্রাণী দেখে জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। বরং তারা যায় নিছক বিনোদনের জন্য, ফুর্তি-ফার্তির জন্য, আড্ডা দেয়ার জন্য। বিনোদন, ফুর্তি-ফার্তি ও আড্ডা দেয়ার চেতনা জাগ্রত হলেই তার একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করে তারা সেখানে যায়। এ মনোভাব সৃষ্টি ও লালিত হওয়ার পশ্চাতে কর্তৃপক্ষের আচরিত নীতি ব্যবহারেরও কিছুটা ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হল।

যাহোক আমরা চিড়িয়াখানার গেটে গিয়ে পৌঁছলাম। এটি হল আমাদের জাতীয় চিড়িয়াখানা। ইংরেজিতে বলা হয় National joo। অভিধানে চিড়িয়াখানা-এর অর্থ লেখা হয়েছে পশুশালা, পশুপক্ষীশালা। ইংরেজী লড়ড় শব্দের অর্থও করা হয়েছে পশুশালা, চিড়িয়াখানা। "চিড়িয়াখানা" শব্দটি হিন্দী ও ফার্সী শব্দযোগে গঠিত হয়েছে। হিন্দীতে "চিড়িয়া" অর্থ পাখি, পক্ষী, আর ফার্সীতে "খানা" অর্থ ঘর, শালা। আভিধানিক এ অর্থ হিসাবে চিড়িয়াখানা-র অর্থ হয় পাখির ঘর বা পক্ষীশালা। এখন যদি চিড়িয়াখানা শব্দটির অর্থ করা হয় পশুশালা, তাহলে সে অর্থ চিড়িয়াখানা শব্দের মূলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না। আর যদি অর্থ করা হয় পক্ষীশালা, তাহলে তাও হবে অপূর্ণাঙ্গ। কেননা চিড়িয়াখানায় শুধু পাখি নয় আর বহু ধরনের জীবজন্তু বর্তমান থাকে। এ হিসাবে চিড়িয়াখানা শব্দটি প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা জ্ঞাপনে অপূর্ণাঙ্গই থেকে যাচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই বাংলা অভিধানে চিড়িয়াখানা-র অর্থে একটু ব্যাপকতা আনয়নের জন্য লেখা হয়েছে পশুপক্ষীশালা। কিন্তু "পশু" শব্দ যোগ করা দ্বারা এই ব্যাপকতা সাধন করার পরও প্রকৃত ও যথার্থ অন্তর্ভুক্তি সাধিত হয়নি। কেননা পশু শব্দের অর্থ চতুষ্পদ ও লাঙ্গুল (লেজ) বিশিষ্ট জীব। এ শব্দটি

চিড়িয়াখানা-র অর্থে পাখির বাইরে চার পা বিশিষ্ট অনেক প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করবে বটে, তবে পাখির বাইরে চার পা বিশিষ্ট নয় এমন অনেক প্রাণী থেকে যাবে যেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে না, অথচ চিড়িয়াখানায় সেগুলো বর্তমান থাকে। যেমন– হাঙ্গর, কুমির, মাছ, সাপ ইত্যাদি কত কিছু। এ সব কিছুর প্রেক্ষিতে মনে হয় চিড়িয়াখানা না বলে প্রতিশব্দ হিসাবে যদি জীবখানা, প্রাণীশালা, কিংবা প্রাণী-পার্ক ইত্যাদি ব্যবহার করা হত, তাহলে সেটি হত যথার্থ পরিভাষা। এর মধ্যে "প্রাণীপার্ক" শব্দটি সবচেয়ে যথার্থ বলে মনে হয়। কারণ চিড়িয়াখানা শুধু বিভিন্ন রকম জীবজন্তুর থাকার ঘরই নয়, সেখানে গণমানুষের খোলামেলা বিচরণ, সর্বসাধারণের পরিদর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদি ভাবার্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'জীবখানা', 'প্রাণীশালা' শব্দদ্বয় এ অর্থ জ্ঞাপনে পারঙ্গম নয়। পক্ষান্তরে "পার্ক" শব্দটি এর জন্য অত্যন্ত যুৎসই। ইংরেজী অভিধানে joo (চিড়িয়াখানা) শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এরূপ ব্যাপকতা আনয়নের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়েছে a park in which living animals are kept for public exhibition ঃ অর্থাৎ, joo বা চিড়িয়াখানা হল এমন এক ধরনের পার্ক, যেখানে জীবন্ত প্রাণীদেরকে সর্বসাধারণের প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

যাহোক 'চিড়িয়াখানা' শব্দ নিয়ে আর বেশিক্ষণ না ভেবে টিকিট সংগ্রহ করে দু'জনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে দেখলাম দেশী বিদেশী অনেক ধরনের পশু, পাখি, সরীসৃপ ও জলজ প্রাণী। এর মধ্যে ভিতরে প্রবেশ করার পর প্রথমেই সামনে এল বানরের খাঁচা। এই খাঁচার পাশেই দর্শনার্থীদের উৎসুক ভিড় হয়ে থাকে বেশি। বানরের নানা রকম বাঁদরামি দেখে দর্শনার্থীগণ বেশ ইনজয় করেন বলে মনে হল। বিশেষত ফুর্তি-ফার্তির জন্য যারা এখানে আগমন করেন, তারা শুরুতেই ফুর্তির আমেজে মজে ওঠেন।

প্রথমেই কেন বানরের খাচা? আবারও সেই পুরাতন কথায় আসতে হল চিড়িয়াখানা কি বিচিত্র সব বন্য পশু পাখী ও প্রাণী দেখে জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে না কি নিছক বিনোদনের জন্য, ফুর্তি-ফার্তির জন্য, আড্ডা দেয়ার জন্য? প্রথমেই বানরের খাঁচা রেখে দর্শকদেরকে কাতুকুতু দিয়ে সেই বিনোদন ও ফুর্তি-ফার্তির চেতনাকেই কি জাগ্রত করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে না কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এরূপ করা

www.maktabatulabrar.com

হয়েছে? না কি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই কাকতালীয়ভাবে এমনটি হয়ে গিয়েছে? শেষোক্ত সম্ভাবনাটি খুব ক্ষীণ বলে মনে হল এ কারণে যে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে গঠিত ও পরিচালিত নানান দেশী বিদেশী প্রাণীর এই মহাব্যবস্থাপনার পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা অনুপস্থিত তা খুব সহজে মেনে নেয়া যায় না। এর পশ্চাতে প্রাণীদের নিয়ে যাদের কারবার সেই প্রাণী বিজ্ঞানীদের নিশ্চয়ই কোন ভাবনা কাজ করেছে। সে ভাবনাটি কি হতে পারে তা ভেবে দেখে মনে হল ডারউইনের প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ মতবাদের চেতনা এর পশ্চাতে কাজ করে থাকতে পারে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা সংগত যে, ডারউইনের প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত মতবাদকে বলা হয় বিবর্তনবাদ বা জৈবিক বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)। এই মতবাদ অনুসারে আমরা বর্তমানে যে সকল বৈচিত্র্যময় প্রাণী লক্ষ্য করছি, তাদের উৎপত্তি কোন এক বিশেষ সময়ে হয়নি, বরং একটা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে জীবকুল এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এমনকি মানুষও এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। ডারউইন মনে করেন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর জীব থেকে ধীরে ধীরে এক দীর্ঘ ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে। এই বিবর্তনের ধারায় নিম্ন শ্রেণীর জীব উন্নতি লাভ করে এক পর্যায়ে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয়। অতঃপর তা তাদের আকার পরিবর্তন করে মানুষে পরিণত হয়। সংক্ষেপে মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, ডারউইনের বিবর্তনবাদী মতবাদ অনুসারে বানর হল মানুষের পূর্বসূরী। আরও উল্লেখ করতে হয় যে, ডারউইনের এই মতবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হওয়া স্বত্ত্বেও এখনও প্রাণী বিজ্ঞানীদের সিংহভাগ এ মতবাদে বিশ্বাস করে চলেছেন। এমনকি সাধারণ মুসলমানসহ ধর্মীয় জ্ঞানের শূন্যতা বা স্বল্পতা বিশিষ্ট শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেও এই মতবাদে বিশ্বাস করে চলেছেন। যদিও ডারউইনের মতবাদে ধর্মীয় বিশ্বাসকে চরমভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করায় এ মতবাদটা একটা সন্দেহাতীত কুফ্রী মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাই সন্দেহ হল ডারউইনের প্রাণী জগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী প্রাণী বিজ্ঞানীগণ বা তাদের ভাবশিষ্যগণই চিড়িয়াখানার প্রবেশ মুখে বানরের

খাঁচা রাখার ব্যবস্থা করেছেন কি না, যাতে দর্শনার্থীগণ প্রবেশ মাত্রই তাদের মহান (?) পূর্বসূরীদের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন ! এ মতবাদে বিশ্বাসী দর্শনার্থীগণ এই খাঁচার পাশে এসে নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন যে, আমরা মানুষ জাতি এদের থেকেই সৃষ্ট। হয়ত মনে মনে বানরের সব কিছুর সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য খুঁজেও বের করতে সচেষ্ট হবেন। এমনও শোনা যায় এ শ্রেণীর লোকেরা সাদৃশ্য খুঁজতে যেয়ে বানরের মত নিজের লেজ দেখতে না পেয়ে নিতম্বের ফাটলের উপরে মেরুদণ্ডের হাড়ের অগ্রভাগে হাত দিয়ে এখানকেই খসে যাওয়া লেজের গোড়া মনে করে নিজের বিশ্বাস করা মতবাদের স্বপক্ষে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। সাবাশ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী লোকদের দলীল সন্ধান প্রচেষ্টা! এমন অকাট্য দলীল সঙ্গে থাকা স্বত্ত্বেও কীভাবে যে তারা তাদের মহান পূর্বসূরীদের এমনভাবে খাঁচার বন্দীদশাকে মেনে নেন, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

যাহোক বানরের খাচা দেখার পর প্রায় সুদীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে গোটা চিড়িয়াখানার আদ্যোপান্ত ঘুরে ঘুরে একে একে দেখলাম দেশী বিদেশী অনেক ধরনের পশু, পাখি, সরীসৃপ ও জলজ প্রাণী।

পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেখা হল সিংহ (গুজরাটে প্রাপ্ত ভারতীয় সিংহ), রয়েল বেংল টাইগার, বাঘ, ভল্লুক, মেছো বাঘ, হনুমান, শিম্পাঞ্জী, গণ্ডার, বিশাল শিং বিশিষ্ট গয়াল, ওয়াল্ডিবিষ্ট, সপিবালি গরু, ভূটানী গরু, জেব্রা, বেবুন, নানান প্রজাতির বানর (সাধারণ বানর, সোনালী বুক বানর), উল্লুক, শিয়াল, খেঁক শিয়াল, বাগদাস, নানান প্রজাতির হরিণ (চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, সাম্বার হরিণ), হাতি, টাপির, নানান প্রজাতির কুকুর ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে প্রায় সব প্রাণীই নীরব নিথর হয়ে যার যার খাঁচা বা মঠে পড়ে আছে বা নিস্তরঙ্গ চলাচল করছে। মাঝে মধ্যে সিংহ এই নিরবতা ভঙ্গ করে দু একটা গর্জন তুলে তার রাজকীয় গাম্ভীর্য ব্যক্ত করে যাচ্ছে। দু একটি প্রাণী তার ঘুমের কক্ষ থেকে বের না হওয়ায় দর্শকগণ তাদের খাঁচা বা মঠের কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম দেখলাম শিম্পাঞ্জী-র বিষয়টা। তার খাঁচার কাছে গিয়ে দর্শকগণ তাকে দর্শনীয় স্থানে না পেয়ে চুপচাপ ফিরে যেতে রাজী নয়। দেখলাম নিদ্রা কক্ষ থেকে তাকে রেরিয়ে আনার জন্য তারা নানান রকম বুলি বচন ছুড়ে

www.maktabatulabrar.com

মারছে। শেষ নাগাদ একটি শিম্পাঞ্জী তার যারপর নাই কৃষ্ণ ও কদাকার চেহারাখানি বের করে ভোংচি দিলেই কেবল দর্শকগণ নিবৃত্ত হলেন। শিম্পাঞ্জীর প্রাপ্তিস্থান হল কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, কংগো নদীর ভাববাহিকাসহ আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা। এটি হল প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে খবীছ প্রাণী, যে তার নিজের বিষ্টা নিজেই আহার করে। আর নির্লজ্জতার যে কতটা চরম তা না দেখলে কাউকে বলে বোঝানো দায়। এখানে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় আবারও আমাকে সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়ে দিল চিড়িয়াখানা দর্শনের উদ্দেশ্য কী?

পাখির মধ্যে বিশেষ বিশেষ যেগুলো দেখলাম তা হল– ফ্লেমিংগো (বক জাতীয় পাখি), সারস, হাড়গিলা, উট পাখি, কেশোয়ারী, গিনিপিগ, শকুন (দেশীয়), সিনারাস ভালচার (অতিথি শকুন), কুড়া/কুড়াল, বাজ, তিলাবাজ, সোনালী মথুরা, লেডিএ্যামহার্স্ট ফিজেন্ট, সিলভার ফিজেন্ট, ইমু (অষ্ট্রেলিয়ান), সোনালী ময়না, মোলাকান কাকাতুয়া, হীরামন, শিনবাজ মুনিয়া, রাজ ধনেশ, মদনটাক, নানা প্রজাতির ময়ূর ইত্যাদি। দিনটি মেঘলা থাকায় ময়ূরের পেখম মেলা ও বন্ধ করার অপরূপ দৃশ্য কয়েকবার দেখার সুযোগ ঘটে গেল।

জলচর বা উভচর প্রাণীর মধ্যে দেখলাম লোনা পানির কুমির, ইশ্চুরাইন কুমির, ভোঁদড়, জলহস্তি ইত্যদি। ভোঁদড়ের ক্যা ক্যা চিৎকার বেশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে। আর সরিসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে নানান প্রজাতির সাপ (লাউডগা, অজগর, কোবরা, সংখিনী, কিং স্নেক), সজারু ইত্যাদি। প্রাণী জাদুঘরে দেখলাম বিভিন্ন পশু, পাখি, সরিসৃপ ও মাছের মমি করা দেহ এবং বিভিন্ন পাখির ডিম। আর ফিস এ্যাকুরিয়ামে রয়েছে বিদেশী বিরল প্রজাতির কয়েক প্রকারের মাছ।

প্রাণী জগৎ এক বিচিত্র জগৎ। আল্লাহ্র সৃষ্ট বিচিত্র সব প্রাণী। তাদের সম্বন্ধে রয়েছে বিচিত্র সব তথ্য ও তত্ত্ব। প্রাণী বিজ্ঞানীগণ হয়ত সে সম্বন্ধে এত খানিকটা অবগত আছেন যা অন্যদের পক্ষে অবগত থাকা স্বাভাবিক নয়। প্রত্যেকটা প্রাণীর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন জীবন-পদ্ধতি। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ দর্শকদেরকে এর কিছুটা অবগত করানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তারা একেবারেই যে কিছুই করেননি, তা নয়। তবে যা করেছেন তা নিতান্তই অপ্রতুল বা

বলা চলে দায়সারা গোছের। মাঝে মধ্যে দুই একটা প্রাণীর খাঁচা বা মঠের সঙ্গে এক চিলতে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাণী সম্বন্ধে ছিটে ফোটা কিছু তথ্য লিখে রাখা হয়েছে। যা দেখে আগ্রহী দর্শকগণ কিছুটা অবগতি অর্জন করতে পারেন। এ রকম বিভিন্ন সাইনবোর্ডে যে সব আকর্ষণীয় তথ্য ও তত্ত্ব দেখতে পেলাম তার মধ্যে কয়েকটি তথ্য ও তত্ত্ব পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

উট পাখি হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাখি। এরা নামে উট কিন্তু বোঝা বহন করতে সক্ষম নয়। আবার নামে পাখি, কিন্তু উড়তে সক্ষম নয়। প্রবাদ আছে উট পাখিকে যদি বলা হয় তুমি উড়াল দাও, তাহলে সে বলে আমি তো উট, আর যদি বলা হয় তবে বোঝা বহন কর, তাহলে সে বলে আমি তো পাখি। তবে উড়তে না পারলেও এত দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম যে, প্রায় উড়ার কাছাকাছি। ঘণ্টায় প্রায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার দৌড়াতে পারে। এদের এক একটির ওজন হয় ১০০ থেকে ১৬০ কেজি পর্যন্ত। আয়ু ২০-২৫ বৎসর। কেনিয়া, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে উট পাখি পাওয়া যায়।

গণ্ডার সম্পর্কে তথ্য লেখা আছে এ প্রাণী ভারত ও নেপালে পাওয়া যায়। এদের গড় ওজন ২০০০ থেকে ৩০০০ কেজি। গড় আয়ু মাত্র ২৫ থেকে ৩০ বৎসর। অথচ কায়ার বিচারে গণ্ডার চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। যার চামড়া দিয়ে বুলেট ভেদ হয় না– গায়ে গতরে এত শক্ত। তার ২৫ থেকে ৩০ বৎসর আয়ু খুব কম বৈ কি? ভেবেছিলাম এর চামড়া সম্বন্ধে কিছু তথ্য লেখা থাকলে খুব মজা হত। দেখলে মনে হয় এটি তো চামড়া নয় যেন একটা শক্ত ত্রিপল কয়েকভাজে পুরু করে তার গায়ের উপর এলোমেলো বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এরূপ চামড়া হওয়ার কারণেই "গণ্ডারের চামড়া" বলে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। রসিক মানুষের কাছে প্রবাদ আছে– গণ্ডারকে কাতুকুতু দিলে নাকি ছয় মাস পরে হাসি দেয়। অর্থাৎ, কাতুকুতুর অনুভূতি তার চামড়া ভেদ করে তলে পৌঁছতে ছয় মাস লেগে যায়। এ জন্যই সহজে কারও মধ্যে কথার প্রভাব না হলে বলা হয় একেবারে গণ্ডারের চামড়া।

ছিটেফোটা আরও যে সব তথ্য জানতে পারলাম তা হল লোনা পানির কুমির সর্বোচ্চ ১০০ বৎসর আয়ু পায়। শকুনও বাঁচে ১০০ বৎসর।

www.maktabatulabrar.com

জানতে পারলাম পৃথিবীর অন্যতম আক্রমণকারী পাখি হল কাকাতুয়া। এটি পোষ মানলেও ঠোকর মারার অভ্যাস বর্জন করে না। সময় সুযোগ পেলেই ঠোকর মারতে ভুল করে না। এমনকি ঠোকর মারার ক্ষেত্র না পেলে নিজের খাঁচা বা ঘরের দেয়াল ফ্লোরেই ঠোকর মেরে তার চঞ্চুকে প্রশমিত করতে থাকে।

সবচেয়ে সুন্দর লাগল জেব্রা। আকৃতি ঘোড়ার মত। দেখতে অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র স্বভাবের। সারা গায়ে নিখুঁতভাবে কাল কাল ডোরা টানা। দেখলে মনে হয় কোন সুদক্ষ শিল্পী নিপুণ হস্তে তার সারা গায়ে তুলি দিয়ে ডোরাগুলো এঁকে রেখেছে। মনে পড়ল কুরআনের একটি আয়াত "ফাতাবারাকুল্লাহু আহছানুল খালিকীন"। অর্থাৎ, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

চিড়িয়াখানা এবং চিড়িয়াখানার প্রাণীগুলোকে কে কোন্ চশমা দিয়ে দেখেন, তার কিছুটা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি। যার সারকথা হল সিংহভাগ দর্শকই চিড়িয়াখানাকে একটি বিনোদন কেন্দ্র আর প্রাণীগুলোকে বিনোদনের গিনিপিগ হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। হয়ত প্রাণী বিজ্ঞানের চশমায় দেখলে এই বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ অনেক কিছুই দেখতে পান, যা আমাদের মত সে বিজ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখতে পায় না।

তবে ইসলামের চশমায় আমরা যা দেখতে পাই তা হল– চিড়িয়াখানা নামক পশুশালায় প্রাণীদেরকে আবদ্ধ রেখে এ সব স্বাধীন প্রাণীর স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতাকে খর্ব করার অধিকার কারও নেই। সেমতে স্বাধীন প্রাণীদেরকে পরাধীন করে রাখার অধিকারও নেই কারও। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু মানুষের নয় প্রাণীদের স্বাধীনতাও ইসলামে স্বীকৃত। স্বাধীন মানুষকে যেমন পরাধীন করে রাখা জায়েয নয়, তাই বিনা অপরাধে কাউকে জেল হাজত দেয়া বৈধ নয়, বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে কাউকে বন্দী করে রাখাও অবৈধ, তদ্রূপ প্রাণীজগতের স্বাধীনতাও ইসলামে স্বীকৃত। অতএব বিনোদনের অজুহাতে প্রাণীদেরকে আবদ্ধ করে রাখা তথা তাদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করাও বৈধ নয়। এমনকি বাসা বাড়িতে টিয়া, ময়না, কাকাতোয়া, মুনিয়া, শালিক ইত্যাদি পাখিকে খাঁচাবন্দী করে

রাখাও ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এভাবে প্রাণীদেরকে শখের পাঠাবলী বানানো জায়েয নয়।

সারকথা, ইসলামের দৃষ্টিতে চিড়িয়াখানা হল প্রাণীজগতের জন্য এক জেলখানা; বিনা অপরাধে শখের বশবর্তী হয়ে যেখানে প্রাণীদের স্বাধীনতাকে হরণপূর্বক তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এটি হল এক অবৈধ জেলখানা, প্রাণী জগতের জন্য এক নিষ্ঠুর কারাগার। প্রাণী জগতের স্বাধীনতার বিষয়কে খর্ব করে দেখার কারণেই এ দিকটি কেউ বিবেচনা করে দেখেন না। প্রাণী জগতের অধিকারকে বিবেচনায় না আনার ফলেই এটিকে কোন বিবেচ্য বিষয় হিসাবে নজরে আনা হয় না। ইসলাম প্রাণী জগতের শুধু স্বাধীনতাই নয় তাদের সব রকম যুক্তিগত অধিকারকেই স্বীকার করে। তাই বিনা কারণে কোন পাখীর বাসা ভেঙ্গে দিতেও হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বিনা কারণে কোন প্রাণীকে মারধর করাও ফেকাহ্‌র কিতাবে নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামের চশমায় চিড়িয়াখানা দর্শনের পর ওখানকার প্রাণীদের প্রতি করুণা জাগ্রত হল। মনে হল এক নিষ্ঠুর কারাগারে এসে বন্দীদের দেখে আমরা ইনজয় করার চেষ্টা করছি। এ এক নিষ্ঠুর কর্ম। এ আনন্দ বিকৃত আনন্দ। কারও করুণ দশা দেখে আনন্দ উপভোগ করা যদি বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক বলে আখ্যায়িত হয়, তাহলে চিড়িয়াখানার বন্দী প্রাণীদের দেখে আনন্দ উপভোগ কেন বিকৃত চর্চা বলে অভিহিত হবে না? মনটা বিষন্ন হয়ে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ হাঁটাহাঁটির ক্লান্তি, সেই সঙ্গে যোগ হল মনের বিষন্নতা। ভারাক্রান্ত দেহ মন নিয়েই চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। মনটা এতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল যে, বিভিন্ন মতবাদের চশমায় জগতকে দেখার জন্য চশমার ঝুলি নিয়ে যে সফরে বেরিয়েছিলাম, সেই সফরকে আর এগিয়ে নেয়ার মত জযবাও অবশিষ্ট থাকল না। তাই ভবিষ্যতে এরূপ সফর করার মত জয্‌বা পুনর্জাগরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আপাতত এখানেই এ সফরের ইতি টানলাম।

সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেবের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ

১. আহকামে যিন্দেগী
২. ফাযালে যিন্দেগী
৩. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ
৪. ফিকহুন নিছা
৫. আহকামুন নিছা
৬. বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড
৭. আহকামে হজ্জ
৮. নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা
৯. ইসলামী ভূগোল
১০. মিসরে কয়েক দিন
১১. হজ্জ ও জিয়ারতের মানচিত্র
১২. কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র
১৩. কথা সত্য মতলব খারাপ
১৪. যদি জীবন গড়তে চান
১৫. চশমার আয়না যেমন
১৬. চিন্তা চেতনার ভুল
১৭. ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ
১৮. দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি
১৯. الاستفادة بشرح سنن ابن ماجة
২০. طریق تعلیم

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

এছাড়াও

মাকতাবাতুল আবরার-এর যাবতীয় প্রকাশনা "আল-কুরআন পাবলিকেশন্স" (যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা সংলগ্ন কিতাব মার্কেট) থেকেও একই মূল্যে সংগ্রহ করা যায়।